অমলা দেবী

হে বন্ধু বিদায়।

সিগনেট প্রেস ॥ কলকাতা ২০

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ ১৩৫৭
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০|২ এলগিন রোড
কলকাতা ২০
প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
সহায়তা করেছেন
পীযূষ মিত্র
মুদ্রক
প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন
প্রচ্ছদপট মুদ্রক
গসেন এণ্ড কোম্পানি
৭|১ গ্রান্ট লেন
ব্লক
রূপমুদ্রা [illegible]
৪ নিউ বহুবাজার লেন
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬১|১ মির্জাপুর স্ট্রিট
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দাম তিন টাকা

হে বন্ধু বিদায়...

সকাল প্রায় সাতটা। কলকাতা-গামী দিল্লী মেল একটা বড় স্টেশনে এসে এখানে নামবে তারা বাক্স-বিছানা নামাবার জন্য কুলি ডাকতে লাগল; নতুন আরোহীরা কুলির মাথায় বাক্স-বিছানা চাপিয়ে দরজায় এসে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল। নিম্ন-শ্রেণীর প্রত্যেক কামরায়— বিদায়ী ও নবাগত আরোহীদের মধ্যে নামা ও ওঠা নিয়ে নীরব ও সরব প্রতিযোগিতা চলতে লাগল।

ফেরিওয়ালাদের 'গরম চা' 'পাঁউরুটি-বিস্কুট' 'পুরি-কচুরি' ইত্যাদি হাঁক-ডাকে সারা প্ল্যাটফর্ম মুখর হয়ে উঠল। গাড়ি এখানে প্রায় কুড়ি মিনিট থামবে। যাঁরা এখানে নামবেন না, তাঁরা চা পানের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অনেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে 'চা-গরম'-এর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। যাঁরা শৌখিন তাঁরা ভোজনাগারের দিকে চললেন।

দ্বিতীয়-শ্রেণীর কামরা থেকে নামল একজন যুবক। বয়স সাতাশ-আটাশ। দীর্ঘ দোহারা গঠন। রঙ খুব ফরসা, সুদর্শন। পরনে গরম স্যুট। সে গেল ভোজনাগারের দিকে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সে দেখল কামরায় দুজন নতুন আরোহীর আবির্ভাব হয়েছে। একজন যুবক। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। পরনে গরম স্যুট। লম্বা, কাহিল, ফরসা রঙ। তার পাশেই একজন মহিলা। বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে। মাঝারি গঠন। কাহিল, ফরসা রঙ। পরনে বিধবার বেশ, গায়ে মাথায় একটা কেটের চাদর জড়ানো। মুখখানিতে শান্ত কোমল ভাব। সামনের বেঞ্চিতে বসে আছে দুজনে।

বিকাশ কামরায় উঠেই একবার ওদের দিকে তাকাল। চেনা-চেনা মনে হল। কিন্তু সে ঠাহর করতে পারল না।

কিছুক্ষণ পরে ওদের দিকে তাকাতেই দেখল, উভয়ের দৃষ্টি তারই উপর ন্যস্ত। ওদের হাব-ভাব দেখেও মনে হল, আলোচনা হচ্ছে তাকেই নিয়ে।

চোখাচোখি হতেই যুবকটি উঠে তার কাছে এসে বলল, 'দেখুন, একটা কথা জিগগেস করব আপনাকে, কিছু মনে করবেন না তো?'

পাশে একটুখানি জায়গা ছিল, একটু সরে বসে বিকাশ বলল, 'এখানে বসে আপনার যা জিগগেস করবার করুন।'

যুবকটি বসে বলল, 'আপনার নাম কি বিকাশ রায়?'

বিকাশ বিস্ময়ের স্বরে বলল, 'আমাকে চিনলেন কি করে?'

যুবক বলল, 'আপনাকে কতবার দেখেছি যে! আমি আপনার বন্ধু সোমনাথ মিত্রর ভাগ্নে।'

বিকাশ বলল, 'তাই নাকি? তোমার নাম তো নরেন?'

যুবক বলল, 'হ্যাঁ—'

বিকাশ বলল, 'উনি তোমার মা?'

যুবক বলল, 'হ্যাঁ—'

বিকাশ উঠে এসে বিধবার সামনে দাঁড়াল। বিধবার মুখে মৃদু হাসি। বিকাশ তাঁকে প্রণাম করতেই, তিনি ওর চিবুক স্পর্শ করে চুম্বন করলেন। বললেন, 'বস ভাই,' বলে পাশে বসালেন। নরেন বিকাশের জায়গায় বসে রইল। বিধবা বললেন, 'কতদিন বিলেত থেকে ফিরেছ?'

বিকাশ বলল, 'বছরখানেক হবে।'

'অনেকদিন ছিলে—'

'প্রায় সাত বছর।'

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'দিল্লী। একটা চাকরির জন্য।'

বিকাশ বলল, 'আপনাকে ঠিক চিনতে পারিনি, এক রকম দেখে গিয়েছিলাম।'

বিধবার মুখখানি ম্লান হয়ে উঠল। বিষণ্ণ-কণ্ঠে বললেন, 'বছর খানেক হল কপাল ভেঙেছে। উনি তো কলকাতায় চাকরি করতেন। বছর দেড় আগে চাকরি থেকে বিদায় নিয়ে দেশে ফিরলেন। পাড়াগাঁয়ের জল-বায়ু সহ্য হল না—'

বিকাশ জিগগেস করল, 'সোমনাথ কেমন আছে?'

বিধবার মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল, বললেন, 'তুমি জানো না?'

বিকাশ ঘাড় নেড়ে জানাল—না।

বিধবা বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠে বললেন, 'খোকা নেই, মারা গেছে, আজ মাস ছয় হল—'

বিকাশ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কতক্ষণ। তারপর জিগগেস করল, 'অরুণার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তো সোমনাথের?'

বিধবার মুখের ভাব এক মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'ঐ বিয়েই ওর কাল হল। ওর সঙ্গে বিয়ে না হলে খোকা মরত না—'

বিকাশ বিস্ময়ের স্বরে বলল, 'কিন্তু অরুণা তো বেশ ভালো মেয়ে! শান্ত, শিষ্ট, সেবাপরায়ণা।'

শ্লেষের হাসিতে ঠোঁট কুঁচকে উঠল বিধবার। বললেন, 'গুণের সাগর, জানি। কিন্তু খোকার ভাগ্যে এক ফোঁটাও জোটেনি—'

একটু থেমে বললেন, 'অথচ খোকা ওদের জন্য যা করেছিল, পরম আত্মীয়ও অত করে না।' আর একটু থেমে বললেন, 'তোমাদের অরুণার অন্য গুণ কি, কতটা আছে জানি না, তবে কৃতজ্ঞতার ছিটে-ফোঁটাও নেই। অত্যন্ত নিমকহারাম মেয়ে।' চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে উঠল বিধবার।

চুপ করে বসে রইল বিকাশ। গাড়ি চলতে শুরু করল। প্ল্যাটফর্মের বিচিত্র জনসমাবেশ, বিচিত্র কর্মব্যস্ততা, চোখের সামনে দিয়ে পার হয়ে গেল। বিচিত্র কোলাহল ক্রমে মিলিয়ে এল। গাড়ি মাঠের মাঝ দিয়ে দ্রুত ছুটতে লাগল। বিকাশ লক্ষ্য করল, বিধবার মুখের শান্ত ভাবটি আবার ফিরে এসেছে। জিগগেস করল, 'অরুণার সঙ্গে কবে বিয়ে হল?'

বিধবা বললেন, 'তুমি কিছুই শোনোনি?'

বিকাশ ঘাড় নেড়ে 'না' জানাল। বিধবা বললেন, 'তুমি তো দেশ ভাগাভাগি হবার আগেই চলে গিয়েছিলে?'

বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ।'

বিধবা বলতে লাগলেন, 'দেশ ভাগ হবার পরই তো সব হিন্দুরা পালিয়ে আসতে লাগল। ঢাকারও বড়-বড় লোকরা অনেকে চলে এল দেশ ছেড়ে। তোমাদের বাড়ির সবাই চলে এলেন। অরুণারা আসতে পারল না। ওর মা'র তো যক্ষ্মা হয়েছিল। সে সময়টায় রোগ খুব বেড়েছে। এখন যায়, তখন যায় অবস্থা। সোমনাথও এল না। বলল—সে ঢাকাতে চাকরি পেয়েছে, কলকাতায় এসে চাকরি পাওয়া মুশকিল হবে। কিন্তু আসল কারণ অরুণাদের না আসা—'

বিকাশ প্রশ্ন করল, 'কি চাকরি করছিল?'

'কলেজের চাকরি। বাবার তো কাজ শেষ না হতেই মৃত্যু হল। তুমি তো বাবার মৃত্যু দেখে যাওনি?'

বিকাশ বিষাদভরা কণ্ঠে বলল, 'না। না ওঁর, না বাবার—'

বিধবা বললেন, 'বাবার মৃত্যুর খবর পেয়েই আমরা গেলাম। আমরা ঢাকায় থাকতে-থাকতেই তোমার বাবাও গেলেন—'

একটু চুপ করে রইলেন। বোধ করি অতীতের মধ্যে মন চলে গেল মুহূর্ত কয়েকের জন্য। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। তারপর বললেন, 'বাবার রক্তের চাপ খুব বেশি ছিল। কয়েকজন বন্ধু মিলে সাবান, এসেন্স, তেল, ওষুধের কারখানা ফেঁদেছিলেন। নানা গোলমালে ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেল। অনেক টাকা ঢেলেছিলেন তাতে। নিজের টাকা নয়, ধার করে। সেই ধাক্কা সামলাতে পারলেন না।'

বিকাশ একটু অপেক্ষা করে থেকে বলল, 'মাস্টারমশায়ের মৃত্যুর পর সোমনাথ চাকরি পেল বুঝি?'

বিধবা বললেন, 'হ্যাঁ, কলেজের কর্তারা তো সকলেই বাবাকে শ্রদ্ধা করতেন। অনেকে তাঁর ছাত্রও ছিলেন। খোকা তখন এম-এ পাশ করেছে। ওকে ডেকে তাঁরা চাকরি দিলেন। অবশ্য খোকার মতো ছেলে কলকাতার কলেজেও ভালো চাকরি পেত। অরুণারা এল না বলেই ও এল না। অরুণাকে বরাবরই ভালোবাসত ও। অরুণার দাদা রবি তো ওর খুব বন্ধু ছিল। প্রায়ই যেত ওদের বাড়ি।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'ভাগ্যে থেকে গিয়েছিল। না হলে অরুণাদের সবাইকে উপোস দিয়ে মরতে হত।'

বিকাশ বিস্ময়ের স্বরে বলল, 'কেন? কাকাবাবু, রবি বেঁচে থাকতেও—'

বিধবা বললেন, 'রবি আর কদিন বাঁচল। একদিন বিকেলে বেরিয়েছিল, আর বাড়ি ফিরল না। মুসলমান গুণ্ডা ওকে মেরে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়েছিল। দেহেরও সদগতি হয়নি। ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়েই অরুণার বাবা অঘোরবাবু মূর্চ্ছা গেলেন। মূর্চ্ছা ভাঙল কিন্তু শরীরের একদিকের অঙ্গ অসাড় হয়ে গেল। অরুণার মা আধমরা পড়েছিলেন বিছানায়। ছেলের মৃত্যুতে কাঁদবারও ক্ষমতা ছিল না তাঁর। এই বিপদে খোকাই ওদের সব ভার কাঁধে তুলে নিল। ওদের সবাইকে নিজের বাড়িতে

নিয়ে এল। কলেজের কাজ ছাড়াও দু-তিনটে টিউশানি করে সকলের খরচ চালাতে লাগল।

'এমনি করে বছর দুই কাটল। শহরের হিন্দুদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে আসতে লাগল। খোকাকে আসতে লিখলাম আমরা। কিছু-দিন পরে ও সবাইকে নিয়ে কলকাতায় এল। আমরা যে বাড়িতে থাকতাম তারই উপর তলায় দুখানা ঘর উনি ঠিক করে রেখেছিলেন ওদের জন্য। সেখানেই উঠল সব—মানে অরুণা, অরুণার বাবা, অরুণাদের রাঁধুনী, তার ছেলে, আর খোকা, এই পাঁচজন। মাস দুই চেষ্টা করে কলকাতার কলেজে খোকার একটা চাকরি জুটল। কিন্তু এই দুমাসেই খোকার হাত খালি হয়ে গেল। কলেজে পড়িয়ে আর টিউশানি করে খোকা যা পেত, তাতে এতগুলি লোকের কুলোত না। অরুণা তো বি-এ পাশ। উনি ওর চাকরি জুটিয়ে দেবেন বললেন। খোকা রাজী হল না। মাঝে-মাঝে দেশে গিয়ে, জমি-জায়গা বিক্রি করে টাকা নিয়ে এসে খরচ চালাতে লাগল।

'কলকাতায় এসে অঘোরবাবুর শরীর দিন-দিন খারাপ হতে লাগল। একদিন দুপুরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি ওঁর ঘরে যেতেই অরুণাকে বাইরে যেতে বললেন। অরুণা চলে যাবার পর বললেন—আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। মেয়েটার কি ব্যবস্থা করি বলতে পার?

'আমি ওঁর মনের কথা বুঝতে পারলাম। কিন্তু কিছু বললাম না। হঠাৎ আমার হাত ধরে অঘোরবাবু বললেন—মেয়েটাকে তোমরা আশ্রয় দাও। ওকে এভাবে রেখে আমি মরি কি করে? যদি দেখি, ও একটি নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে, তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারি।

'বললাম—সোমনাথের সঙ্গে বিয়ের কথা বলছেন? বেশ তো, আপনি বলবেন সোমনাথকে—সোমনাথ আপনাকে এত সম্মান করে। সে কখনো আপনার অনুরোধ অমান্য করবে না।

'বললেন—তোমার আপত্তি নেই তো? আমার আপত্তি ছিল। অরুণাকে কোনোদিনই পছন্দ করতে পারিনি। কি রকম ছাড়া-ছাড়া ভাব। শুধু কলকাতাতে নয়, ঢাকাতেও দেখেছিলাম ওকে। কোনোদিন ভালো করে হাসতে দেখিনি। মন খুলে কথা বলতে শুনিনি। ও মেয়েকে বিয়ে করলে সোমনাথ সুখী হবে না, আমি তখনই জানতাম। তবু বুড়োর কাছে—আপত্তি আছে—বলতে পারলাম না।'

বিকাশ বলল, 'অরুণা একটু গম্ভীর প্রকৃতি বটে, কিন্তু কুটিল নয়, নিরীহ ভালোমানুষ। অঘোরবাবুর মেজাজ ভালো ছিল না। উঠতে-বসতে শাসন করতেন মেয়েকে। ওর দাদাও ওকে বেশি আমল দিত না। ওর মা ওকে স্নেহ করতেন, তবে রোগে ভুগে-ভুগে তাঁরও মেজাজ শেষটায় এমন খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর কাছ থেকেও অরুণা স্নেহের চেয়ে তিরস্কারই পেত বেশি। কাজেই, সকলের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে-পেয়ে ওর মনটা ভীতু হয়ে গিয়েছিল। সকলের সঙ্গে সাহস করে মিশতে পারত না।'

বিধবা বললেন, 'তা হবে।'

বিকাশ বলল, 'সোমনাথ নিশ্চয়ই অঘোরবাবু বলতেই রাজী হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ। ও তো এই অনুরোধের প্রতীক্ষাই করছিল।'

'অরুণার মত জিগগেস করা হয়নি?'

'জানি না। জিগগেস করা হলেও ও না বলতে পারত না। যে তাদের এত করেছে ও করছে, যার আশ্রয় ছাড়লে পথ ছাড়া আর গতি নেই, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি ও যেতে পারে? তা ছাড়া ওর বাবার যে মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, সে তা বুঝত। কাজেই তাঁর মনে কোনো কষ্ট দেবার বোধহয় ইচ্ছা ছিল না ওর।

'দুদিন পরে বিয়ে হল। বিয়ের দিনই অঘোরবাবু মারা গেলেন। শ্রাদ্ধশান্তি চুকল। দুজনে ঘরকন্না করতে লাগল, কিন্তু দুজনের মুখেই হাসি নেই। অরুণার মুখে তো চিরদিনই হাসির আকাল! কাজেই ওকে দেখে কিছু ভাবিনি। কিন্তু খোকা? সে তো যা চেয়েছিল তাই পেয়েছে! তার তো মুখ-চোখ থেকে হাসি উথলে পড়ার কথা। নতুন বৌকে নিয়ে সিনেমা, থিয়েটারে যাওয়া, নানা জায়গাতে বেড়াতে যাওয়া, কিছু দেখলাম না। খোকা সারাদিনই বাইরে-বাইরে থাকে, রাত দশটায় ফেরে। অরুণা সারাদিন মুখ গোমড়া করে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে বা শুয়ে-বসে থাকে।

'রাঁধুনীকে জিগগেস করলাম — কি ব্যাপার? রাঁধুনীটা লোক ভালো। খোলা-মেলা লোক। সোমনাথকে স্নেহ করত, সব বলে ফেলল। তোমার নাম করে বলল — অরুণা তোমাকে ভালোবাসে ছোটবেলা থেকে।

তোমার কাছেই ওর মন বাঁধা। সোমনাথকে ও এক ফোঁটাও ভালোবাসে না। একদিন রাত্রে লুকিয়ে দেখলাম ও এক বিছানায় শোয় না। সোমনাথ শোয় খাটে। অরুণা মেজেতে একটা মাদুরে শোয়। খোকার শুকনো মুখ দেখলেই বুকের ভেতরটা মোচড়াতে থাকত। অল্প বয়েসে মা হারিয়েছে, বাবা হারাল, যে স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তার কাছ থেকে এক ফোঁটা ভালোবাসা পেল না। ও বাঁচবে কি করে?'

বিকাশ লজ্জিত মুখে বসে রইল। একমাত্র ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য বিধবা হয়তো তাকেও গৌণ হেতু ভাবছেন, ভাবতেই তার মন অস্বস্তিতে ভরে উঠল।

বিধবা বলতে লাগলেন, 'বোধ করি মাঘ মাস। বাদলা শুরু হয়েছে সকাল থেকে। বৃষ্টির বিরাম নেই। সন্ধ্যের দিকে ঝড় শুরু হল। রীতিমতো দুর্যোগ। উনি সেদিন আড্ডায় বেরোলেন না। বললেন—তেলেভাজা খেতে ইচ্ছা করছে। তৈরি হল। উনি সোমনাথকে ডেকে আনতে নরুকে পাঠালেন। নরু খবর নিয়ে এল—মামা নেই, পড়াতে গেছেন।

'আমার স্বামী আশ্চর্য হয়ে বললেন—আজকেও রেহাই নেই! নবাবের চাকরি দেখছি যে। ছাতা নিয়ে গেছে তো?

'উনি ওদের খবর কিছু জানতেন না। খোকা যে এই দুর্যোগেও কেন বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা মনে করে আমার বুকের ভেতরটা টনটন করতে লাগল। অরুণা বোধ করি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে লাগল। ভিজে সপসপে হয়ে রাত দশটায় বাড়ি ফিরল খোকা। পরদিন জ্বর হল। দাঁড়াল নিউমোনিয়ায়। এক মাস ভুগে সারল। অরুণা খুব সেবা করল। দিন-রাত নিখুঁত সেবা। যে দেখল সেই বলল—আহা কি মেয়ে! স্বামী অন্ত প্রাণ! আমার বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা ধন্য-ধন্য করতে লাগল অরুণাকে। কিন্তু আমার চোখে ফাঁকি একদিন ধরা পড়ল। ডাক্তার যেদিন বললেন—অবস্থা খারাপ। ঘরসুদ্ধ লোক কেঁদে-কেটে অস্থির হল; রাঁধুনী মেয়েটাও কাঁদল। অরুণা রোগীর শিয়রে আরও শক্ত ও সতর্ক হয়ে বসে রইল। কিন্তু যা দেখলে খোকার চোখ জুড়োত, মন জুড়োত—তা হল না, ওর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়াল না।

'খোকা সম্পূর্ণ সারল না। মাঝে-মাঝে জ্বর হত। কাশি তো লেগেই রইল। গোপনে ডাক্তার দেখিয়েছিল। ডাক্তার যক্ষ্মা হয়েছে বলে

সন্দেহ করেছিলেন। আমাদের কিছু বলেনি। দেশে গেল। জমি-জায়গা বাবা সবই বিক্রি করেছিলেন ব্যবসার জন্য। কিছু বাকি ছিল। তাই, আর বাড়ি বিক্রি করে হাজার দুই টাকা নিয়ে এল। এনে ওঁকে গোপনে সব জানাল। উনি ভালো ডাক্তার দেখালেন। কফ পরীক্ষা হল। যক্ষ্মা হয়েছে বলে প্রমাণ হল। চিকিৎসা চলল। শেষে যাদবপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হল। মোটা টাকা খরচ হতে লাগল মাসে-মাসে। ওঁর আয় এমন কিছু বেশি ছিল না যে আমরা কিছু সাহায্য করব। তা ছাড়া অরুণা তো একা নয়, সঙ্গে আছে আরও দুজন। উনি একটা স্কুলে অরুণার চাকরি যোগাড় করে দিলেন। অরুণার মাইনেতে ওদের তিন-জনের খরচ কোনো রকমে চলতে লাগল। জমি আর বাড়ি বিক্রির টাকাতে খোকার খরচ চলতে লাগল।

'অরুণা আমাদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে খোকাকে দেখতে যেত। ওকে দেখলেই খোকার মুখখানি আনন্দের আভায় জ্বলজ্বল করে উঠত। সেই সময় খোকাকে দেখলে চোখে জল রাখা যেত না। দেহে মাংস বলতে কিছু নেই। বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছিল যেন। এমন ডবডবে মুখ; শুকিয়ে যেন হাড় সার হয়ে গিয়েছিল। শুধু চোখ দুটি, এমনিই তো টানা ঢলঢলে চোখ, আরও যেন বড় দেখাত। দুচোখের তারা যেন জ্বলত।' অরুণা কাছে গিয়ে বসত। মাথায় হাত বুলোতো। খোকার দুই চোখের তীক্ষ্ম দৃষ্টি এক কণা ভালোবাসার আশায় ওর মুখ-চোখ হাতড়ে বেড়াত। না পেয়ে নিরাশায় ম্লান হয়ে যেত।

'ফিরে আসবার সময় অরুণাকে গালাগালি করতাম যা-তা বলে। একটা কথার জবাব দিত না। পাথরের মতো মুখে একটুও ভাবান্তর হত না।

'প্রায় এক বছর পরে খোকা বাড়ি ফিরল। টাকা সব ফুরিয়ে গিয়েছিল। আর ওখানে রাখা সম্ভব হল না। একটু সেরেছিল। কলকাতায় থাকাও সম্ভব হল না। সবাইকে নিয়ে দেশে চলে গেল।

'কিছুদিন পরে ওঁরও চাকরি শেষ হল। আমরাও দেশে চলে এলাম। খোকা মাঝে-মাঝে দু-একখানা চিঠি লিখত। জানাত—ভালো আছে। গাঁয়ে একটি ঠাকুরের আশ্রম আছে। আশ্রমের স্বামীজীর বাবার সঙ্গে খুব আলাপ ছিল। আশ্রমে সম্প্রতি হাই স্কুল হয়েছিল। খোকা সেখানে

হেডমাস্টারী করছিল। ভাবলাম, যাক, পাড়াগাঁয়ে ওতেই চলে যাবে। শরীরটা যদি ভালো থাকে তো আর ভাবনা কি?'

চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'তারপর অনেকদিন চুপ। চিঠি দিলাম। জবাব পেলাম না। আমার এক পিসতুতো ভাইয়ের ঠিক পাশের গাঁয়েই বাড়ি। তাকে চিঠি লিখলাম। জবাব এল তিন-চারদিন পরে—' থেমে গিয়ে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন-বেগ সামলাতে লাগলেন। একটু পরে কান্না-জড়িত স্বরে বললেন, 'লিখল—খোকা নেই। মাস দুই আগে মারা গেছে।

'উনি নেই। নরু চাকরিস্থলে। পাড়ার একটি ছেলেকে নিয়ে পিসতুতো ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সব শুনলাম গিয়ে। খোকা আত্মহত্যা করেছিল। স্বামীজী ছিলেন বলে কোনো হাঙ্গামা হয়নি।

'অরুণার কাছে গেলাম। প্রণাম করে অপরাধীর মতো কাছে এসে দাঁড়াল। দুচোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। মনে হল খোকা যদি দেখে যেতে পারত! কত আনন্দ পেত। রীতিমতো বৈধব্য পালন করছে অরুণা। পরেছে নরুণ-পাড় আধ-ময়লা ধুতি, একটা আধ-ময়লা সেমিজ। চুলে তেল দেয়নি, একরাশ রুখু চুল কোনো মতে খোঁপায় জড়িয়ে নিয়েছে। রাঁধুনী বলল—খাওয়া-দাওয়া এক রকম বন্ধ। দিনের বেলায় এক মুঠো খায়—রাত্রে উপোস। কাহিল হয়ে গেছে খুব। রঙ ময়লা হয়ে গেছে। বললাম—মরে যাবে যে! বলল—গেলেই তো বাঁচি। খোকার কথা জিগগেস করলাম। বলল—কিছু জানতাম না। সকালে উঠে দেখি মাথার কাছে একটা কাগজ। লেখা—জরুরী ডাক এসেছে, চললাম।

'বলতে ইচ্ছা হল—তোমার জন্যই তো গেল। একটু যদি মায়া করতে, ভালোবাসতে, তো বেঁচে ওঠবার চেষ্টা করত। কিন্তু এমন কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোনো শক্ত কথা বলতে মায়া হল। জিগগেস করলাম—চলছে কি করে? বলল—ওঁর একটা লাইফ ইনশিওরেন্স ছিল। শেষটা কিছু দেওয়া হয়নি। স্বামীজী কিছু টাকা আদায় করে দিয়েছেন।

'বললাম—কদিন চলবে এতে? চল আমার সঙ্গে। দুজনে ভাঙা কপাল নিয়ে এক জায়গায় থাকিগে। আসতে চাইল না। বলল—এখানেই থাকব। উনি যেখান থেকে গেছেন—সেখান থেকেই যেতে চাই—

'আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। বুঝতে দেরি হল না—মুখের নয়, বুকের কথা। বললাম—খোকাকে কি শেষে ভালোবেসেছিলে? কেঁদে ফেলল। ঘাড় নেড়ে জানাল—হ্যাঁ। সামলে, বলল—জানিয়েছিলাম ওঁকে। কোনো কাজই হল না।

'বাড়ি ফিরে এলাম। নরুকে সব লিখলাম। নরু ওকে আসতে অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিল। রাজী হয়নি। মাসে-মাসে কিছু টাকা পাঠাবার কথাও লিখেছিল। জবাব এল—এখন প্রয়োজন নেই। ওখানে একটা মেয়ে স্কুল হবে শিগগির। স্বামীজী তার চাকরির জন্য চেষ্টা করছেন সেখানে। হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। প্রয়োজন হলে সে জানাবে।

'আর কোনো খবর পাইনি মাস কয়েক। দিন কয়েক আগে পিসতুতো ভাইকে ওর সম্বন্ধে জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছিলাম। চিঠির জবাবে জানতে পারলাম—অরুণার চাকরি হয়নি এখনো। ওদের গাঁয়ের জমিদার, যিনি আমাদের বাড়িটা নিয়েছেন—ঐ বাড়িটায় একটা হাসপাতাল করবেন। অরুণাকে বাড়ি ছেড়ে যাবার জন্য জোর তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। ওকে আসতে চিঠি লিখে দিয়েছি। আসবে না কিছুতেই—জানি। অত্যন্ত একগুঁয়ে মেয়ে তো! একগুঁয়েমির জন্যই ওর নিজের জীবনটা তছনছ হয়ে গেল; খোকার জীবনটা নষ্ট হল। এক ফোঁটা সুখ দিল না—পেল না।

'ওর উপর আমার বিন্দুমাত্র স্নেহ নেই। আমার সর্বনাশ করেছে ও। ওকে কত অভিশাপ দিয়েছি। কত গালাগালি করেছি। তবু অসহায় নিঃস্বম্বল অবস্থায় মেয়েটা কোথায় যাবে, কি করবে ভেবে রাত্রে ঘুম হয় না আমার।'

একটু থেমে জিগগেস করলেন, 'তোমাদের তো দেশের লোক ওরা?'

বিকাশ ম্লানমুখে বলল, 'আমাদের এক গাঁয়েই বাড়ি।'

বিধবা বললেন, 'ওর যখন কেউ নেই, তখন তোমাদের উচিত ওকে দেখা-শোনা করা—ও যাতে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করতে পারে, তার ব্যবস্থা করে দেওয়া।'

বিকাশ বলল, 'জানতাম না কিছুই। কোথায় আছে, কেমন আছে—কিছুই জানতাম না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—আমি ওর ভার নেব।'

গাড়ির বেগ ক্রমে কমে আসতে লাগল। নরেন বলল, 'মা, এইবার নামতে হবে।'

একটা বড় স্টেশনে গাড়ি থামবে এবার। ওরা নামবে। নরেন এই শহরে থাকে। আদালতের মুনসেফ।

বিধবা বললেন, 'একটা কথা তোমাকে বলি, বিকাশ। কিছু মনে কোরো না। অরুণা তোমাকেই ভালোবাসে। সোমনাথের সঙ্গে মাত্র বিবাহ-অনুষ্ঠানটা হয়েছিল। একদিনের জন্য ও ওর স্ত্রী হয়নি। এখন খোকা চলে যাবার পর, ও বৈধব্যই পালন করুক, বা—যতদিন বাঁচি স্বামীর স্মৃতি নিয়েই বাঁচব তারপর তাঁর কাছে চলে যাব—এই সব নানা কথা ও মুখেই বলুক, ও তোমাকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসে না, কাউকে ভালোবাসতে পারবে না। তোমার উচিত ওকে বিয়ে করা। মেয়েটাও তো অত্যন্ত হতভাগী। এই বয়সেই বাপ, মা, ভাই, স্বামী—সব খেয়ে বসে আছে। তোমার কাছে আশ্রয় পেলে ও হয়তো সুখী হবে—'

গাড়ি এসে থামল। ওরা নেমে গেল এখানে। নরেন বলল, 'মামা, এখানে নেমে যান না।'

বিকাশ শুধু হাসল। আবার অনুরোধ করতেই বলল, 'আসব এক সময়। অরুণার কথা সব শুনলাম। ছোট বোনের মতো আমার। ওর একটা ব্যবস্থা না করে দিয়ে আমার ছুটি নেই। দিল্লীতে চাকরি পাই তো—যাবার সময় নেমে দেখা করে যাব।'

দিন কয়েক পরে বিকাশ মোটরে চলেছে অরুণাদের গাঁয়ে। ওর নিজের মোটর। জিনিসপত্র কতক ক্যারিয়ারে বাঁধা আছে, আর কতক আছে মোটরের ভিতর। প্রয়োজন হলে দুমাস পর্যন্ত থাকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। একটা বড় স্যুটকেসে আছে পোশাক-পরিচ্ছদ, হোল্ড-অল-এ আছে বিছানা, আর একটা ক্যানভাসের থলেতে আছে নানা খুচরো জিনিসপত্র। বন্দুকটাও সঙ্গে নিয়েছে। নরেন বলেছিল, বন-জঙ্গল জায়গা—রাস্তায় জন্তু-জানোয়ারের সাক্ষাৎ মেলা অসম্ভব নয়। ওর কাছ থেকেই রাস্তার খবরও জেনে নিয়েছিল।

নরেনের মা'র মুখে অরুণার খবর পাবার পর থেকেই বিকাশের মন অরুণার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। অরুণাকে চোখে না দেখা পর্যন্ত ওর শান্তি নেই। কলকাতায় ফিরে এসেই ও অরুণার কাছে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়বে স্থির করেছিল। কিন্তু এসে দেখল ছোট ভাগনিটি অসুখে পড়েছে। অসুখ থেকে সেরে না ওঠা অবধি বাড়ি ছেড়ে বেরোতে চক্ষুলজ্জায় বাধল। এতে ভালোই হল। দিল্লী থেকে চিঠি পাওয়া গেল, ইতিমধ্যে চাকরিটা হয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা। চাকরি হলে এপ্রিল মাসে যোগদান করতে হবে। কাজেই এখন দু-তিনমাস সে নিশ্চিন্ত হয়ে ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে পারে।

মেয়েটি সেরে উঠল দিন সাতেক পরে। বড়দির কাছে তখন কথাটা পাড়ল বিকাশ। বলল, ট্রেনে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। ডাক্তার—ধানবাদের কাছে প্র্যাকটিস করে। তাকে নিমন্ত্রণ করেছে বেড়াতে যেতে। বড়দি হাঁকিয়ে দিয়েছিল প্রথমে, 'না-না, কোথাও যেতে হবে না তোকে। উনি বলছিলেন চাকরি-বাকরি করতে হবে না। এখানেই প্র্যাকটিস করুক। ওঁর এক নতুন মক্কেল জুটেছে—মস্ত বড় ওষুধের দোকানের মালিক। উনি বললে, সেখানে বসতে দেবে তোকে।'

বিকাশের ভগ্নীপতি কলকাতা হাইকোর্টের নামজাদা ব্যারিস্টার।

বিকাশ বলল, 'দিল্লীর চাকরি না হলে তাই করব।' তারপর বিনিয়ে-বিনিয়ে কণ্ঠস্বরে যথামাত্রা বিনয় ও অনুনয় মিশিয়ে বলল, 'একবার

কাজে জোড়া হলে তো আর ছুটি মিলবে না। দিন কয়েক ঘুরেই আসি, কি বল?'

বিকাশের বড়দিদি রাশভারি মানুষ। বিকাশ ছোটবেলা থেকে ভয় করে তাঁকে। বিকাশের চেয়ে দশ বছরের বড়। দিদির কথা অমান্য করবার সাহস নেই তার এ বয়সেও।

অনেক তোষামোদ করে দিদির মনও নরম করল। ঘুষও দিল কিছু। বলল, 'ফেরবার সময় উষার সঙ্গে দেখা করে আসব।'

উষা বিকাশের ছোট বোন। স্বামীর কাছে পশ্চিম-বঙ্গের কোনো জেলা শহরে থাকে। উষার স্বামী সেখানে এস. ডি. ও.। উষাকে বড়দিদি অত্যন্ত স্নেহ করেন। উষার নাম মন্ত্রবৎ কাজ করল। বড়দির হুকুম মিলল।

ভোর পাঁচটায় বেরিয়েছিল। অরুণাদের গাঁয়ে পৌঁছল বেলা দশটায়। পশ্চিম-বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে নেহাত ছোট একটি গ্রাম। দুই পাশে বিস্তীর্ণ জঙ্গল। জঙ্গলের কোলে ধানের খেত। আর, যতদূর দৃষ্টি যায় গেরুয়া রঙের কঙ্করময় প্রান্তর। দিগন্তে হস্তী-যূথের মতো সারি-সারি নীল রঙের পাহাড়।

গ্রামের এক প্রান্তে অরুণাদের বাড়ি। যে বড় রাস্তাটা দিয়ে পৌঁছল, সেটা অরুণাদের বাড়ির পিছন দিয়ে চলে গেছে। রাস্তাটা থেকে একটা ছোট কাঁচা রাস্তা বেরিয়ে বাড়ির পাশ দিয়ে গেছে। সেইটে দিয়ে কতকটা গিয়ে, ডানদিকে মোড় ফিরে অরুণাদের বাড়ির সামনে পৌঁছল বিকাশ।

বেশ বড় বাড়ি। প্রায় দু-বিঘে জায়গার উপর বাড়ি। অনেকদিনের পুরোনো। সর্বাঙ্গে বয়সের চিহ্ন। ভারা বাঁধা রয়েছে দেখে বোঝা গেল, বাড়িটাতে মেরামত চলছে। চারদিকে ছোট দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়ালটাও ভেঙে গিয়েছিল; সম্প্রতি মেরামত হয়েছে তা দেখে বুঝতে দেরি হল না। সামনে গেট, কাঠের দরজা, সবই নতুন তৈরি। নতুন মালিক বাড়িটার সংস্কার শুরু করেছেন।

বাড়ির পিছনে বাগান। কাঁটাগাছের বেড়া শেষ পর্যন্ত চলে গেছে। বাগানে নানা রকমের ছোট-বড় ফল-ফুলের গাছ।

সামনের দরজা বন্ধ ছিল। বিকাশ হর্ন বাজাল বার কয়েক। একটা লোক ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। গাড়ির কাছে এসে আভূমি প্রণত

হয়ে বলল, 'হুজুরের কোথা হতে আসা হচ্ছে—জমিদারবাবুর কাছ থেকে কি?'

বিকাশ বলল, 'জমিদারবাবুর কাছ থেকে প্রায়ই লোক আসে বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর! বাড়ি মেরামত হচ্ছে, বাগান কাটাই হচ্ছে। হাসপাতাল হবেক যে! আপুনি তাহলে কোত্থেকে আসছেন—হুজুর?'

বিকাশ বলল, 'এটা কি সোমনাথবাবুর বাড়ি?'

লোকটা বলল, 'ওনাদেরই বাড়ি ছিল বটে, এখন জমিদারবাবুর—'

'তুমি কি কর এখানে?'

'আমি বাড়ি পাহারা দিই।'

'তুমি সোমনাথবাবুকে চিনতে?'

'আজ্ঞে, চিনব নাই? ওনাদের সাত পুরুষের প্রজা আমরা। এখন না হয় জমিদারী হাত বদল হইছে, তবু ওনাদের খেয়েই মানুষ, ই কথা কোনোদিনই ভুলব নাই। তা হুজুর, সোমনাথবাবু তো মারা গেছেন—'

'তা আমি জানি। ওঁর স্ত্রী আমার আত্মীয়া। তাঁর কাছেই আমার দরকার। তুমি দেখ দেখি তিনি বাড়িতে আছেন কিনা।'

লোকটা ছুটল বাড়ির মধ্যে। বিকাশ গাড়িটা হাতার মধ্যে ঢুকিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

অবিলম্বে বেরিয়ে এল লোকটা। সঙ্গে একজন পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে। কালো কুচকুচে রঙ। স্বাস্থ্যবান। মুখের চেহারাটি কৈশোরের লাবণ্যে উজ্জ্বল।

লোকটি বলল, 'ইটি আমার ছেলে। আমার নাম কৃষ্ণদাস—ইটির নাম কানাই। বৌঠাকরুণের কাছেই কাজ করে।

বিকাশ জিগগেস করল—'তোর মা কোথায় রে?'

'আজ্ঞে, আশ্রমে গেছেন—'

'প্রতিদিন যান বুঝি?'

'প্রায় যান।'

'কখন ফিরবেন?'

'পুজো, আরতি দেখে ফিরবেন—'

'বাড়িতে কে আছে?'

'আজ্ঞে, রাঁধুনি মাসি রইছেন—'

'যা বল দেখি, আপনাদের দেশের এক বাবু এসেছেন—'

তারপর কৃষ্ণদাসকে বললে, 'তুমি নিজের কাজে যাও, কৃষ্ণদাস।'

কৃষ্ণদাস চলে গেল। কতকটা দূরে টিনের ঘর রয়েছে একটা। ঐখানে কৃষ্ণদাসের আস্তানা।

অবিলম্বে দেখা দিল রাঁধুনী মাসি। বিধবা। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। লম্বা, কাহিল। রঙ কালো। মুখে কিঞ্চিৎ শ্রী যৌবনে হয়তো ছিল। এখন উঁচু চোয়াল, বসা গাল, কোটরে ঢোকা গোল-গোল চোখ, সামনের বড়-বড় দাঁত মিলে শ্রীটুকু নষ্ট করে দিয়েছে। মাসি এসে বিস্ময়ে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল।

বিকাশ নেমে দাঁড়িয়েছিল। মাসিকে দেখে এগিয়ে গিয়ে আত্মীয়তার সুরে বলল, 'এই যে ক্ষুদুর মা, ভালো আছ?'

ক্ষুদু অর্থাৎ ক্ষুদিরাম, মাসির একমাত্র ছেলে। এই ছেলেটিকে কোলে নিয়েই বিধবা হয়েছিল। বিকাশদের গ্রামেই বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি দুই-ই। অত্যন্ত গরীব। বিধবা হওয়ার পর থেকেই অরুণা-দের বাড়িতে আছে।

ক্ষুদুর মা একগাল হেসে বলল, 'কে এল ভেবে ছুটতে-ছুটতে এসে দেখি এক সাহেব! চিনতেই পারিনি। বিলেত থেকে কখন এলেন? ভিতরে আসুন—'

বিকাশ পিছনে-পিছনে ভিতরে চলল।

পিছনের পুরোনো বাড়ি ছাড়িয়ে এক পাশে দোতলা বাড়ি তোলা হয়েছে। দোতলায় ওঠবার জন্য পৃথক সিঁড়িরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক পাশে নতুন রান্নাঘর তৈরি করা হয়েছে। উঁচু দেয়াল তুলে পুরোনো বাড়ি থেকে এ বাড়ি পৃথক করে দেওয়া হয়েছে।

এসব হয়েছে সোমনাথের পিতামহ ইন্দ্রনাথের আমলে। ইন্দ্রনাথ জবরদস্ত জমিদার ছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে একটা বড় মামলায় তাঁকে হারিয়ে দিয়েছিল। সেই ব্রাহ্মণকে তিনি খুন করিয়ে তার দেহটা বনের মধ্যে পুঁতে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণের বৃদ্ধ পিতা অভিশাপ দিয়েছিলেন, নির্বংশ হবে তুমি।

এর পরেই তাঁর স্ত্রী আর দুই পুত্র কয়েকদিনের মধ্যে কলেরায় পর-পর মারা গেল। ইন্দ্রনাথ আবার বিবাহ করলেন। সেই স্ত্রী একটি

মৃত পুত্রসন্তান প্রসব করে মারা গেল। তিনি পুনর্বিবাহ করবার সংকল্প করছেন, এমন সময়ে একজন তান্ত্রিক সাধু গ্রামে আসেন। ইন্দ্রনাথ তাঁর কাছে গিয়ে পড়লেন। অনেক কষ্টে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। তাঁর কাছে সব কথা নিবেদন করলেন। সাধু ধ্যানস্থ হয়ে বললেন—এ-বাড়িতে ব্রহ্মশাপ হয়েছে। বাস করবেন না এখানে—করলে আপনার বংশ থাকবে না।

নানা মামলা-মকদ্দমায় ইন্দ্রনাথের অবস্থা পড়ে এসেছিল। নতুন করে মর্যাদা-মাফিক অট্টালিকা নির্মাণ করবার আর্থিক সামর্থ্য ছিল না। এক প্রান্তে ছোট দোতলা বাড়ি তুলে কোনো মতে বাস করবার মতো ব্যবস্থা করলেন, এবং মস্ত উঁচু দেয়াল তুলে ব্রহ্মশাপের আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করলেন।

বিকাশ চারদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগল। ক্ষুদুর মা বলল, 'উপরতলায় থাকে খুকি।' কানাইকে বলল, 'জিনিসগুলো নিয়ে এসে উপরে তোল।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই চওড়া ঢাকা বারান্দা। বিকাশ বারান্দায় দাঁড়িয়ে উপরে-নিচে চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'এ বাড়ির অবস্থাও ভালো নয়। না সারালে পড়ে যাবে—'

ক্ষুদুর মা বলল, 'তাতে কার কি? পরের বাড়ি তো। তাড়িয়ে দেবে শিগগির।'

বিকাশ সবই জানত আগে। সোমনাথের দিদি বলতে কিছু বাকি রাখেননি। আশ্চর্য হল না। কোনো জবাবও দিল না।

ক্ষুদুর মা হতাশ হল। বলল, 'আপনি বসুন। আমি নিচে যাই,' বলে চলে গেল।

অরুণার ঘরটায় শেকল তোলা ছিল। শেকল খুলে ঘরে ঢুকল বিকাশ। বেশ বড় ঘর। রঙ-করা মেজে, দেয়াল। রঙ মলিন হয়ে গেছে। নোনা-ধরা দেয়াল থেকে চুন-বালি খসে পড়ে কুষ্ঠরোগীর গায়ের মতো দেখাচ্ছে। সামনে পাশে জানলা রয়েছে। সব বন্ধ করা। জানলা-দরজা উইয়ে খাওয়া, জীর্ণ, শিথিল। জানলাটি খুলল বিকাশ এক ঝলক আলো ও প্রচুর ঠান্ডা হাওয়া হঠাৎ প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত পেয়ে সাগ্রহে ঢুকে পড়ল। পিছনে একটা জানলা খুলল। তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। বহু দূরে

দৃষ্টি যায় অবারিত প্রান্তর, প্রান্তরের প্রান্তে নীলাভ বনভূমি। মুক্ত প্রকৃতির এই নিশ্চিন্ত বিশ্রামের সহজ ভঙ্গীটি মুগ্ধ করল বিকাশকে।

কিছুক্ষণ পরে ঘরটার দিকে তাকাল। প্রায় খালি! জিনিসপত্র কিছু নেই। এক পাশে একটা খাটে স্বল্প শয্যা বিছানো। একটা দেয়াল-আলমারিতে কতকগুলো বই সাজানো। নিচেই দুটো ট্রাঙ্ক। একটি কিছু বড়, আর একটি নেহাত ছোট। এটি সম্ভবত অরুণার। সামনের দেয়ালে একটা ফোটো টাঙানো। কাছে গিয়ে দেখল, সোমনাথের। সাহেবী পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে একটা টেবিল, কয়েকখানা বই। টেবিলের উপরে একটা হাত রেখে গুরু-গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে সোমনাথ। ফোটোর নিচেই একটি ছোট টেবিল। ধুনুচি ও একটি পেতলের প্রদীপ রয়েছে টেবিলের উপরে। সোমনাথের স্মৃতি পূজার উপকরণ। একটি গাঁদাফুলের মালা ঝুলছে ফোটোটিকে বেষ্টন করে। কয়েকদিন আগে ঝোলানো হয়েছে নিশ্চয়। শুকিয়ে এসেছে। এখানে-সেখানে আরও কয়েকটা জিনিস।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বিকাশ। চোখের দৃষ্টি জানলার বাইরে। তার মনে হল, এই ঘরটিতে সোমনাথ ও অরুণা কতদিন, কত রাত্রি কাটিয়েছে। দুটি হৃদয়ের সংঘর্ষণ ঘটেছে দিনের পর দিন। উদ্গত হয়েছে কত জ্বালা, কত অশ্রু, কত দীর্ঘশ্বাস। শেষে একটি হৃদয় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আর একটি বিকল হয়ে পড়ে আছে। দুটি জীবনের এই মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি বিকাশের অন্তরকে বেদনা-বিধুর করে তুলল।

অরুণা ফিরছে আশ্রম থেকে। পরনে নরুণপাড় ধুতি, সেমিজ, গায়ে-জড়ানো পুরোনো রঙচটা রঙিন গরম চাদর। পা খালি। মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন। সিন্দুরহীন শুভ্র সীমন্তরেখার দু-পাশে রুক্ষ, বিশৃঙ্খল চুলগুলি বাতাসে কাঁপছে। ছোট, সুন্দর কপালটির উপর চূর্ণ-কুন্তল এসে পড়েছে। মুখ ঠোঁট শুকিয়ে গিয়ে যেন খড়ি উঠছে। ওর চোখের দৃষ্টিতে করুণ ঔদাস্য। ওর অন্তরের মধ্যে যে বেদনাকে ও অহরহ বহন করছে, তারই ছাপ ওর মুখে স্পষ্ট ফুটে রয়েছে।

খাড়ি পৌঁছে দরজার সামনে মোটর দেখে ও বিস্মিত হল না।

আজকাল জমিদারের লোক প্রায়ই মোটরে করে আসে। দরজার সামনেই দাঁড়ায়। অনেক সময়ে বিনা অনুমতিতেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে, কোথায় কি মেরামত হবে দেখবার জন্য। আজও হয়তো কেউ ভিতরে ঢুকেছে ভেবে ঘোমটা টানল। উঠোনে পা দিয়ে দেখল কেউ নেই। ক্ষুদুর মা ছিল রান্নাঘরে, চায়ের জল গরম করছিল। কানাই গিয়েছিল চা ও চিনি আনবার জন্য। দুইই আজ ভাঁড়ারে বাড়ন্ত। কাজেই কারও সঙ্গে দেখা হল না অরুণার। ভাবল, জমিদারের লোক তাহলে অন্য জায়গায় গেছে। ঘোমটা সরিয়ে সহজ ভাবে সে দোতলায় উঠল।

সিঁড়ির মাথার কাছের ঘরটা বন্ধ দেখে গিয়েছিল। খোলা দেখে অরুণা একটু বিস্মিত হল। ভাবল, কানাই খুলে রেখে গেছে বোধহয়। যেতে-যেতে থমকে দাঁড়িয়ে, দরজায় মুখ বাড়িয়ে দেখে ওর বিস্ময় প্রবল হয়ে উঠল। এক পাশে যে খাটটা রয়েছে, তার উপর কার জিনিসপত্র! একটা সম্ভাবনার কথা মনে হতেই ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। আজই দখল নিতে এসেছে নাকি? এখুনি তাড়িয়ে দেবে তাদের বাড়ি থেকে? কোথায় যাবে তাহলে? যার জিনিসপত্র কোথায় সে? নানা চিন্তায় আকুল হয়ে উঠল ওর মন। পা দুটো যেন আর চলতে চাইছে না! অথচ যদি এখুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয় তাহলে চলার আর সীমা থাকবে না।

ধীরে-ধীরে নিজের ঘরের সামনে এল। এ দরজাটাও খোলা! দরজার সামনে আসতেই দেখল, সাহেবী পোশাক পরা একটা লোক দরজার দিকে পিছন ফিরে, জানলার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এই লোকটাই দখল নিতে এসেছে বোধহয়। এসেছে তাকে নিরাশ্রয় করতে! জমিদারের কোনো আত্মীয় বুঝি! তাই অর্থের অহঙ্কারে এত কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে উঠেছে যে একজন ভদ্রমহিলার ঘরে ঢুকবার আগে তার অনুমতি প্রয়োজন মনে করেনি। দরিদ্রের প্রতি ধনীর এই অসম্মান, এই উৎপীড়ন, ওর আত্মমর্যাদাকে রূঢ় আঘাত করে মনের মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে দিল। রুষ্ট, কটু কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'মশায়! শুনছেন?'

অরুণার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে মুখ ফেরাল বিকাশ। দেখল — অরুণা দাঁড়িয়ে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে কিছু বলবার আগেই অরুণা রূঢ় কণ্ঠে বলতে লাগল, 'কে আপনি? কেন ঢুকেছেন আমার ঘরে বিনা

অনুমতিতে?' বিকাশ বিস্ময়-বিহ্বল মুখে তাকিয়ে রইল। কণ্ঠস্বর আর ফুটতে চাইল না।

অরুণা ওর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, 'আপনারা বড়লোক। আমরা গরীব। তা বলে কি আমাদের কোনো মর্যাদা নেই। ধনী বলে কি আপনারা আমাদের উপর যা ইচ্ছা তাই ব্যবহার করতে পারেন?'

ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বিকাশ। অরুণার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিকাশের মুখের পরে স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ অরুণার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল। বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে রইল আরও কিছুক্ষণ। ভোরের আকাশের মতো ক্রমে ওর মুখ থেকে বিস্ময়ের ঘোর মিলিয়ে গেল। তারপরই রক্তিমাভা ফুটে উঠল। লজ্জারক্ত মুখে ধীরে-ধীরে বলল, 'আপনি—তুমি কি—বিকাশদা? চিনতে পারিনি।' কাছে গিয়ে প্রণাম করল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কখন এসেছ?'

বিকাশ বলল, 'কিছুক্ষণ আগে। আশ্রমে গিয়েছিলে?'

অরুণা বলল, 'কে বললে?'

'ক্ষুদুর মা।'

অরুণা বলল, 'বস।'

বিছানাটার উপর বসল বিকাশ। ওদিকের দেয়ালে একটা আলনা টাঙানো ছিল। তাতে কয়েকটা আধ-ময়লা শাড়ি-শেমিজ ঝুলছিল। অরুণা ওর গায়ের চাদরটা রাখবার জন্য ওদিকে গেল।

বিকাশ ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। আজ প্রায় আট বছর পরে ওকে দেখল। শরীর আধখানা হয়ে গেছে। লাবণ্যের বিন্দুমাত্র অবশেষ নেই। শীর্ণ মুখখানা আরও লম্বা দেখাচ্ছে। গাল বসে গিয়ে দু-পাশের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে। চুলে কতদিন তেল ঠেকায়নি। কালো কুচকুচে চুল কটা হয়ে উঠেছে। পরনে বিধবার বেশ। অত্যুগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে বৈধব্য পালন করছে অরুণা। যাবার সময় কেমন দেখে গিয়েছিল, কি দেখল ফিরে এসে! মনে হল যে-অরুণাকে সে ভালোবেসেছিল, এ সে নয়। সে তার পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে, আর তাকে পাবে না খুঁজে। বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল।

বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে বিকাশ। অরুণা তার চাদরটা রেখে ফিরল। বিকাশের মুখের উপর দৃষ্টি পড়তেই ভাবল—কি অত ভাবছে?

আমার অবস্থা দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেছে! হবেই তো! কত স্নেহ করত! নিজের বোনের চেয়ে বেশি। এত স্নেহ কারও কাছে পাইনি কখনো। মনে হল, কতদিন দেখিনি ওকে? কেমন দেখতে ছিল তখন? পাতলা ছিপছিপে। এখন পুরুষের মতো দশাসই চেহারা হয়েছে। দেখলে সমীহ হয়। কত ফরসা হয়েছে! দেখে বাঙালী বলে মনে হয় না। কত চঞ্চল ছিল তখন। যে বছর বিলেত যায় সে বছরও গ্রীষ্মের ছুটির সময় দেশে গিয়ে গাছ থেকে আম পেড়ে খাইয়েছিল। এখন কত স্থির কত গম্ভীর হয়েছে! কাছে এসে বলল, 'কি ভাবছ?'

বিকাশ মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে বলল, 'কিছু না, বস—'

মেজেতে বসবার উপক্রম করতেই বলল, 'এখানে বস না।'

বিছানাতে ওর কাছে বসবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। একটা টুল ছিল এক পাশে। অরুণা সেইটে নিয়ে একটু দূরে বসল। আগে পাশাপাশি বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছে। বিলেত যাবার আগের রাত্রেও জ্যোৎস্নাভরা রাত্রিতে বুড়িগঙ্গার ধারে ঘেঁষাঘেঁষি করে চুপচাপ নদীর দিকে তাকিয়ে বসেছিল দুজনে। বিকাশ অরুণাকে জিগগেস করেছিল— ভুলে যাবে না তো?

অরুণা বলেছিল—তুমিই আমাকে ভুলে যাবে। পরীর দেশে যাচ্ছ। ফিরে এসে পেত্নীকে কি আর মনে ধরবে?

অরুণার নমনীয় দেহটিকে গভীর স্নেহে কাছে টেনে নিয়ে বিকাশ বলেছিল—ফিরে এলেই সব বোঝা যাবে—

মনে পড়তেই ম্লান হাসি ফুটে উঠল বিকাশের মুখে। অরুণা আবার জিগগেস করল, 'কি ভাবছ?'

স্বপ্নালুতা ঝেড়ে ফেলে বিকাশ বলল, 'কিছু না—'

অরুণা বলল, 'তোমাকে চিনতে না পেরে ধমক দিয়েছি, কটুকথা বলেছি বলে কিছু মনে করেছ? ক্ষমা চাচ্ছি।'

বিকাশ মৃদু হেসে বলল, 'ক্ষমা চাচ্ছ? ক্ষমা তো তোমার কাছে আমারই চাওয়া উচিত। তোমার বিনা অনুমতিতে তোমার ঘরে ঢুকেছি।'

অরুণা বলল, 'ও কথা বলে অপরাধী কোরো না। তুমি দাদা, ছোট বোনের ঘরে ঢুকতে হবে অনুমতি নিয়ে? বিকাশ-দা! এত পর করে দিয়েছ?'

বিকাশের মুখে এল—আমি দিইনি, তুমি ইচ্ছা করে হয়েছ। চেপে গেল। বলল, 'কে এসেছে বলে তুমি ভেবেছিলে?'

অরুণা বলল, 'জমিদারের লোক।'

'আসবার সম্ভাবনা ছিল বুঝি?'

'হ্যাঁ, যে কোনোদিন আসবে। এসে আমায় তাড়িয়ে দেবে!'

'যাবে কোথায়?'

'স্বামিজী যদি কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন তো ভালো, না হলে পথে গিয়ে দাঁড়াব।'

'সোমনাথের দিদি, ভাগনে এত আগ্রহ করে বার-বার যেতে লিখছে, যাচ্ছ না কেন?'

বিস্ময়ের স্বরে অরুণা বলল, 'কি করে জানলে?'

বিকাশ বলল, 'ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল যে। ওদের কাছেই তো তোমার সব খবর পেলাম।'

ম্লান হেসে অরুণা বলল, 'দিদি কি বলছিলেন? খুব নিন্দে করছিলেন? বলছিলেন, আমি ওঁর ভাইকে মেরেছি?'

বিকাশ চুপ করে রইল।

অরুণা গম্ভীর হয়ে উঠে বলতে লাগল, 'ওঁর দোষ নেই। একমাত্র ভাই এমনভাবে গেল। আমার দাদাও যদি এমনিভাবে যেতেন আমিও তাই ভাবতাম। আমি মনে-মনে জানি উনি আমাকে একেবারেই পছন্দ করেন না। এখানে এসে আমার এখানে ওঠেননি। পাশের গাঁয়ে পিসতুতো ভাইয়ের ওখানে উঠেছিলেন। যারা স্নেহ করে না, শ্রদ্ধা করে না, তাদের দরজায় অনুগ্রহ-ভিক্ষু হয়ে দাঁড়াতে, নিঃসহায়, নিরাত্মীয়, নিঃসম্বল হয়েও আত্মমর্যাদাতে বাধছে।'

বিকাশ বলল, 'একটা কথা জিগগেস করতে পারি?'

'কি?'

'স্বামিজীর কাছে সাহায্য চাইবার আগে আমার কথা একবারও মনে হয়েছিল?'

'তুমি যে ফিরে এসেছ কি করে জানব? এখনো জানি না কবে ফিরেছ। কবে ফিরলে?'

'বছর খানেক আগে—'

‘একা?’

‘দোকা পাব কোথায়?’

‘কেন, মেমসাহেব আসেননি?’

বিকাশ বলল, ‘তুমিও ঐ গুজব শুনেছিলে? আসবার পরই মা আর দিদি বার-বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ঐ কথাটা জানতে চেয়েছিলেন। অনেকদিন ওঁদের সন্দেহ ছিল। মা তো মরবার আগের দিনও জিগগেস করেছিলেন— আমাকে এখনো ঠকাসনি। সত্যি বল। পায়ে হাত দিয়ে বলতে বিশ্বাস করলেন।’

অরুণা সমবেদনার সুরে বলল, ‘জেঠাইমাও গেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

অরুণা ম্লান বিষণ্ণমুখে বসে রইল। বিকাশ একটু চুপ করে থেকে বললে, ‘তোমাকে কে বলল?’

‘উনি। কার কাছ থেকে শুনেছিলেন।’

‘বিশ্বাস করেছিলে?’

ম্লান হেসে অরুণা বলল, ‘সেই দুর্দিনে যখন সবাই চলে যাচ্ছে, সবই চলে গেছে, তখন তোমার ভালোবাসাটুকু যে আমার ভাগ্যে টিকে থাকবে— বিশ্বাস করতে পারিনি।’

‘তাই সোমনাথের সঙ্গে বিয়েতে আপত্তি করনি?’

লজ্জায় অরুণার মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। ধীরে-ধীরে বলতে লাগল, ‘উনি আমাদের জন্য কি করেছিলেন তা তো সব শুনেছ? ঢাকায় গোল-মাল শুরু হতেই তোমাদের বাড়ির সব কলকাতায় চলে এলেন। একবার খোঁজ পর্যন্ত নেননি—আমাদের কি হল, আমরা কি করব। অথচ তোমার বাবার মৃত্যুর পর আমার বাবা তোমাদের বিষয়-আশয় না দেখা-শোনা করলে অনেক ক্ষতি হত তোমাদের। কিছুদিন কাটল ভয়ে-ভয়ে। হঠাৎ একদিন দাদা একটু ঘুরে আসি বলে বাড়ি থেকে বেরোলেন। আর ফিরলেন না।

‘দাদার মৃত্যুর খবর পেয়েই বাবা বিছানা নিলেন। একেবারে পঙ্গু, অকর্মণ্য হয়ে গেলেন। আমাদের বাড়িতে দুবেলা হাঁড়ি চড়া দায় হয়ে উঠল। উনি গিয়ে আমাদের ভার না নিলে আমাদের সকলকে উপোস দিয়ে মরতে হত। আমাদের সংসারের জন্য কত যে হাড়ভাঙা

খাটুনি খাটতেন, দেখেছি তো চোখে। মা মারা গেলেন। উনি না থাকলে সংকার হ্ত না।

'অবস্থা ক্রমে সঙিন হয়ে উঠতেই উনি আমাদের সবাইকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। মুঠো-মুঠো টাকা খরচ হল আমাদের জন্য। কলকাতায় চাকরি জোটালেন অনেক কষ্টে। নিজেকে সব দিক দিয়ে বঞ্চিত করতেন আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে। বাবার শরীরের অবস্থা দিন-দিন খারাপ হতে লাগল। আমি ভয়ে শুকিয়ে উঠতে লাগলাম। আমি জানতাম, উনি আমাকে ভালোবাসেন। আমাদের উপর ওঁর দরদ, আমাদের কল্যাণের জন্য ওঁর প্রতিটি কাজের আড়ালে যে আমার উপর তাঁর সুতীব্র কামনা গা ঢাকা দিয়ে আছে, মনে-প্রাণে তা বুঝতে পারতাম। বাবার মৃত্যুর পর সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় এই কামনার সামনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কি করব, ভেবে দিশাহারা হয়ে যেতাম। তারপরই উনি তোমার বিয়ের খবর নিয়ে এলেন। বিশ্বাস করিনি প্রথমে। উষা ওঁদের কলেজে পড়ত। একদিন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। সেও ঐ কথা শুনেছে বলল।'

'কি করলে তখন?'

'কি আর করব?'

একটা কথা মনে পড়ল বিকাশের :

যাবার দিন তাকে একা পেয়ে অরুণা বলেছিল—তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব। ফিরে এসে আমাকে নেবে তো?

বিকাশ ঠাট্টা করে বলেছিল—যদি আর না ফিরি?

অরুণার মুখখানি মলিন হয়ে উঠেছিল, সভয়ে বলেছিল—ও মা, ও সব কি কথা?

বিকাশ বলেছিল—যদি ভুলে যাই তোমাকে? যদি কোনো মায়াবিনীর কুহকে মুগ্ধ হয়ে থেকে যাই ওখানে?

মুখ আঁধার করে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিল অরুণা—তাহলে আমাকে দয়া করে জানিও। বিষ খেয়ে মরব—

বিকাশকে অন্যমনস্ক দেখে অরুণা বলল, 'কি ভাবছ? ভাবছ, কেন বিষ খেয়ে মরিনি—'

ম্লান হেসে বিকাশ বললে, 'না, না, তা কি ভাবতে পারি?'

অরুণাও সে কথা ভোলেনি তাহলে?

অরুণা বলতে লাগল, 'দিন কয়েক পরেই বাবা আমাকে বিয়ে করার জন্য ওঁকে অনুরোধ করলেন, উনি সাগ্রহে রাজী হয়ে গেলেন।'

বিকাশ বলল, 'সোমনাথের দিদি বলছিলেন, সোমনাথকে নাকি কোনোদিনই স্বামীর অধিকার দাওনি?'

অরুণার মুখের উপরে একটি বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, 'নিজের মনকে রাজী করাতে সময় লাগছিল। উনি আমাদের সকলের জন্যে যা করেছিলেন, তার তুলনায় নিজের দেহটা তাঁর ভোগের জন্য উৎসর্গ করে দেওয়া যে কিছুই নয়, সর্বান্তঃকরণে তা বুঝেছিলাম, কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় ছিল বাধা, তা লঙ্ঘন করতে পারলাম না—'

'কিসের বাধা?'

অরুণা জবাব দিল না। অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিকাশ তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে বলে মনে হয় না। যেন কিশোরী। কত কাহিল হয়ে গেছে! সেই স্বাস্থ্যময়ী, লাবণ্যময়ী আনন্দ প্রতিমা, যাকে সে একদিন ভালোবেসেছিল, এ যেন তার ক্ষীণ ছায়া মাত্র। যাকে পূর্ণিমার পূর্ণ গৌরবে দেখে গিয়েছিল, কে জানত সে অমাবস্যার তীরে এসে ঠেকেছে!

তবু ঐ ম্লান, শীর্ণ মুখখানির দিকে তাকিয়ে ওর অন্তরের স্তব্ধ জমাট স্নেহধারা আবার গলতে শুরু করল। ঐ ক্ষীণ দেহখানিকে বুকের মধ্যে চেপে ওর সমস্ত দুঃখ, গ্লানি নিঃশেষে মুছে দেবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে একান্ত কামনা উদগ্র হয়ে উঠল।

বিকাশ আবার জিগগেস করল, 'বাধা কিসের?'

'বাধা!'

অরুণা মৃদু হাসল, তাকাল বিকাশের দিকে। চোখে চোখ মিলল এতক্ষণ পরে। তার সারা চেতনার মধ্যে একটি আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল মুহূর্তের জন্য, যেন শীত শেষ না হতেই হঠাৎ এক ঝলক দখিনা বাতাস বয়ে গেল ওর মনের উপর। বিকাশের কথা কানে গেল না।

চোখ নামিয়ে নিল অরুণা। বিকাশ আবার জিগগেস করল, 'কে বাধা দিয়েছিল বললে না?'

অরুণা সলজ্জ হাসি হেসে বলল, 'তুমি।'

বিকাশ বিস্ময়ের স্বরে বলল, 'সাত সমুদ্র পার থেকে আমি বাধা দিলাম কি করে?'

অরুণা বলল, 'যাবার আগের দিন নদীর ধারে শিলমোহর করে দিয়ে গেলে যে।' বলে হাসল।

মনে পড়ল দুজনেরই।

সেদিন অরুণা বলে বসল—আমার কি মনে হচ্ছে জানো? আমি তোমাকে আর পাব না। এত বড় ডাক্তার হয়ে আসবে। আমার মতো গরীবের কুৎসিত মেয়ের কাছে তোমার মা দিদি ঘেঁষতে পর্যন্ত দেবে না।

বিকাশ আশ্বাস দিতে লাগল বার-বার। অরুণার মুখের আঁধার ঘুচল না কিছুতেই। বিকাশ বলল—আচ্ছা, আমাকে তোমার হাতে বাঁধা রেখে যাচ্ছি—বলে ওর চোখের পরে চোখ রাখল।

অরুণা বলল—তার মানে? ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে তার বুকের ভিতরটা প্রবলবেগে দুলে উঠল।

বিকাশ ধীরে-ধীরে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ওর ওষ্ঠে একটা চুম্বন মুদ্রিত করে দিয়ে বলেছিল—এই শিলমোহর করে দিলাম দুজনে দুজনকে। এ যেন কিছুতেই নষ্ট না হয় দেখো। আমার নষ্ট হবে না আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি।

বিকাশ বলল, 'তারপর?'

অরুণা বলতে লাগল, 'বিয়ে হল। ফুলশয্যার রাত্রে ওঁর সঙ্গে পাশা-পাশি এক বিছানাতে শুতেই দেহ-মন অস্বস্তিতে ভরে উঠল। চুপ করে পড়ে রইলাম। উনি কত কথা বলতে লাগলেন, কিছুই কানে এল না। তারপর কাছে এসে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। ওঁর ক্ষুধিত, তপ্ত, সুনিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে আমার দেহ হিম অসাড় হয়ে রইল। ওঁর কামনা-ব্যগ্র চুম্বনের নিচে আমার ঠোঁট দুটি কুঁকড়ে, গুটিয়ে রইল। ওঁর বুঝতে দেরি হল না। আমাকে মুক্তি দিয়ে বললেন—তুমি কি বিকাশকে এখনো ভালোবাস?

'আমি চুপ করে রইলাম। উনি বললেন—সে তো তোমাকে ত্যাগ করে অন্য মেয়ে বিয়ে করেছে। তার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকা তো নিষ্ফল। বললাম—সব জানি। মনকে তৈরি করতে পারছি না। আমাকে কিছু সময় দিন। উনি বললেন—তুমি আমাকে স্বামী বলে স্বীকার কর না কর, আমি তোমাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছি। তোমাদের দায়িত্ব আমি চিরদিন সাগ্রহে সানন্দে বহন করব। আমার দেহ-মন সর্বস্ব তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। তুমি এখন অবহেলায় দূরে ঠেলে দিচ্ছ—দাও। তবে যখন ইচ্ছা হবে তুলে নিতে দ্বিধা কোরো না—বলে বিছানা থেকে নেমে পড়বার উপক্রম করতেই সভয়ে বললাম—কোথা যাচ্ছেন? বললেন—তোমার অসুবিধা হবে আমি পাশে থাকলে। অন্যত্র শোবার ব্যবস্থা করি। বললাম—না, না, আজ থাক।

'তার পরদিন থেকে আর কিছু বলেননি। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন গম্ভীর মুখে চুপচাপ থাকতেন। বাইরেই থাকতে লাগলেন বেশি। সকালে বেরিয়ে যেতেন। দুটো টিউশানী সেরে ফিরে এসেই খেয়ে-দেয়ে কলেজ যেতেন। বিকেলে দুটো টিউশানী করতেন। তারপর রাত্রে আবার কলেজে চাকরি করতেন। ফিরতেন রাত দশটায়। খেয়ে-দেয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়তেন। এমনি করে কাটল মাস কয়েক। তারপর অসুখে পড়লেন—'

বিকাশ বলল, 'খুব সেবা করেছিলে শুনলাম।'

অরুণা চোখ বড় করে বলল, 'সেবা করব না? বলছি যে, ওঁর জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারতাম। শুধু দেহটা দিতে পারলাম না।' সক্ষোভে বলল, 'দুর্মতি আর কি!'

বিকাশের মনে আঘাত লাগল। তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকা দুর্মতি মনে হচ্ছে অরুণার? তাকে আর চায় না তাহলে। মুখে নিরাশার ছায়া পড়ল।

অরুণা বলল, 'এত দিলেন, প্রতিদানে কিছুই পেলেন না। এই অকৃতজ্ঞতার পাষাণভার আর সইতে পারছি না, বিকাশদা। মনে হচ্ছে মরে গেলেই বাঁচি!'

বিকাশ বলল, 'সোমনাথের তো যক্ষ্মা হয়েছিল?'

অরুণা বলল, 'হ্যাঁ।'

'যাদবপুরে ছিল বছরখানেক?'

'হ্যাঁ। বেশ সারলেন। শেষ দিন আমি আর দিদি গেলাম। ডাক্তারবাবু আমাকে আর ওঁকে একান্তে নিয়ে গিয়ে বললেন—তোমার স্বামী সেরে উঠেছেন। এর পর ভালো থাকা নির্ভর করছে তোমাদের নিজের হাতে, বিশেষ করে তোমার হাতে। খুব সাবধানে থাকতে হবে দুজনকেই। উনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। চোখে চোখ মিলতেই উনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।'

বিকাশ বলল, 'তারপর তোমরা এখানে ফিরলে—'

অরুণা বলল, 'হ্যাঁ। উনি এখানে আশ্রমের স্কুলে হেডমাস্টারী করতে লাগলেন। বেশ কাটল কদিন। স্বামীজীর কাছে যেতাম প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায়। স্বামীজী কত উপদেশ দিতেন। মহাপুরুষদের জীবনী বলতেন। আবার কত ভালো-ভালো গল্প করতেন। মন প্রফুল্ল হয়ে উঠত। ওঁর শরীর দিন-দিন আরও ভালো হয়ে উঠতে লাগল। তারপর আবার একদিন জ্বর হল। পাশের গাঁয়ে একজন ডাক্তার আছেন—স্কুলে পাশ করা, তাঁকেই ডাকলাম। বললেন—সর্দি জ্বর, ভয় নেই। দিন কয়েকের মধ্যেই সেরে উঠবেন। কিন্তু তারপর থেকেই একটা পরিবর্তন দেখা গেল। দিনেরবেলায় স্বাভাবিক মানুষ, কিন্তু রাত্রি হলেই অন্য মানুষ। আমার দেহটাকে ভোগ করবার জন্যে শুরু হল টানাটানি। ডাক্তারের উপদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বোঝাতাম। কোনো কথা শুনতেন না। জোর-জবরদস্তি করতেন। মেরেছেনও কোনো-কোনোদিন। পায়ে ধরে কেঁদেছেন, মাথা ঠুকেছেন মাটিতে। অন্য ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়েছি। নির্লজ্জভাবে দরজায় ধাক্কা দিয়েছেন।'

একটু চুপ করে থেকে অরুণা বলল, 'সে সব রাতের কথা মনে হলে এখনো ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। এখনো স্বপ্ন দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠি। কোনো রাত্রে আবার ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে যেতেন। জড়িয়ে ধরে চিৎকার করতাম। রাঁধুনীদিদি ছুটে আসতেন চিৎকার শুনে। ওকে দেখলেই থেমে যেতেন। ঐটুকু চক্ষুলজ্জা তখনো ছিল। দিন হলে কিন্তু আবার যে কে সেই। সেই শান্ত গম্ভীর মানুষ।'

বিকাশ বলল, 'সোমনাথ তো আত্মহত্যা করেছিল?'

বেদনার গাঢ় ছায়ায় মুখখানি কালো হয়ে উঠল অরুণার। বলল,

৩(৯১)

'হ্যাঁ।' একটু থেমে তারপর বলল, 'আমাদের বাড়ির কাছেই বাউরী পাড়া। ওদের মেয়েগুলো ভালো নয়। একটা মেয়ে শহরে বেশ্যাবৃত্তি করে। সে ফিরে এল গাঁয়ে। বাড়ির সামনে, এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখতাম মেয়েটিকে। দেখতে-শুনতে মন্দ নয়। ভদ্রলোকের মেয়েদের মতো ঢঙ-ঢাঙ। এই মেয়েটির জালে ধরা পড়লেন উনি!'

বিকাশ সবিস্ময়ে বলল, 'তাই নাকি?'

অরুণা বলল, 'জানতে পারিনি প্রথমে। বিকেলে বাড়ি ফেরেন না। একেবারে রাত দশটায় ফিরতে লাগলেন। জিগগেস করলে বলতেন—কি হবে সাত-তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে? কে আছে আমার?

'চুপ করে থাকতাম। কিছু বলবার মুখ ছিল না তো। শেষে বললেন, গাঁয়ে আমার এক বন্ধু এসেছে। বাল্যবন্ধু। তার কাছে গিয়ে গল্প করি। কানাইকে দিয়ে খোঁজ নিলাম। একজন এসেছেন বটে। তিনি ওঁর বাল্যবন্ধুও বটে। এ গ্রামে কয়েক ঘর শুঁড়ী আছে—তাদের পাড়ার। শহরে মদের দোকান আছে ভদ্রলোকের। শহরেই থাকেন। খুব বড়লোক হয়েছেন আজকাল। আমি আর কিছু বলিনি। আমাদের একজন বাউরী ঝি আছে—সে একদিন রাঁধুনীদিদির কাছে সব ফাঁস করে দিল। ওরা দুজনে সেই বাউরী মেয়েটার কাছে রাত দশটা পর্যন্ত থাকে। দিদি আমাকে বলে দিল।

'উনি বাড়ি ফিরতেই বললাম—সব জানতে পেরেছি। এ-সব কি করছেন? ডাক্তারবাবুর কথা একেবারে ভুলে গেলেন? মারা যাবেন যে!

'বললেন—মরতে তো চাই। তুমি আমার কে যে আমাকে নিষেধ করছ? যাকে স্বামীর অধিকার দাওনি—তাকে বাঁচতে বলবার তোমার অধিকার নেই। বললাম—বেশ তো, আমাকে ছেড়ে দিন, নিজের পথ দেখে নিই। আপনার ঘাড়ে চেপে থাকবার কি অধিকার আছে আমার? বললেন, আমার দেবার অধিকার তো আমি ত্যাগ করিনি। তোমাকে স্ত্রী বলে তো কোনোদিন অস্বীকার করিনি।

'কি করি ঠিক করতে না পেরে ছটফট করতে লাগলাম। ভাবলাম, স্বামীজীকে বলে দিই। কিন্তু ভয় হল পাছে হিতে বিপরীত হয়। কিছু করে বসেন। শেষে স্থির করলাম—ওঁর কামনার আগুনে নিজেকেই আহুতি দেব। তাতে হয়তো ওঁর ক্ষুধার তীব্রতা কমে গিয়ে উনি আবার

স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন। সেদিন রাত্রে ফিরলেন খুব গম্ভীর চিন্তিত মুখে। খেতে চাইলেন না। না খেয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি কাছে যেতেই চমকে উঠে বললেন—কি চাও? বললাম—তোমার পাশে শুতে—

'অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হাসলেন। অদ্ভুত হাসি! সমস্ত জীবনের সব আশা, সব কামনার চিতাগ্নির জ্বালা ওঁর মুখে যেন জ্বলজ্বল করতে লাগল। বললেন—আজ থাক। শরীরটা ভালো নেই। বলে মুখ ফিরিয়ে শুলেন। পদাহত, লাঞ্ছিত আত্মমর্যাদা নিয়ে নিজের বিছানায় ফিরে এলাম। সেই রাত্রেই আত্মহত্যা করলেন।'

বিকাশ জিগগেস করল, 'কোথায়?'

'ও পাশের ঘরে। ঘরটায় অনেকদিনের পুরোনো নানা জিনিসপত্রে ঠাসাই হয়ে আছে। অত্যন্ত অপরিষ্কার। ও ঘরেই গলায় দড়ি দিয়েছিলেন।'

দুজনে চুপচাপ বসে রইল। ওদের ঘিরে একটি শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধতা থমথম করতে লাগল।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অরুণা বলল, 'সে রাত্রির কথা ভুলতে পারিনি। তাঁকেও ভুলতে পারিনি। আমার অন্তর-বাহির জুড়ে বসে আছেন—সারা দিন-রাত! জাগরণে-স্বপ্নে তিনি আমাকে ঘিরে রয়েছেন।' একটু থেমে বলল, 'ওঁর ছবির কাছে দাঁড়িয়ে ওঁর কাছে ক্ষমা চাই। বলি, এবার নাও আমাকে। তোমার পাশে স্থান দাও। আর যে একলা থাকতে পারি না।'

ক্ষুদুর মা ঘরে ঢুকল—এক হাতে রেকাবীতে কতকটা হালুয়া, আর এক হাতে জলের গ্লাশ। ওকে দেখেই অরুণা বলল, 'আমি একেবারে অপদার্থ হয়ে গেছি, বিকাশদা! খালি গল্পই করছি। কিন্তু তুমি খেয়েছ কিনা একবার জিগগেসও করিনি। খেয়ালও হয়নি। ভাগ্যে দিদি তোমাকে দেখেছিল, না হলে—'

বিকাশ বলল, 'উপোস দিতাম না। নিজেই তোমাকে মনে করিয়ে দিতাম যে খিদে পেয়েছে। তবে জানি তো ক্ষুদুর মা দেখেছে, ব্যবস্থা করবেই এখন।'

বিকাশ কোটখানা খুলে ফেলে বিছানায় রাখল। ইতিমধ্যে কানাই সামনের বারান্দায় এক বালতি জল রেখে গিয়েছিল। বিকাশ বাইরে গিয়ে হাত ধুলো। অরুণা যে টুলটায় বসেছিল, তাতেই খাবার রেখে গিয়েছিল ক্ষুদুর মা। অরুণা কাছেই দাঁড়িয়েছিল। বিকাশ এসে বসে খেতে শুরু করল।

অরুণা জিগগেস করল, 'খুব খিদে পেয়েছিল বুঝি?'

বিকাশ বলল, 'পেয়েছিল বৈকি।'

'কলকাতা থেকে আসছ?'

'হ্যাঁ।'

'কখন বেরিয়েছিলে?'

সময়টা জানাল বিকাশ।

এতদিন পরে এতদূর থেকে তার কাছে এল — তার খাওয়ার কথাটা তার মনে পড়ল না। এই ত্রুটির খোঁটা মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল অরুণার।

খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে এসে বসতেই চা নিয়ে এল কানাই। চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে বিকাশ বলল, 'কানাই! পাশের ঘরটা একটু পরিষ্কার কর বাবা।'

অরুণা জিগগেস করল, 'তুমি কদিন থাকবে?'

বিকাশ বলল, 'সেটা তোমার উপর নির্ভর করছে। তুমি যেদিন যাবার জন্য প্রস্তুত হবে, সেদিনই যাব।'

বিস্মিত-কণ্ঠে অরুণা বলল, 'তার মানে?'

বিকাশ বলল, 'তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

অরুণা বলল, 'কোথায় নিয়ে যাবে?'

বিকাশ বলল, 'কোথায় আবার? এখন কলকাতায়। তারপর যেখানে চাকরি করব সেখানে।'

অরুণা বলল, 'আমাকে টানাটানি কোরো না ভাই! যতদিন পারি এখানেই থাকতে চাই।'

বিকাশ বলল, 'এখানে তোমার কিসের আকর্ষণ?'

'এখানে উনি রয়েছেন। এখানে থাকা একেবারে অসম্ভব না হয়ে ওঠা পর্যন্ত ওঁকে ছেড়ে যেতে চাইনে —'

বিকাশ বলল, 'ও সব পাগলামী ছেড়ে দাও রুনু। এখান থেকে তোমার অবিলম্বে যাওয়া দরকার। এই আবহাওয়ায় থেকে তোমার মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে। এখান থেকে অন্যত্র গিয়ে পাঁচজনের সঙ্গে না মিশলে তোমার মন সুস্থ হবে না।'

বহুদিন পরে বিকাশের 'রুনু' ডাক শুনল অরুণা। ওই শুধু আদর করে ওকে 'রুনু' বলে ডাকত। মনের মধ্যে একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। বিকাশের সব কথা কানে গেল না। নিজের কথারই যেন পুনরাবৃত্তি করল, 'না ভাই, মণ্টুদা!'

বিকাশ হেসে বলল, 'ডাকটা ভোলোনি তাহলে।'

অরুণাও হাসল।

বিকাশ বলল, 'না যাও তো থাকবে কোথায়? দু-চারদিন পরেই তো তাড়িয়ে দেবে বলছিলে।'

অরুণা বলল, 'এখানে একটা মেয়েদের জন্য হাই স্কুল হবে—স্বামীজী একটু বললেই সেখানে আমার চাকরি হয়ে যাবে।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'চাকরি না হয় তো চলে যাব এখান থেকে। উনি বুঝবেন, আমার থাকার উপায় নেই বলে চলে গেলাম।'

বিকাশ বলল, 'আর উনি-উনি কোরো না রুনু। উনি তোমার কোথায়? সে তো ফুরিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রাণ-পাখি দেহ-পিঞ্জর থেকে ছাড়া পেয়ে উড়ে পালিয়েছে অনন্ত শূন্যের মধ্যে। উনি তোমার অন্তরে থাকতে পারেন, বাইরে কোথাও নেই। তোমাকে ঘিরে কেন, তোমার ত্রিসীমানায় কোথাও নেই। কাজেই ওঁর ছবির সামনে মাথা ঠোকা, ক্ষমা চাওয়া, ধূপ-ধুনো প্রদীপ জেবলে দুবেলা পুজো করা—সব বৃথা। তুমি যাই কর, যাই বল, ও কিছুই দেখবে না, কিছুই শুনবে না, এই পৃথিবী থেকে ও নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে—'

অরুণা চুপ করে শুনছিল। হঠাৎ আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'আর অমন করে বোলো না, মণ্টুদা।'

বিকাশ বলল, 'তোমার যা রোগ হয়েছে—এই শক্ত সত্যি কথাই তোমার পক্ষে মহৌষধ। না হলে তোমার রোগ সারবে না।'

দুজনে চুপ করে রইল।

বিকাশ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'স্বামীজীর চাকরি থাক, আমার সঙ্গে যাবার

জন্য প্রস্তুত হও। তোমাকে না নিয়ে আমি এক পা নড়ব না। এখানে থাকতে চাও, আমিও থেকে যাব এখানে।'

অরুণা বলল, 'সে কি!'

বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ, এখানে থাকব। প্র্যাকটিস করব—'

অরুণা বলল, 'পাগল আমি হইনি, মণ্টুদা, পাগল হয়েছ তুমি। বিলেত থেকে এত বড় ডাক্তার হয়ে এসে, এই পাড়াগাঁয়ে প্র্যাকটিস করবে?'

বিকাশ বলল, 'তুমি সঙ্গে যেতে না চাইলে আমাকে তাই করতে হবে—'

অরুণা বলল, 'আমাকে নিয়ে কি হবে? এই তো শরীর! দুদিন পরে মরে যাব। এখানেই মরতে দাও আমাকে—'

বিকাশ বলল, 'আমি যখন এসে পড়েছি, তখন আর ভেব না, ভয় নেই তবে শরীর—হ্যাঁ, শরীরটা বিশ্রী হয়ে গেছে বটে, চেনা যায় না—'

যেন অপ্রস্তুত হল এমনি হাসি হেসে অরুণা বলল, 'খুব বিশ্রী হয়ে গেছে! ঘেন্না করছে তোমার?'

'আমার কথা বাদ দাও। তোমার ওঁর করত। যাকে পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। এখন একবার দেখলে পাগলামীটা কেটে যেত, এমন ভাবে মরতে হত না।'

অরুণা বলল, 'ছিঃ! অমন করে বলতে আছে! তোমার বন্ধু ছিলেন তো!' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার ভালো লাগছে বুঝি?'

বিকাশ বলল, 'বললাম যে, আমার কথা বাদ দাও। তোমার চেহারা ভালো কি মন্দ, তার উপরে আমার ভালো লাগা, না-লাগা, নির্ভর করে না। ডিগডিগে চেহারা, এক ফোঁটা ন্যাড়া মাথা ফ্রক-পরা মেয়ে—কাছে-কাছে ঘুরতে, হুকুম তামিল করতে, কখনো বা খুনসুটি করতে। তখন না ছিল রূপ, না ছিল যৌবন। তখন ভালো লেগেছিল তোমাকে, তখনই ভালোবেসেছিলাম তোমাকে—'

অরুণা বলল, 'আর তুমি? তালপাতার সেপাই, হাফপ্যাণ্ট পরা, হাতে-পায়ে অজস্র কাটা-ছেঁড়ার দাগ, দুষ্টু ছেলেদের সর্দার—'

'তোমার একবার বসন্ত হয়েছিল মনে আছে? কাছে যাওয়া বারণ ছিল। তোমার দাদা তো পাশে ঘেঁষত না। স্কুল কামাই করে কে কাছে গিয়ে বসে থাকত!'

জটিল সমস্যা-সঙ্কুল বর্তমান সরে গিয়ে আনন্দময় স্মৃতি-জড়িত অতীত এসে দুটি হৃদয়কে হঠাৎ এক সঙ্গে বেঁধে দিল। দুটি হৃদয়ের মধ্যে স্নেহ-প্রবাহ বইতে লাগল।

বিকাশ হঠাৎ বলে বসল, 'সোমনাথের দিদি কি বলছিলেন জানো?'

অরুণা জিজ্ঞাসু মুখে তাকাল।

বিকাশ একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল, 'বলছিলেন—'

একটু থেমে আবার বলল, 'বলছিলেন, অরুণা সোমনাথের স্ত্রী হয়নি কোনোদিন। ওকে তুমি বিয়ে কোরো। ও তোমাকে ভালোবাসে, তোমাকে পেলে ও খুশি হবে—'

অরুণার মুখ লাল হয়ে উঠল, লজ্জায়, রাগেও! বলল, 'ওঁর নিজের দিদি হয়ে ও কথা বলছিলেন? ছিঃ! বলছি যে আমাকে ওদের সংসর্গ থেকে, সম্পর্ক থেকে ছেঁটে দিতে পারলে উনি বাঁচেন। চিঠিতে যে আত্মীয়তা দেখান সেটা ভুয়ো—মিথ্যে।'

বিকাশ বলল, 'উনি অন্যায় কিছু বলেননি। বুদ্ধিমতী তো, তোমার মন জানতে পেরেছেন। তাই বলেছেন।'

অরুণা তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, 'উনি নিজের মন জানেন, তাই আমার মন জানতে পেরেছেন?'

বিকাশ বলল, 'বেশ, উনি তোমার মন জানেন না স্বীকার করে নিচ্ছি। তুমি তো জানো? তুমি কি আমাকে চাও না?'

অরুণা বলল, 'চাওয়া, না-চাওয়া আমি বুঝি না। তোমার কথা ভাবি মাঝে-মাঝে। দেখতে ইচ্ছা হয়। আজই তো ঠাকুরকে বলছিলাম, কবে মরে যাব—একবার যেন দেখতে পাই, ঠাকুর!'

বিকাশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'কেন দেখতে চাইতে?'

অরুণা বলল, 'কতদিন দেখিনি বল তো? প্রায় আট বছর হয়ে গেল। অথচ দুদিন না দেখলে অস্থির হয়ে যেতাম। মানুষের মন কত সহ্য করে! কত বদলায়!'

বিকাশ বলল, 'আচ্ছা রুনু! একটা কথার জবাব দাও। আমাকে একটুও ভালোবাস না?'

অরুণা চিন্তাকুল মুখে বসে রইল কতক্ষণ।

তারপর ধীরে-ধীরে বলল, 'ভালোবাসি। তবে স্বামী-স্ত্রী হয়ে

সংসার পাতবার মতো নয়। ভাইয়ের উপরে বোনের ভালোবাসা যেমন, তেমনি —'

বিকাশ ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল, 'কিন্তু রুনু, আমি যে তোমাকে চাই — আমার দেহ-মন-আত্মা দিয়ে। তুমি আমার হৃদয়লক্ষ্মী, গৃহলক্ষ্মী, আমার সন্তানদের জননী হবে, এ যে আমার চিরদিনের সাধ, চিরদিনের স্বপ্ন। শুধু আমার জন্যই কি তুমি আমাকে নিতে পারবে না?'

বিছানা থেকে নেমে একবার ঘরটির ও প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসে অরুণার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'হয়তো তুমি সোমনাথকে ভালো-বেসেছ। তাতে ক্ষতি কি? ওদেশের একই মেয়ে পর-পর দু-তিনজনকে বিয়ে করে। হয়তো মেয়েটি প্রত্যেককেই ভালোবাসে সাময়িক ভাবে। কিন্তু সর্বপ্রথম ভালোবাসা মনের গভীর স্তরে বাসা বাঁধে। তাকে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারে না। তোমার-আমার ভালোবাসা তো দুদিনের নয়, দেওয়া-নেওয়ার উপরেও গড়া নয়; আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে এই ভালোবাসা। একে তুমি ছাঁটবে কি করে? বুকের স্পন্দন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো এযে বেঁচে থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজন। একে তুমি ছাড়বে কি করে?'

একটি ছেলে ঘরে ঢুকল। বছর ষোলো বয়স। এসে বিকাশকে তারপর অরুণাকে প্রণাম করল। তারপর লজ্জিত মুখে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

অরুণা বলল, 'আমাদের ক্ষুদু —'

বিকাশ সাগ্রহে বলল, 'তাই নাকি? অনেক বড় হয়েছে। ছোট্টটি দেখে গিয়েছিলাম।' তারপর ক্ষুদুকে সম্বোধন করে বলল, 'কি করছ?'

অরুণা বলল, 'এখানকার জমিদারের কাছারীতে কাজ করে। এ বছর পুজোয় জমিদারবাবুর গিন্নি দেশে এসেছিলেন। দিদি তাকে গিয়ে ধরেছিল ছেলের চাকরির জন্য। গিন্নি গোমস্তাকে ডেকে চাকরির ব্যবস্থা করেন। গিন্নি আশা দিয়ে গেছেন ওদের দুজনকে নিজের কাছে চাকরি দেবেন।'

বিকাশ বলল, 'বেশ হয়েছে। সুখে থাক সব।'

ছেলেটি চলে গেল।

বিকাশ বলল, 'ওদের ব্যবস্থা তাহলে এক রকম হয়ে গেছে। সমস্যা তো অনেক সরল হয়ে গেছে। তুমি যদি একটু সরল হও, তো অচিরে সমাধান হয়ে যাবে।'

অরুণা কিছু বলল না।

বিকাশ বলল, 'পোশাকটা ছাড়তে চাই—'

অরুণা বলল, 'বেশ তো, ছাড়। আমি নিচে যাই। দিদি কি রান্নার ব্যবস্থা করেছে দেখিগে।'

অরুণা বেরিয়ে গেল।

অরুণা রান্নাঘরের বারান্দায় বসে তরকারি কুটছিল। বিকাশ কাছে এসে দাঁড়াল। পরেছে ধুতি, শাদা টুইলের হাফ-হাতা শার্ট, পায়ে স্যান্ডাল। অরুণা মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, 'বাঙালী সেজে গেলে যে!'

বিকাশ বলল, 'সাহেব সেজেছিলাম বল। সাজ খুলে ফেলে, নিজের পোশাক পরলাম।'

অরুণা বিকাশকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মুখ নামিয়ে নিজের কাজ করতে লাগল।

বিকাশ বলল, 'ও সব রেখে দাও। চল বেড়িয়ে আসি।'

অরুণা বলল, 'তা কি হয়! এমনিই বেলা হয়ে গেছে। রান্নাবান্না শেষ হতে বেলা দুটো বেজে যাবে।'

'তা যাক। ক্ষুদুর মা যা পারে করবে এখন।'

অরুণা মৃদু হেসে বলল, 'তা বৈকি। ক্ষুদুর মা'র হাতের রান্না তোমার মুখে রুচবে? আমি নিজে রান্না করব।'

'তুমি আবার রান্না করতে শিখলে কবে?'

অরুণা তর্জন করে উঠল, 'নেমকহারামী কোরো না, মন্টুদা! চড়ুই-ভাতিতে, ভাইফোঁটাতে, কতবার আমার হাতের রান্না খেয়েছ যে! একবার চড়ুইভাতির কথা মনে পড়ে? আমি আর উষা রান্না করলাম। তোমরা সব শিকার করতে গেলে, ফিরলে বেলা চারটেয়, একেবারে খালি হাতে। কত ধমক দিলাম।'

অরুণার চোখে স্বপ্ন ঘনিয়ে এল সেই মধুর দিনগুলির। কোথায় চলে গেল সব! আর এখন?

বিকাশেরও মনে হল—'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না'—উড়ে গেছে সব! আর ফিরবে না। এমনি করে দিনের পর দিন চলে যাবে, পরমায়ু শেষ হয়ে গিয়ে মৃত্যু সামনে এসে দাঁড়াবে। অথচ এখনো কিছু পাওয়া হল না। সব রইল নাগালের বাইরে।

বিকাশ বলল, 'আচ্ছা রুনু, একদিন চড়িভাতি করবে? ঠিক আগের দিনের মতো—তুমি, আমি, উষা—'

অরুণা বলল, 'উষাকে পাবে কোথায়?'

বিকাশ বলল, 'জানো না? উষা কাছেই থাকে। এখানকার জেলা-শহরে। ওর স্বামী এখানকার এস. ডি. ও।'

অরুণা নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, 'তাই নাকি!'

বিকাশ বলল, 'বল তো ওদের খবর দিই—'

অরুণা বলল, 'আমার মতো হতভাগীর কি ওর মতো ভাগ্যবতীর সঙ্গে মেশা উচিত?'

বিকাশ বলল, 'তোমার ভাগ্য তো হত নয়, রুনু, আহত। আমার হাতে কেস ছেড়ে দাও। ও আমি দুদিনে সারিয়ে দেব, দেখ।'

অরুণা বলল, 'ও আর সারিয়ে কাজ নেই। এমনি চলে গেলেই বাঁচি।'

এই বলে মুখ নামিয়ে অরুণা কাজে মন দিল। বিকাশ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। অরুণার দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ মুখ তুলে চোখাচোখি হতেই অরুণা বলল, 'কি এত দেখছ?'

বিকাশ বলল, 'ভাবছি, টাটকা ফুলটির মতো তাজা হাসি-খুশি মেয়েটিকে রেখে গেলাম, এসে দেখি কে ছিঁড়ে চটকে ফেলে দিয়েছে।'

চোখে জল এল অরুণার। মুখ নামিয়ে গোপন করল। একটু সামলে বলল, 'কোথাও বেড়াতে যাবে নাকি?'

বিকাশ বলল, 'একা ভালো লাগবে না।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বাঙলাদেশের এ-রূপ আমাদের চোখে ভালো লাগবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা রূপ দেখতেই চোখ আমাদের অভ্যস্থ। এখানকার কঠিন, বৈরাগিনীর রূপ দেখে মন ভরে না।'

অরুণার মুখে পূর্বস্মৃতির আভা পড়ল। বলল, 'সত্যি!' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'কোথায় জন্মালাম, বড় হলাম, এখন বন্যায় ভেসে যাওয়া কাঠ-কুটোর মতো কোথায় এসে ঠেকলাম।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'পুজোর সময় বাড়ি যাওয়ার কথা মনে পড়ে? শেষ রাতে বেরোতে হবে। সারা রাত্রি কারও চোখে ঘুম নেই। বার-বার এ-বাড়ি ও-বাড়ি করছি, কাদের আয়োজন কত দূর এগোলো দেখতে। তুমি আর দাদা কত মতলব আঁটছ; লুকিয়ে সিগারেট টানছ; আমি কাছে গিয়ে পড়লেই চোখ রাঙিয়ে শাসাচ্ছ। তারপর, দুবাড়ির লোকজন পর-পর দুটো নৌকোয় যাওয়া। কত গল্প কত হাসি! ভোরবেলায় গাঁয়ের ঘাটে পৌঁছে

শুনি, মন্দিরে সানাই বাজছে।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'প্রায়ই একা একা বসে ভাবি ঐ সব কথা। কি হয়ে গেল! কত স্বপ্ন দেখতাম! সব ফুল হয়েই ঝরে গেল। ফলল না।'

বিকাশ অরুণার কাছে বসে পড়বার উপক্রম করতেই অরুণা বলল, 'ঐ আসনটা টেনে নিয়ে বস, কাপড়টা ময়লা করছ কেন?' বিকাশ বসতেই বলল, 'বিলেত থেকে ফিরে এসে দেশের বাড়িতে গিয়েছিলে নাকি?'

বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ।'

অরুণা বলল, 'কত বড় বাড়ি তোমাদের! দুর্গার মন্দির, নাটমন্দির, পুকুর, বাগান—বাগানে কত আম, কাঁঠাল, নারকেল গাছ, সব গেছে না কিছু আছে?'

বিকাশ বলল, 'বাড়ির দরজা সব খুলে নিয়ে গেছে। নাটমন্দিরের ছাদ ভেঙে কড়ি-বরগা সব নিয়ে চলে গেছে, দুর্গামূর্তি ভেঙে-চুরে ফেলে দিয়েছে, বাগানের গাছ বেপরোয়া কেটে নিয়ে যাচ্ছে; জমি-জায়গা ভোগ করছে। দু-চারজন মুরুব্বিদের ডেকে বললাম। তারা বলল—আমরা কি করব বলুন! ছেলে-ছোকরারা আমাদের কথা শুনতে চায় না। দু-একজন স্পষ্ট বলল—এখানে আর থাকতে পারবেন না যখন—তখন এ-সবের মায়া করে কি করবেন। কিছু-কিছু দাম নিয়ে ছেড়ে দিয়ে যান। তারও চেষ্টা করলাম, খদ্দের পেলাম না।'

'শহরের বাড়ি কি হল?'

'বাবার এক বন্ধু সাহায্য করলেন। এক মিঞাসাহেব কিনল। দাম দিল কিছু।'

'আমাদের বাড়ির খবর নিয়েছিলে?'

'নিয়েছিলাম। একজন শেখ বাস করছে। তোমাদের রান্নাঘরে মাংস ঢুকতে পেত না। এখন গো-মাংস রান্না হচ্ছে।'

দুজনে চুপ করে বসে রইল কতক্ষণ। দুজনেরই নিঃশ্বাস পড়ল।

ক্ষুদুর মা খিড়কির পুকুর থেকে স্নান সেরে ফিরল। বিকাশকে দেখে মুখ নামিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

বিকাশ বলল, 'সোমনাথের পিসতুতো দাদা—অর্থাৎ তোমার পূজনীয় ভাসুরমশায় তোমার খবর নিচ্ছেন না?'

অরুণা মৃদু হেসে বলল, 'নিচ্ছেন বৈকি। ক্ষুদুর কাছে রোজই খবর

নেন এখান থেকে যাচ্ছি কবে। উনিই তো জমিদারের ম্যানেজার। তা ছাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। গ্রামের মোড়ল। খুব প্রতিপত্তি এখানে। উনিই রটিয়েছিলেন যে আমি তোমার বন্ধুর বিবাহিতা স্ত্রী নই—রক্ষিতা। লাইফ ইনশিওরেন্স থেকে টাকা বার করবার সময়ে বাগড়া দেবার চেষ্টা করেছিলেন। স্বামীজী না থাকলে টাকা পেতে রীতিমতো বেগ পেতে হত।'

বিকাশ বলল, 'তাহলে এখানকার লোক তোমার উপর প্রসন্ন নয়?'

'না। একে তো বিদেশী। তার উপরে ওঁর ওভাবে মৃত্যু হল। আমিই ওঁর মৃত্যুর কারণ, এই কথাটা আমার ভাসুর সকলের কাছে প্রচার করলেন। তাঁর দিদি এসেও মুখে না হোক, আচরণে সায় দিয়ে গেলেন। এই সব নানা কারণে এখানের মেয়ে-পুরুষ কেউ আমাকে পছন্দ করে না। আমি গেলে ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।'

বিকাশ বলল, 'তাহলে এখানের স্কুলে চাকরি করবে কি করে?'

'স্বামীজী পিছনে থাকলে কেউ কিছু করতে পারবে না।'

'স্বামীজী কি চিরদিন এখানে থাকবেন? ওঁদের কত জায়গায় প্রতিষ্ঠান আছে। কখন হয়তো অন্যত্র চলে যাবেন।'

অরুণার মুখ চিন্তান্বিত হয়ে উঠল।

বিকাশ বলল, 'তখন তো গাঁয়ের লোকরা তোমাকে স্কুল থেকে, এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে। কি করবে তখন?'

অরুণা উদাস-কণ্ঠে বলল, 'কি করব? উনি যা বলবেন তাই করব।'

বিকাশ কড়া গলায় ধমক দিয়ে বলল, 'দেখ রুনু! পাগলামী কোরো না। আমি ডাক্তার। আমি জানি তুমি সুস্থ নও। তোমার রীতিমতো চিকিৎসার দরকার। এখান থেকে যত শিগগির পারি নিয়ে গিয়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

অরুণা কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল, 'আমি যদি না যাই?'

'জোর করে নিয়ে যাব। ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে, রাতারাতি মোটরে করে তুলে নিয়ে যাব।'

অরুণা সভয়ে বলল, 'ওমা—সে কি!'

বিকাশ বলল, 'তুমি পাগল হয়ে গেছ। তোমার কিসে মঙ্গল হবে তা বোঝবার ক্ষমতা হারিয়েছ। আমি যখন এসে পড়েছি, তখন এখন

থেকে তোমার ভালো-মন্দের দায়িত্ব আমার। আমি ছাড়া পৃথিবীতে তোমার সত্যিকার আপনার কে আছে? আমার চেয়ে কে তোমার কল্যাণ-কামী?'

অরুণা ভয়ে-ভয়ে বলল, 'আমি কি অস্বীকার করছি?'

বিকাশ বলল, 'তাহলে ও সব বাজে কথা বল না। যা বলি তাই কর।' তারপর কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে বলল, 'দেখ রুনু, একটা কথা তোমাকে বলি। মানুষের জীবন এমন কিছু হেলা-ফেলার জিনিস নয় যে একটা বাজে সেণ্টিমেণ্টের জন্য তা নষ্ট করে দিতে হবে। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মিলন-বিচ্ছেদের অম্ল-মধুর রসে ভরা এই জীবন যদিও বহু ভাগ্যে পেয়েছ, তার শেষ কণাটি পর্যন্ত পান করে নাও। তাহলে মৃত্যু যখন আসবে, পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে নিজেকে তার হাতে সঁপে দিতে পারবে।'

ওর দিকে তাকিয়ে ছিল অরুণা। কথা শেষ না হতেই বলে উঠল, 'ভারি আশ্চর্য মনে হচ্ছে, মণ্টুদা! কোনোদিন ভাবিনি তোমার কাছে বসে আবার তোমার সঙ্গে কথা বলতে পাব—'

বিকাশও বলল, 'সত্যি! আমিও ভাবিনি। কলকাতায় এসে তোমাদের অনেক খোঁজ করলাম। কোথাও খোঁজ পেলাম না। ভাবলাম আর এ-জীবনে দেখা হবে না। কিন্তু আবার দেখা হয়ে গেল। আবার তোমাকে কাছে পেলাম। আশ্চর্য বৈকি!'

ক্ষুদুর মা রান্নাঘরে এল। একটু পরে কাছে এসে বলল, 'দাদাবাবু কি আর একবার চা খাবেন?'

বিকাশ পুলকিত হয়ে উঠে বলল, 'নিশ্চয়—'

অরুণা বলল, 'এত বেলায় চা খেয়ে কি হবে?'

বিকাশ বলল, 'তোমার আপত্তি কিসের? তুমি তো আর খাচ্ছ না—'

অরুণা বলল, 'বেশি চা খাওয়া ভালো কি?'

বিকাশের মা ছেলে-মেয়েদের বেশি চা খাওয়াতে আপত্তি করতেন। অরুণাদের বাড়ি গিয়ে ওর দাদার সঙ্গে মিশে বিকাশ পেয়ালার পর পেয়ালা চা খেত। অরুণা সাধ্যমতো বাধা দিত। কখনো চায়ের বদলে এক কাপ দুধ এনে দিত। দুজনের মধুর কলহ হত এই নিয়ে। মনে পড়ল বিকাশের। বলল, 'রুনু, তখনো তুমি এই রকম আপত্তি করতে—'

খেতে-খেতে বেলা দুটো বেজে গেল। ষোড়শোপচারে ভোগের আয়োজন করেছিল অরুণা। প্রত্যেকটি পদ নিজে রান্না করেছিল। যা-যা বিকাশ ভালোবাসে যতদূর সম্ভব যোগাড় করেছিল কানাইকে পাঠিয়ে-পাঠিয়ে। মাছ যোগাড় করতে পারেনি। এখানে সব সময়ে মাছ পাওয়া যায় না। নিরামিষ রান্নাই করেছিল বেশি।

খুব প্রশংসা করল বিকাশ, বলল, 'ভারি তৃপ্তি পেলাম।'

অরুণা বলল, 'ঠাট্টা করছ বুঝি? কলকাতায় বড়দিদির হাতের রান্না খাও।'

বিকাশ বলল, 'বড়দিদি রান্না করবে কি! জামাইবাবুর মাসে কত আয় জানো? পাঁচ-সাত হাজার টাকা। হাইকোর্টের নামজাদা ব্যারিস্টার। বাড়িতে বিশটা ঠাকুর-চাকর-ঝি!' একটু পরে বলল, 'তোমার রান্না ঠিক মা'র মতো—'

অরুণা বলল, 'আমার মাও তো ভালো রান্না করতেন—'

বিকাশ স্বীকার করল, 'কাকীমার হাতের রান্না ভালো ছিল।'

বিকাশের প্রশংসায় অরুণার মুখখানি সার্থকতায় আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

খাওয়ার পরে বিশ্রাম করছিল বিকাশ। ও-পাশের গুদোমঘরটা খুঁজে কানাই একটা ইজি-চেয়ার, আরও কিছু-কিছু আসবাবপত্র যোগাড় করে এনেছিল। নিজের ঘরে, জানলার পাশে, ইজি-চেয়ারটায় অর্ধশায়িত অবস্থায়, চোখ বুজে পড়েছিল বিকাশ। আর ভাবছিল। অরুণার সন্ধান পাবার পরমুহূর্ত থেকে যে-ভাবনা অহরহ মনকে অধিকার করে রয়েছে এখনো তাই চলেছে। অরুণাকে পাশে নিয়ে জীবনের পথ চলবার যে-স্বপ্ন, যে-আশা, অরুণা চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে ভেবে মুহ্যমান হয়ে উঠেছিল, অরুণার আবির্ভাবের সঙ্গে তা আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

অবশ্য, ইতিমধ্যে তার হৃদয়াকাশের এক প্রান্তে একটি তারকার

উদয় হয়েছে। ক্ষীণদ্যুতি, তবু অন্ধকারের দুঃসহতাকে সহনীয় করেছে, নিঃসীম নিঃসঙ্গতায় সাহচর্য দিয়েছে। অরুণোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ও নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, দুর্লক্ষ্য হয়ে উঠবে, তারপর অরুণালোকে সারা আকাশ যখন ঝলমলিয়ে উঠবে, ও ম্লান-মুখে দূরে দাঁড়িয়ে ব্যথাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে।

বড় ভালো মেয়ে শীলা! বড়দিদির ননদের মেয়ে। ছোটবেলায় মা হারিয়েছে। বাবা মিলিটারী ডাক্তার। বরাবরই বাইরে-বাইরে বড় চাকরি করছেন, কাজেই পিতার স্নেহ ও সাহচর্যও পায়নি বেশি। ছোট থেকে শান্তিনিকেতনে মানুষ হয়েছে। ওখান থেকে আই. এস. সি. পর্যন্ত পড়ে কলকাতায় পড়তে আসে। দিদির বাড়িতে থেকে পড়ে। প্রেসিডেন্সী থেকে ফিজিওলজিতে বি. এস. সি. পাস করেছে। সম্প্রতি এম. এস. সি. পড়ছে। বড়লোকের মেয়ে, শিক্ষা-দীক্ষা যথেষ্ট পেয়েছে। ফ্যাসান-দুরস্ত মেয়েদের মধ্যে মানুষ হয়েছে, আধুনিকতম কায়দা-কানুন ও হাল-চালে রপ্ত হয়েছে, তবু ওর আচার-আচরণে বাঙালী মেয়েদের নিজস্ব শান্ত, নম্র, কোমল, মাধুর্য অটুট থেকে গেছে।

ক্ষুদুর মা ঘরে এল। থমকে দাঁড়াল। বিকাশ ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে চলে যাচ্ছিল। বিকাশকে চোখ খুলতে দেখেই বলল, 'ভাবছিলাম ঘুমিয়ে পড়েছেন।' কাছে এসে মেজেতে বসল।

বিকাশ বলল, 'খাওয়া-দাওয়া হল? অরুণা কোথায়?'

ক্ষুদুর মা বলল, 'রান্নাঘরে—' তারপর বিকাশকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই শুরু করল, 'জানেন দাদাবাবু, খুকির মাথার ঠিক নেই। জামাইবাবু যাবার পর থেকেই কি রকম হয়ে গেছে। ও ঘরটাতেই দিন-রাত থাকে। জামাইবাবুর ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে বকে। আপনি এসেছেন তাই—না হলে কথাবার্তা বিশেষ কিছু বলে না। সারাদিন গোঁজ হয়েই থাকে। অবিশ্যি, চিরদিনই অমনি ভিতর-গোঁজা মেয়ে ও। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে একেবারে। দিনেরবেলায় এক মুঠো না খেলে নয়—খায়, রাত্রে কিচ্ছু খায় না। বললেও শোনে না! অত্যন্ত অবাধ্য তো। শরীরও হচ্ছে তেমনিই দিন-দিন। পাঁকাটির মতো। এক ফোঁটা রক্ত নেই দেহে। রাত্রে ঐ ঘরটাতে একা শুয়ে থাকে। কতবার বলেছি আমিও শুই—একা থাকিসনে। শোনে না কোনো কথা।

বলে একা কোথা? মানে জামাইবাবুও সঙ্গে থাকেন আর কি! পাগল আর কাকে বলে—বলুন? তারপর সারা রাত্রি স্বপ্নে বকবক করে, কোনো-কোনোদিন এমন চেঁচিয়ে ওঠে যে নিচে থেকে শব্দ পাওয়া যায়।'

মনের মধ্যে অসন্তোষের যত বাষ্প জমা হয়ে উঠেছিল, সব মুক্ত করে দিয়ে ক্ষুদুর মা বলল, 'ওকে আপনি নিয়ে যান, দাদাবাবু। এখানে থাকলে ও বাঁচবে না—'

বিকাশ বলল, 'নিয়ে যেতেই তো চাই। ও যেতে চাচ্ছে না যে—'

ক্ষুদুর মা বলল, 'জোর করে নিয়ে যান। রাতদিন একা-একা থাকলে আর ভাবলে মন কতক্ষণ ভালো থাকে? আমি বলি, কাঁদ্ না একটু। মা-বাবা গেছে, এমন রাজপুত্তুরের মতো দাদা গেছে, চোখের জল ফেল্ না একটু! সদ্য-সদ্য স্বামী গেছে তার জন্য পাগলামী না করে বরং একটু কাঁদ্। মনটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তা ছাড়া এখন ওসব করলে কি হবে? যতদিন জামাইবাবু বেঁচেছিল, এক বিছানায় শোয়নি কোনোদিন, জানেন? সারারাত্রি ঘোড়দৌড়! আমার তো অজানা নেই কিছু—'

ক্ষুদুর মা আরও কাছে সরে এসে, কণ্ঠস্বর নিচু পর্দায় নামিয়ে, মুখ-চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'জানেন, দাদাবাবু, জামাইবাবু গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল!—সকালবেলায় রান্নাঘরে ঢুকেছি, হঠাৎ খুকির চিৎকার—দিদি—ও দিদি, এস। ছুটলাম। গিয়ে দেখি ঐ ও-পাশের ঘরটার সামনে খুকি অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সামনে চাইতেই দেখি—জামাইবাবু কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে! চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, জিভটা বেরিয়ে আছে, ঘাড় লটকানো। এখনো রাত্রে মনে পড়লে গা-হাত-পা ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসে।'

বিকাশ বলল, 'শুনেছি—'

ক্ষুদুর মা'র উৎসাহ নিভে এল এক মুহূর্তে। বলল, 'খুকি বলেছে বুঝি সব?'

বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ—'

ক্ষুদুর মা বলল, 'যাই হোক, আপনি ওকে নিয়ে যান। কোনো কথা শুনবেন না। এখানকার জমিদারবাবু ক্ষুদুকে নিয়ে গিয়ে ভালো চাকরি করে দেবেন বলেছেন। জমিদার-গিন্নি আমাকেও আশ্রয় দেবেন বলেছেন। কাজেই আমাদের জন্য ভাববেন না আপনি। ওকে নিয়ে গিয়ে বাঁচান।

এখানে থাকলে ও মরে যাবে—' হঠাৎ ক্ষুদুর মা কেঁদে ফেলল, 'ও জন্মাবার পর থেকেই কাকীমার অসুখ। আমার হাতেই মানুষ। ওকে পেটের মেয়ের মতোই দেখি—ও যেমনিই ব্যবহার করুক। ওর কিছু হলে মনে ভারি কষ্ট পাব!'

বিকাশ আশ্চর্য হল। ক্ষুদুর মা'র মাতৃস্নেহে ক্ষুদুরই একচ্ছত্র অধিকার জানত। ক্ষুদুর সঙ্গে অরুণাও ভাগ বসিয়েছে! দেখে আনন্দ হল।

একটু পরে উঠে গেল ক্ষুদুর মা। বিকাশ পাশের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

মনে পড়ল সোমনাথকে। লম্বা ছিপছিপে। শ্যামবর্ণ। মুখের চেহারা, গঠন—দৃঢ় মনের পরিচায়ক। মাথার চুল ছোট-ছোট করে ছাঁটা। তাতেও ঈষৎ কুণ্ডনাভাস। ভালো ছেলে। ক্লাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় সর্বপ্রথম হয়েছিল। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কথা বলত কম। অথচ তর্ক-সভায় সব চেয়ে ভালো বক্তৃতা দিত। কলেজের ছাত্রীরা খুব ভক্ত ছিল ওর। কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিল। সব ছেলে-মেয়েরা লেখা ছাপানোর জন্য ওর তোষামোদ করত।

বিলেত যাবার আগের দিন রাত্রে বিকাশ তার বন্ধু-বান্ধবদের প্রীতি-ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিল। সোমনাথও নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সকলের সঙ্গে সেও তার শুভযাত্রা কামনা করেছিল আন্তরিকতার সঙ্গেই।

সোমনাথের সঙ্গে খুবই বন্ধুত্ব ছিল অরুণার দাদা রবির। ওদের বাড়ি প্রায় যেত। অরুণাকে পড়াশুনায় সাহায্য করত। কেউ কোনোদিন কিছু মনে করেনি। যে ছেলের সারাদিনের মুখের কথা আঙুলে গোনা যেত, হাসি যার ঠোঁট ছাড়িয়ে, চোখ ছাড়িয়ে নামত না কখনো, বন্ধুর বোনের উপর তার ভ্রাতৃসুলভ স্নেহে কোনোদিন ভালোবাসার রঙ ধরবে, কেউ ভাবেনি কোনোদিন!

অরুণা এল। মুখে একটি মিষ্টি করুণ হাসি। কাছে এসে দাঁড়াল। বিকাশ বলল, 'কি করছিলে?' অরুণা বলল, 'তোমার বিকেলের খাবার রাত্রের খাবারও করে রাখলাম। রাত্রে আর রান্নাঘরে ঢুকব না।'

'ক্ষুদুর মা থাকতে তুমি মিছেমিছি এত সব—'

অরুণা বাধা দিয়ে বলল, 'তা কি হয়! এতকাল পরে এলেছ—'

'আর কি কাজ আছে?'

'বিশেষ আর কি!'

বিকাশ অরুণার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—

অরুণা লজ্জিত হয়ে উঠে বলল, 'কি দেখছ?'

বিকাশ বলল, 'বেশ চেহারাটি বাগিয়েছ। হাসপাতালের রোগীর মতো। স্টেথোটা বার করে একবার দেখতে হবে।'

অরুণা বলল, 'হয়তো ওঁর রোগ আমাকে ধরেছে—'

সভয়ে বিকাশ বলে উঠল, 'বল কি! জ্বর-টর হয় নাকি? রাত্রে ঘাম হয়? কাশি?'

অরুণা ম্লান হেসে বলল, 'হলেই বা কি করব?'

'কি করব! নিয়ে যাব, চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলব।'

'উনিও তো চিকিৎসার ত্রুটি করেননি—'

বিকাশ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'কে কি করেছিলেন আমার জানবার দরকার নেই। আমি চিকিৎসা করে ভালো করবই। বিদেশ থেকে এই রোগেরই বিশেষজ্ঞ হয়ে এসেছি—বোধহয় জানো না। যদি না পারি, দরকার হলে বিদেশে নিয়ে যাব—'

চোখে স্বপ্ন ঘনাল অরুণার, কণ্ঠে আবেশ, বলল, 'তারপর?'

'বলেছি তো তোমাকে নিয়ে জীবন নতুন করে শুরু করব—যতটুকু পাওনা আছে জীবনের কাছ থেকে আদায় করে নেব।' একটু থেমে বিকাশ বলতে লাগল, 'তুমি সুস্থ হবে, সবল হবে, দেহের লাবণ্য ফিরে পাবে। তারপর আমার জীবনলক্ষ্মী হয়ে আমার সংসারের সিংহাসনে বসবে।'

অরুণা বলল, 'তারপর?'

'আমাদের বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, দাস-দাসী হবে, ছেলে-মেয়ে হবে। মেয়ে হবে ঠিক তোমার মতো দেখতে, নাম রাখব আত্রেয়ী।'

অরুণা বলল, 'আর ছেলেটি হবে তোমার মতো দেখতে। নাম রাখব বিনায়ক, ডাকব বিনু বলে। মেয়েকে এখানের লেখাপড়া শেষ করে বিলেত পাঠাব।'

'না-না, মেয়েকে আবার বিলেত পাঠানো কি? তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া চাই। মেয়ে ধাড়ি করে বসিয়ে রাখা কাজের কথা নয়। ছেলেকে অবশ্য বিলেত পাঠাতেই হবে ডাক্তারী পড়তে।'

'আচ্ছা, দুজনকেই পাঠানো যাবে।'

দুজনেই হেসে উঠল।

বিকাশ বলল, 'ঠিক মনে আছে না? বিলেত যাবার আগের দিন নদীর ধারে বসে কত কল্পনার মালা গেঁথেছিলাম দুজনে।'

অরুণা ম্লান হেসে বলল, 'মনে থাকবে না? তুমি এসেছ তাই। না হলে কিই বা কাজ! সারাদিন একা বসে থাকি। আর অতীত দিনের পাতাগুলি একের পর এক উল্টে যাই।'

বিকাশ বলল, 'ঐ চেয়ারটা টেনে বস। দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ?'

অরুণা চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে বসল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা মণ্টুদা! জ্যেঠাইমা কখন গেলেন?'

মুখখানি ম্লান হয়ে এল বিকাশের। বলল, 'আমি আসবার মাস দুই পরে। ভুগছিলেন অনেকদিন থেকে।'

'জ্যেঠামশায় যাবার পরেই খুব দমে গিয়েছিলেন তো। কথাবার্তা বলতেন না কারও সঙ্গে। আমি মাঝে-মাঝে গিয়ে বসতাম। অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকতেন, কথা বলতেন না।'

বিকাশ চুপ করে বসে রইল। একটু পরে বলল, 'তুমি বলছিলে মা তোমাদের খবর নেননি, কিন্তু মা শুধু তোমাদেরই নয়, সকল বিষয়েই উদাসীন হয়ে গিয়েছিলেন।'

অরুণা অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'জ্যেঠাইমাকে তো দোষ দিইনি। উষার উচিত ছিল—নিজে না আসুক, লোকজনের তো অভাব ছিল না।'

আবার চুপচাপ দুজনে। একটু পরে অরুণা বলল, 'বড়দি আমার কথা কখনো বলেন?'

বিকাশ বলল, 'কি আর বলবেন?'

বড়দির একদিনের কথা মনে পড়ল বিকাশের। বললেন: 'ভারি লোভী মেয়ে ছিল অরুণা। ছোটবেলায় বাড়িতে আসত। এসেই উষার কোনো খেলনা দেখলেই কান্না শুরু করত। বাবার খুব আদরের ছিল তো, সঙ্গে-সঙ্গে হাতে তুলে দিতেন। উষা কান্নাকাটি করলে ধমকে দিতেন।' তারপর একটু হেসে বললেন—'বড় হয়ে তোর উপরে নাকি চোখ পড়েছিল। বাবা জানতে পারেননি তাই—না হলে বিলেত যাবার আগেই ওর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতেন। মা'র তো ঐ ভয় ছিল।'

অরুণা হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'জ্যেঠামশায়ের কাছে যা স্নেহ পেয়েছি, বাবার কাছে তা পাইনি। তোমাদের বাড়িতে যেতাম, কতদিন রাত্রে থাকতাম। তোমার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি কতদিন সন্ধ্যেবেলায়। কার সাহসে? বাবা তো রেগে টং হয়ে থাকতেন আর মা ধমকাতেন। তোমাদের বাড়ির কেউ পছন্দ করত না। আমি জানতাম—যে যা মনে করুক, কিছু বলতে পারবে না। জ্যেঠামশায় আছেন আমার পিছনে। ওঁর কাছে তো কি তোমাদের বাড়ির, কি আমাদের বাড়ির, কারও মুখ ফুটত না।'

ক্ষুদুর মা এল, হাতে খাবারের রেকাবী, জলের গ্লাশ। অরুণা একটা টুল এনে বিকাশের সামনে রাখল। ক্ষুদুর মা রেকাবী ও গ্লাশ টুলের উপর নামিয়ে রাখল। বিকাশ বলল, 'খাবার এখন খাব না ক্ষুদুর মা।'

অরুণা বলল, 'খাবে না কেন? এত কষ্ট করে তৈরি করলাম।'

'যা খেয়েছি তাই যে হজম হয়নি এখনো।'

'হজম হবে, খাও।' হুকুমের স্বরে বলল অরুণা।

ভালো লাগল বিকাশের। খেতে অনিচ্ছা জানালে, মা এমনি স্বরে হুকুম করতেন। অরুণার কণ্ঠস্বরে মায়ের স্নেহমাখা স্বরের রেশ শুনতে পেল বিকাশ।

খাওয়া শেষ হবার পর বিকাশ বলল, 'চল একটু ঘুরে আসি।'

অরুণা বলল, 'কোথায় যাবে?'

'আশ্রমে স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করতে হবে। তোমার এত উপকার করেছেন।'

অরুণা বলল, 'অনেকখানি রাস্তা!'

'তা হোক।'

'ফিরতে রাত হয়ে যাবে।'

'তা হলই বা।'

বিকাশ ধুতিখানা গুছিয়ে পরল, একটা গরম শার্ট পরল। তার উপরে একটা শাল জড়িয়ে নিল। অরুণাও ও-ঘর থেকে ফিরল। গায়ে ওলোর রঙ-চটা গরম চাদরটা জড়ানো। পা খালি।

ওকে ঐ পোশাকে বেরোতে দেখে বিকাশের বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। কিছু বললে পাছে কিছু মনে করে, এই ভয়ে চুপ করে রইল।

রাস্তায় পাশাপাশি চলতে লাগল। কাঁচা রাস্তা। অনেকদিন আগে তৈরি। বহুদিন কোনো সংস্কার হয়েছে বলে মনে হয় না। এবড়ো-খেবড়ো। পাথর বেরিয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে গর্ত, গর্তের মধ্যে বিস্তর ধারাল পাথর-কুঁচি দাঁত বার করে আছে, খালি পা পড়লে অক্ষত থাকবে না। রাস্তার মাঝখানে গরুর-গাড়ির চাকার ক্রমাগত ঘর্ষণে দুটি গভীর সমান্তরাল দাগ পড়েছে। দাগ দুটির মাঝখানটা উঁচু হয়ে আছে। অসাবধান পথিকের টাল খেয়ে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

রাস্তায় নেমেই বিকাশ বলল, 'ভারি বিশ্রী রাস্তা। খালি পায়ে এসেছ, একটু দেখে চল!'

অরুণা চুপ করে পথ চলতে লাগল। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। পড়ন্ত আলোতে গাছের ডগার পাতা চিকচিক করছে। রাস্তার দুপাশে দীর্ঘ গাছ, রাস্তার উপর তাদের ছায়া পড়েছে আড়াআড়ি ভাবে। দূরে মাঠের উপর দিয়ে একদল গরু গাঁয়ে ফিরছে। পাচনবাড়ি হাতে দুটি ছোট ছেলে ইতস্তত ছড়িয়ে-পড়া গরুগুলোকে ছুটোছুটি করে সামলে নিয়ে যাচ্ছে। ঠান্ডা বাতাস বইছে হু-হু করে। শীত করছে। অরুণা জীর্ণ মলিন চাদরখানি ভালো করে জড়িয়ে নিল।

বিকাশের চোখ পড়তেই বলল, 'শীত করছে? তোমার চাদরটা আমাকে দাও, আমারটা তুমি নাও।'

অরুণা বলল, 'এতেই হবে।'

বিকাশ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'হবে না।' গায়ের চাদরটা ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের শালটা ওর গায়ে ভালো করে জড়িয়ে দিল। একটা ধানবোঝাই গাড়ি আর্তনাদ করতে-করতে আসছিল। এক পাশে সরে দাঁড়াল ওরা। গাড়োয়ান পরম ঔৎসুক্যে ওদের দেখতে লাগল।

মাইলখানেক যাবার পর ওরা আশ্রমের কাছে এসে পৌঁছুল। প্রায় পঞ্চাশ বিঘে জমির উপরে আশ্রম। রাস্তার ধারে বরাবর কাঁটা-গাছের বেড়া। কতকটা গিয়ে ফটক। ফটক থেকে লাল কাঁকরের চওড়া রাস্তা চলে গিয়েছে ও-প্রান্ত পর্যন্ত। ঐ রাস্তা থেকে এদিকে-ওদিকে সরু

রাস্তা বেরিয়ে গেছে। একদিকে স্কুল ও বোর্ডিং। মাঝখানে ঠাকুরের মন্দির। মন্দিরের রূপোর তৈরি চূড়া অস্তমান সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে। এক পাশের রাস্তা ধরে স্বামীজীর আশ্রম।

ওরা সোজা গিয়ে ঠাকুরের মন্দিরে পৌঁছল। শ্বেত-পাথরের মন্দির। চারদিকে চওড়া বারান্দা। মন্দিরের দরজা খোলা ছিল। ওরা বারান্দায় উঠে ঠাকুর দর্শন করল। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। তারপর স্বামীজীর আশ্রমে গিয়ে পৌঁছুল।

স্বামীজী সামনের বারান্দায় একটা ইজি-চেয়ারে বসে এতক্ষণ বই পড়ছিলেন। স্বল্প আলোতে দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল বোধহয়। তাই বইখানি কোলের উপর রেখে সামনে তাকিয়েছিলেন। অরুণাকে চোখে পড়তেই ওঁর মুখে একটি স্নেহ-মধুর হাসি ফুটে উঠল।

অরুণা ও বিকাশ ওঁকে প্রণাম করল। স্বামীজী অরুণাকে বললেন, 'বসবার কিছু নিয়ে এস।' অরুণা ভিতরে গিয়ে একটা ছোট শতরঞ্চি নিয়ে এল। সেইটে পেতে দুজনে বসল।

স্বামীজীর দীর্ঘ দোহারা গঠন। রঙ ফরসা। বয়স ষাটের কাছাকাছি। মুণ্ডিত মস্তক। গেরুয়াধারী। গায়ে একটা আলোয়ান জড়ানো।

অরুণাকে বললেন, 'এঁকে চিনলাম না তো।'

অরুণা বলল, 'বিকাশদা, যাঁর কথা বলেছিলাম।'

স্বামীজী বললেন, 'বুঝেছি।' বিকাশকে বললেন, 'আপনার কথা মায়ের মুখে সব শুনেছি। কতদিন ফিরলেন?'

বিকাশ বলল, 'বছরখানেক হল।'

স্বামীজী জিগগেস করলেন, 'মায়ের খবর পেলেন কি করে?'

বিকাশ পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি যখন শুনলাম যে ও-বাড়ি থেকে একে তাড়িয়ে দেবে, তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না। সরাসরি চলে এলাম এখানে।'

স্বামীজী বললেন, 'বাড়িটা একটা সৎকাজে ব্যবহৃত হবে। আমিও মাকে তাই বাড়িটা ছেড়ে দিতেই বলেছি। নিজেদের তো ভালো কাজ করবার সামর্থ্য নেই। কাজেই কেউ ভালো কাজ করবার চেষ্টা করলে, যার যতটা সাধ্য সে কাজে সাহায্য করা উচিত। এখন সমস্যা হচ্ছে মা যাবেন কোথায়? আমাদের আশ্রমে মেয়েদের থাকবার কোনো ব্যবস্থা

নেই। আমাদের ঠাকুরের অনেক শিষ্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তাঁদের অনেককে এ সম্বন্ধে চিঠি লিখেছি। এখানেও একটা সুবিধা হয়েছে। একজন জমিদার আছেন পাশের গ্রামে। শুধু জমিদার নন, মস্ত ধনী ব্যক্তি। অনেকগুলো কলিয়ারীর মালিক। মাসে লক্ষ টাকা আয়। তিনিই হাসপাতাল করছেন। সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েদের জন্য একটি হাইস্কুলও স্থাপন করবেন। আমাকে শ্রদ্ধা করেন। হাসপাতালের ও স্কুলের উদ্বোধনের সময় আসবেন। সেই সময়ে আমি মায়ের চাকরি সম্বন্ধে অনুরোধ করব। আমার বিশ্বাস জমিদারবাবু আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করবেন না।'

বিকাশ বলল, 'এখানকার লোকেরা তো অরুণার উপর প্রসন্ন নয়।'

স্বামীজী বললেন, 'প্রসন্ন নয় নিশ্চয়ই। তবে কোনো ক্ষতি করবে বলে মনে হয় না।'

বিকাশ বলল, 'আমি অরুণাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব বলেই এসে-ছিলাম।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমাদের বাড়ি একই গাঁয়ে, একই পাড়ায়। অরুণার বাবাকে আমার বাবা ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। আমিও ওকে ছোট বোনের মতোই দেখেছি, স্নেহ করেছি। ওর নিজের আত্মীয়স্বজন যখন কেউ নেই, তখন ওর সব ভার আমাকে নিতে হবে।'

স্বামীজী বললেন, 'মা কি যেতে চান?'

বিকাশ বলল, 'না। তবে আমি ওকে না নিয়ে এখান থেকে নড়ব না।'

'কোথায় নিয়ে যাবেন?'

'আপাতত কলকাতায়। চাকরির চেষ্টা করছি নানা জায়গায়। হয়ে যাবে শিগগির বলে আমার বিশ্বাস। তখন ওকে আমার চাকরিস্থলে নিয়ে যাব।'

স্বামীজী অরুণাকে বললেন, 'মা, তুমি একবার ভিতরে যাও, বাবাজীর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলব।'

অরুণা চলে গেল।

স্বামীজী বিকাশকে বললেন, 'একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। অরুণার ও আপনার দুজনেরই বয়স বেশি নয়। এ অবস্থায় আপনার কাছে অরুণার একা থাকা চলবে?'

বিকাশ বলল, 'একটা কথা আপনাকে না জানিয়ে উপায় নেই। অরুণাকে আমি বিয়ে করতে চাই। আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বহুদিন আগে। ঘটনা বিপর্যয়ে অরুণা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আমি আমার দীর্ঘ প্রবাসে বহু প্রলোভনের মধ্যেও আমার প্রতিশ্রুতি অক্ষুণ্ণ রেখেছি।'

স্বামীজী বললেন, 'অরুণা মা কি মত দেবেন?'

বিকাশ বলল, 'মত দেয়নি।' একটু চুপ করে বলল, 'ওদের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে সব তো জানেন।'

স্বামীজীর মুখের উপর একটি বেদনার ছায়া পড়ল। বললেন, 'হ্যাঁ।'

বিকাশ বলল, 'সোমনাথের শোচনীয় মৃত্যু ওর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ওকে এখান থেকে সরিয়ে না নিয়ে গেলে ওর মন প্রভাব-মুক্ত হবে না।'

স্বামীজী বললেন, 'যদি তার পরেও বিবাহ করতে অস্বীকার করেন?'

'তাহলে বিধবা বোনের মতো আমার কাছে থাকবে।'

'কিন্তু আপনি তো বিবাহ করবেন?'

'করব বৈকি! আমি তো সন্ন্যাসী নই।'

স্বামীজী হেসে বললেন, 'তা বটে! তবে আপনার ভাবী পত্নী অরুণাকে যদি পছন্দ না করেন?'

'যিনি পছন্দ করবেন তিনিই আমার গৃহলক্ষ্মীর আসনের জন্য মনোনীতা হবেন। বিয়ের আগে এইটিই হবে আমার প্রধান সর্ত।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি নিজেকে যত না ভালোবাসি, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ভালোবাসি অরুণাকে। অরুণা তা জানে। আমার কাছে যে ওর সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্মানের বিন্দুমাত্র বিঘ্ন হবে না—তাও ও জানে। মানসিক অসুস্থতার জন্যই ও আমার ডাকে সাড়া দিতে চাচ্ছে না। আপনি ওর সম্বন্ধে আমাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

ফিরবার সময় অরুণা জিগগেস করল, 'স্বামীজী কি বললেন?'

বিকাশ বলল, 'আমি ওঁকে সব কথা খুলে বললাম। বললাম দুজনে দুজনকে ছোটবেলা থেকে ভালোবাসি। দুজনে দুজনকে বিয়ে করবার

কথা দিয়েছিলাম। অবস্থার ফেরে অরুণা বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। ভগবান যখন ওকে সেই অবাঞ্ছিত বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তখন আমি ওকে অবিলম্বে নিয়ে যেতে চাই। উনি বললেন—অরুণাকে যখন ও বাড়ি অবিলম্বে ছেড়ে দিতে হবে, আর এখানে থাকার কোনো ব্যবস্থা করা যাবে না, তখন ভগবানের কৃপায় যখন এ রকম সুযোগ ঘটে গেছে, অরুণার বিনা আপত্তিতে এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত।'

অরুণা সবিস্ময়ে বলল, 'এই কথা বললেন! আমি বার-বার জানিয়েছি ওঁকে—'

বিকাশ বলল, 'ওঁর তো তোমার মতো বুদ্ধিটা ঘোলাটে হয়ে যায়নি। উনি বললেন—এই অজ পাড়াগাঁয়ে এত বড় একটা হাসপাতাল হওয়া সোজা ব্যাপার নাকি! যত তাড়াতাড়ি ওটা হয়ে যায় তার জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। অরুণা যত তাড়াতাড়ি ও বাড়ি ছেড়ে দিতে পারে ততই ভালো! তুমি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে এই ভয়ে উনি এতদিন তোমাকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তা যখন হবে না, তখন এত বড় একটা মহৎ কাজে বাধা দেবেন কেন? তা ছাড়া বাধা দিলেও কোনো ফল হবে না। তোমাকে যেতেই হবে দু-পাঁচ দিনের মধ্যে।'

অরুণা বলল, 'আমার এখানে চাকরি হয়ে যাবে বললেন, শুনলে না?'

'শুনলাম বৈকি! আবার বলছিলেন। এবার এক কথায় চুপ করিয়ে দিলাম—গাঁয়ের লোকরা যখন এত বিরোধী, তখন একলা মেয়েমানুষের কি সেখানে থাকা উচিত? কখন কি বিপদে ফেলে দেবে। আপনি তো চিরদিন ওকে আগলাতে পারবেন না—উনি যুক্তিটা অস্বীকার করতে পারলেন না।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তা ছাড়া ক্ষুদুর মা, ক্ষুদু—ওরা তো চলে যাবে শিগগির। তুমি একা ঐ বাড়িতে থাকবে কি করে?'

'আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'তা ছাড়া থাকতে না দিলে থাকবে কি করে?'

'আত্মহত্যা করে ভূত হয়ে থাকব ঐ বাড়িতে।'

'বসত বাড়ি তো আর থাকবে না। হাসপাতাল হয়ে যাবে। তখন থেকো ভূত হয়ে। ওষুধের গন্ধে পালাতে পথ পাবে না। ও সব বুদ্ধি ছাড়, আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে!'

'আমি যাব না কিছুতেই।'

'তুলে নিয়ে যাব চ্যাংদোলা করে!'

অন্ধকার রাত্রি। দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের উপর রাশি-রাশি অন্ধকার জমে উঠছে। গাঢ় হয়ে উঠছে ক্রমশ। সেই অন্ধকারের মধ্যে দু-পাশের গাছগুলো প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে যেন। পাশের গ্রাম থেকে একটা আলোর ক্ষীণ রশ্মি ওদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। দূরে একটা পাহাড়ে আগুন লাগিয়েছে। আগুনের তৈরি একটা বৃহৎ সাপ যেন ধীরে-ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে!

হঠাৎ গর্তে পা পড়ল অরুণার। হোঁচট খেয়ে হুমড়ি দিয়ে পড়ে 'উঃ' বলে আর্তনাদ করে উঠল। বিকাশ সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'কি হল?'

বসে পড়ল অরুণা। বলল, 'কিছু না,' বলে পায়ের বুড়ো আঙুল চেপে ধরল। বিকাশ উবু হয়ে বসে, ওর হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে, আঙুল দিয়ে বুড়ো আঙুলটা পরীক্ষা করে বলল, 'কেটে গেছে, নখটাও উঠে গেছে বোধহয়—মুশকিল! জুতো পর না কেন?'

অরুণা চুপ করে রইল। বিকাশ বিরক্তির স্বরে বলল, 'জুতো পরতেও সোমনাথ নিষেধ করে গেছে নাকি?'

অরুণা বলল, 'জুতো নেই, ছিঁড়ে গেছে।'

'বেশ হয়েছে!' নিজের পকেট থেকে রুমাল বার করে আঙুলটি বাঁধতে লাগল।

অরুণা বলল, 'রুমালটা নষ্ট করছ কেন?'

বিকাশ জবাব না দিয়ে বাঁধতে লাগল। বাঁধা শেষ হলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওঠ।'

অরুণা উঠে দাঁড়াল। বিকাশ ওকে তুলবার উপক্রম করতেই অরুণা বলল, 'আমি হেঁটে যাব, যেতে পারব।'

'বাহাদুরী করে কাজ নেই! এখানে ডাক্তার আছে?'

'পাশের গাঁয়ে আছে।'

'বাড়িতে আয়োডিন আছে? বাড়িতে একটু আয়োডিন রাখতে পার না?' ধমকাল বিকাশ।

ভয়ে-ভয়ে অরুণা বলল, 'আশ্রমে আছে।'

'হ্যাঁ! আমি এখন আশ্রমে ছুটি!' বলেই ঝট করে ওকে পাঁজা-

কোলা করে তুলে নিয়ে বলল, 'এখানে একলা থাকবে! তার চেয়ে আমার চোখের সামনে মরে যাবে, তাই দেখে এখান থেকে নড়ব!'

কিন্তু বিকাশের কোনো কথা কি কানে যাচ্ছিল অরুণার? বিকাশের দেহের ঘনিষ্ঠ স্পর্শে অরুণার সর্বদেহে যেন তড়িৎ-প্রবাহ বইতে লাগল, বুকের স্পন্দন যেন থেমে যাবে মনে হল, সর্ব চেতনা যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল। মনে হল, যদি এই বলিষ্ঠ দুটি বাহুর উপরে ওর জীবনের সমস্ত ভার সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে পারত!

বিকাশ বলতে লাগল, 'কি হালকা হয়ে গেছ? কিছুই যে নেই শরীরে!'

চুপ করে রইল অরুণা। ওর মন একটি মধুর আবেশে মগ্ন হয়ে গেছে। গ্রীষ্মের দীর্ঘদাহের পর পৃথিবী যেমন পরম আগ্রহে বর্ষার প্রথম বর্ষণকে গ্রহণ করে, সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রিয়তমের স্নেহবর্ষণ অরুণা তেমনি সমস্ত চেতনা দিয়ে শোষণ করছিল। ওর দেহ ও মন একটি পরম পরিতৃপ্তিতে স্নিগ্ধ হয়ে উঠছিল।

নীরবে চলতে লাগল বিকাশ। নীরবে কাঁদতে লাগল অরুণা।

বাড়িতে এসে উপরে উঠে বিকাশ ইজি-চেয়ারটায় বসাল অরুণাকে। ডাক দিল ক্ষুদুর মাকে। ক্ষুদুর মা ছুটে এল। বিকাশ জিগগেস করল, 'ক্ষুদু এসেছে?'

ক্ষুদুর মা বলল, 'আসেনি তো! রাত দশটায় আসে।'

'পরিষ্কার ছেঁড়া কাপড় আছে? কতকটা গরম জল?'

'আছে,' বলে ক্ষুদুর মা চলে গেল।

অরুণা বলল, 'আমি দিচ্ছি বের করে।'

বিকাশ বলল, 'তোমাকে যেতে হবে না।'

অরুণা নাকি সুরে বলতে লাগল, 'আমার কি এমনি বসে থাকলে চলবে নাকি? কত কাজ এখনো—'

বিকাশ বলল, 'কাজ করবে পরে। ওটা একটু পরিষ্কার করে বেঁধে দিই।'

ক্ষুদুর মা গরম জল ও খানিকটা পরিষ্কার ছেঁড়া কাপড় নিয়ে এসে কাছে নামিয়ে বলল, 'হোঁচট খেল বুঝি?'

বিকাশ বলল, 'আঙুলটা থেঁতলে গেছে। নখটাও যাবে বোধহয়।'

মুখে যন্ত্রণার ভঙ্গী করে ক্ষুদুর মা বলল, 'দেখে-শুনে রাস্তা চলবে না তো। একটা আলো নিয়ে যেতে বলি। কে কার কথা শোনে?'

অরুণা বলল, 'দিনেরবেলা লণ্ঠন ঝুলিয়ে নিয়ে যাব?'

'দোষ কি? ফিরতে রাত হবে জানিস'—চলে গেল ক্ষুদুর মা।

বিকাশ সামনে বসতেই অরুণা উঠে পড়বার উপক্রম করে বলল, 'তুমি নিচে বসবে আর আমি চেয়ারে বসে থাকব?'

বিকাশ তাকে হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'তাতে দোষ নেই, বস।' বলে গরম জল দিয়ে আঙুলটি পরিষ্কার করতে-করতে বলল, 'আমি ভাবছি কি জানো? বেছে-বেছে এমন জায়গায় এসে হাজির হয়েছ যে সোমনাথের দিদির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে না গেলে, সারা জীবনে তোমার খোঁজ পেতাম না—'

অরুণা বলল, 'খোঁজ পেয়েই কি লাভ হল?'

বিকাশ মুখ তুলে অরুণার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কিছু না হোক, আমার হয়েছে।'

অরুণার আঙুলটি পরিষ্কার করে ধুয়ে বেঁধে দিয়ে বিকাশ অরুণার একটি হাত টেনে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা রুনু! সত্যি কথা বল, আমাকে ফিরে পাওয়া কি তুমি লাভ বলে মনে কর না?'

অরুণা চুপ করে রইল। লণ্ঠনের স্বল্প আলোকে দেখে নিল বিকাশের মুখখানি। সুগঠিত, সুন্দর মুখখানি। যে মুখ ওর বুকের মধ্যে আঁকা হয়ে আছে, যে মুখ ও চোখ বুজলেই মনের পর্দায় দেখতে পায়, যে মুখ দেখবার জন্য ওর সমস্ত অন্তর তৃষ্ণার্ত হয়ে ছিল এতদিন।

ওর ইচ্ছা হল সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওর বুকে মুখ রেখে বলে—প্রিয়তম। তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। আমার প্রতি মুহূর্তের কামনা সফল হয়েছে।

কিন্তু কিছু না-বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিকাশ বলল, 'কিছু বললে না?'

দিনান্তের হাসির মতো একটি ক্ষীণ হাসি মুহূর্তের জন্য ওর চোখে মুখে চিকমিক করে উঠেই আবার নিভে গেল। বলল, 'কি বলব? তোমার তো অজানা কিছু নেই। কিন্তু আমি যে নিরুপায়।'

নতুন জায়গায় ঘুম আসতে চাইল না বিকাশের। অনেকক্ষণ বিছানায় ছটফট করে উঠে পড়ল। বাইরে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

থমথমে নিশুতি রাত। সামনে কতকটা আকাশ দেখা যাচ্ছে। চুমকি বসানো যেন কতকটা কালো ভেলভেট। আকাশে চাঁদ নেই। অন্ধকারের একচ্ছত্র রাজত্ব চলছে পৃথিবীতে। গাঢ়, কালো, অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যে সামনের জরাগ্রস্ত বাড়িটা কঙ্কালসার রোগীর মতো পড়ে-পড়ে হাঁপাচ্ছে যেন। ওর বিষাক্ত নিঃশ্বাস যেন সারা বাড়িটার আশে-পাশে সমস্ত জায়গাটারও বাতাসকে বিষিয়ে তুলেছে। বিষিয়ে তুলেছে এখানে যারা বাস করে তাদের দেহ-মন দুই-ই; তাদের প্রাণশক্তিকে ক্রমশ নিঃশেষ করে আনছে!

অরুণাকে সারাদিন ধরে দেখেছে বিকাশ। ওর দেহ ও মন দুই-ই অসুস্থ। স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় নিয়ে গিয়ে ওষুধ প্রয়োগে ওর দেহ সুস্থ হবে। কিন্তু মন? সোমনাথের অতৃপ্ত কামনা যে মনকে নিদ্রায়-জাগরণে জড়িয়ে রয়েছে, সে মন কি নতুন, আনন্দময় পরিবেশে নিয়ে গেলেও সুস্থ হবে? আবার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে শুধু তাকেই ভালো-বাসবে? অনন্যমনা হয়ে শুধু তাকেই কামনা করবে? অথচ অরুণাকে না হলে যে বিকাশের চলবে না, এ আজ সে বুঝতে পেরেছে। আজ সারাদিন তার মনটা যে অননুভূতপূর্ব স্নিগ্ধ, পবিত্র আনন্দে ভরে রয়েছে, তা যে অরুণারই সহচর্যে—এ সম্বন্ধে তার কোনো সন্দেহ নেই। আজ সন্ধ্যায় যখন ওকে জোর করে তুলে নিয়েছিল, তখন ওর দেহের স্পর্শে তার দেহের শিরা-উপশিরায় যে-ভাবে সুধাস্রোত বইতে লাগল, তাতে সে বুঝতে পেরেছে যে ঐ লঘু, কোমল দেহটিই তার জীবনের অমৃত-ভাণ্ডার। জীবনের পাত্র আনন্দে ভরে দিতে পারবে শুধু ও-ই। জীবন-সাধনায় ও উত্তর-সাধিকা না হলে অভীষ্ট লাভ হবে না।

শীলার কথা মনে পড়ল। ধীর, শান্ত, নম্র মেয়েটি। কত বড়লোকের মেয়ে। এতটুকু অহমিকা নেই। বি. এস. সি.-তে প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে পাশ করে এম. এস. সি. পড়ছে। কিন্তু কথাবার্তায় বিদ্যা জাহির

করবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই। কত বিনয়ী। সহজে কোনো আলোচনায় যোগ দেয় না; চুপ করে বসে শোনে। সেই আলোচনায় চরম মীমাংসা করবার মতো যুক্তি ও শক্তি তার থাকলেও। সেবাপরায়ণা। ওর মা'র অসুখের সময় প্রাণ দিয়ে সেবা করেছিল। মা আশীর্বাদ করেছিলেন ওকে সর্বান্তঃকরণে।

মরণের আগে পর্যন্ত জ্ঞান ছিল মা'র। পায়ের কাছে বসেছিল শীলা। সে বসেছিল মাথার কাছে। একদৃষ্টে তার মুখের পানে তাকিয়েছিলেন মা—সাত বছর অদর্শনের পিপাসা দুই চোখ দিয়ে মিটিয়ে নিচ্ছিলেন মা চিরদিনের মতো। হঠাৎ ডাকলেন—শীলা। শীলা কাছে সরে এসে বলল—আমায় ডাকছেন? শীলার গায়ে হাত দিয়ে মা তাকে বললেন—জানিস, এ আমার মা? ও যা আমার সেবা করেছে, নিজের মেয়েকেও মা এত করে না। শীলার হাতটি তার হাতে দিয়ে বললেন মা—তোদের মিলিয়ে দিয়ে গেলাম। বিয়ে করিস একে। বড় ভালো মেয়ে। একে নিয়ে তুই সুখী হবি, আমি মা, বলে গেলাম। মা তার মুখে চুমু খেলেন। তারপর শীলার মুখে চুমু খেয়ে বললেন—তোমাদের মেয়ে হয়ে আসব মা! তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারব না।

তার পরদিন মা মারা গেলেন।

৮ মা'র সে কথা শীলা শিরোধার্য করে নিয়েছে। মা'র মৃত্যুর পর থেকে তার সব ভার হাতে তুলে নিয়েছে শীলা। শোকে সান্ত্বনা দিয়েছে, সদা-সতর্ক ত্রুটিহীন সেবায় তাকে পরিতৃপ্তি দিয়েছে। পরম আত্মীয়ের মতো রোগে পরিচর্যা করেছে, বান্ধবীর মতো তার নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গ দিয়ে ভরে রেখেছে, শুভাকাঙ্ক্ষিনীর মতো তার প্রত্যেক কাজে, প্রত্যেক চেষ্টায়, তার শুভেচ্ছা যোগ করে দিয়েছে। ও যে তার জীবনসঙ্গিনী হবে, এ সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। ধীরে-ধীরে যে সে তার মনের মধ্যে অধিকার বিস্তার করেছে, এ সম্বন্ধেও তার বিন্দুমাত্র অনিশ্চয়তা নেই। তার পূর্বজীবনের পরিচয় শীলা কারও কাছে পায়নি। অরুণার সঙ্গে যে একদা তার হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, মা জানতেন না, বড়দিদি হয়তো সন্দেহ করতেন, একমাত্র উষাই জানত। কারণ অরুণা যে তাদের পরিবারের বধূ হতে পারে, এ তার মা বা দিদির ধারণার অতীত ছিল!

একমাত্র বাবা অরুণাকে স্নেহ করতেন, হয়তো মনে-মনে তাকে পুত্রবধূ করে আনবার কল্পনা করতেন। কাজেই তার মনের গভীর স্তরের মধ্যে যে অরুণার প্রতি প্রেম আত্মগোপন করে রয়েছে, শীলা কোনোদিন কোনো সূত্রে তা জানতে পারেনি। যখন সে জানতে পারবে যেখানে সে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও অধিকারবোধ নিয়ে চিরদিনের জন্য বাসা বাঁধার আশা করেছে—সে-স্থান বহু পূর্বে অন্যের অধিকারভুক্ত, সেখানে দাঁড়াবার পর্যন্ত অধিকার তার নেই, তখন আশা-ভঙ্গের যে সুতীব্র বেদনা তার অন্তরকে নীল করে দেবে, তা মনে-মনে অনুভব করেও বিকাশের অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠল।

শুনতে পেল, ঘুমের ঘোরে অরুণা কি সব বলছে! ক্ষুদুর মা'র কথা মনে পড়ল বিকাশের—অরুণা ঘুমের ঘোরে কত কথা বলে, কাঁদে, চিৎকার করে ওঠে।

বিবাহিত জীবনের শেষ কয়মাসের মর্মান্তিক ঘটনাগুলির স্মৃতি অরুণার মনের গভীর স্তরে আশ্রয় নিয়েছে। নিদ্রার অবাধ অবসরে তারা বেরিয়ে এসে স্বপ্নের মধ্যে সঞ্চরণ করে।

অরুণার ঘরের জানলার কাছে গিয়ে বিকাশ দাঁড়াল। লণ্ঠনের স্বল্পালোকে অরুণার পায়ের পাতা দুটি দেখতে পেল। কান পেতে শুনতে লাগল, কি বলছে।

'না-না'—সভয়ে চিৎকার, 'ও কি করছেন ছাড়ুন।' তারপর *স্বাভাবিক কণ্ঠে—'কতখানি কাটল দেখলেন!'* চুপ করে রইল কিছু-ক্ষণ। নিঃশ্বাসের নিয়মিত শব্দ শোনা যেতে লাগল। আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'কে বলল? মিথ্যে কথা! নিয়ে চলুন আমাকে—' কান্নার শব্দ মিলিয়ে গেল ক্রমে। আবার চুপ করে ঘুমোতে লাগল।

সোমনাথের জন্য দুঃখ হল। ঢাকার শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে ওর যা খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল, যে কোনো মেয়েকে চাইলে ও পেত। যে কোনো সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে ওর স্ত্রী হতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করত! কেন তবে ও অরুণাকে ভালোবাসতে গেল? তার মন অন্যত্র বাঁধা আছে জেনেও কেন সে সেই মন পাবার জন্য জীবন-মরণ পণ করে বসল। অন্যের মন্ত্রপূত পাশা নিয়ে কেন সে খেলতে গিয়ে শোচনীয় পরাজয়কে বরণ করল!

অরুণার ঘরের পাশেই কতকটা খোলা ছাদ। তারই এক পাশে আর একটা ছোট ঘর। গুদাম ঘর। নানা জিনিসপত্রে ঠাসা। এই ঘরটাতেই আত্মহত্যা করেছিল সোমনাথ। এদিকে যে জানলাটি রয়েছে, সেটি খোলা। মনে হল সোমনাথ যদি ঐ জানলাটায় এসে দাঁড়ায়। যদি ডাকে তাকে। যদি মৃত্যু-বিকৃত মুখে তার সামনে এসে দাঁড়ায়, যদি তার ঠিকরে বেরিয়ে-আসা ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি তার মুখের পরে রেখে প্রার্থনা করে—অরুণাকে ভিক্ষা চাইছি। জীবনের মতো মহার্ঘ্য ধন ফেলে এসেছি অরুণার জন্য। মৃত্যুর নিঃসঙ্গতা আর সহ্য করতে পারছি না। অরুণাকে দাও আমাকে—

ফিরে এসে অরুণার জানলার সামনে দাঁড়াল আবার। বিড়বিড় করে বকছে অরুণা। ওর অন্তশ্চেতনার বেলাভূমিতে জীবনের অতীত ঘটনাগুলি ঢেউয়ের মতো পর-পর এসে আছড়ে পড়ছে! হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল—'ওকি! ওকি করছেন! এ্যাঁ! ছি-ছি!' আবার চুপ করে গেল। বিকাশ ভাবল মূর্চ্ছা গেল নাকি! ডাক দিল—'রুনু!' কানে পৌঁছল না ওর ডাক। ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে অরুণা। বিকাশ দরজায় ধাক্কা দিল। জীর্ণ দরজাটা থরথর করে কেঁপে উঠল! আবার ডাক দিল 'অরুণা!' অরুণার কান্না বন্ধ হয়ে গেছে। জেগেছে বোধহয়। বিকাশ উচ্চকণ্ঠে বলল, 'অরুণা ওঠ, অরুণা!'

অরুণা উঠে বসল। চুপ করে বসে রইল আচ্ছন্নের মতো।

দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা দিল বিকাশ। দরজার জীর্ণ খিলটা ভেঙে গিয়ে সশব্দে দরজাটা খুলে গেল। অরুণা চমকে উঠে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল—'কে, কে?' বিকাশ ঘরে ঢুকতেই অরুণা বিবর্ণ, ভীত মুখে, বিহ্বল চোখে, কাতর কণ্ঠে বলে উঠল, 'কে তুমি?'

অরুণার সামনে দাঁড়িয়ে বিকাশ বলল, 'আমাকে চিনতে পারছ না?'

অরুণা বিকাশের পানে দু-চোখ মেলে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। ওর সামনে যেন কুয়াশার যবনিকা পড়েছে, যেন কুহেলিকাচ্ছন্ন মৃত্যুর ওপার থেকে দেখছে ও।

সহসা যেন যবনিকা সরে গেল, চেতনার শিখা জ্বলে উঠল অরুণার! আর্তস্বরে বলে উঠল, 'মণ্টুদা! আমাকে নিতে এসেছ! আর পারছি না মণ্টুদা! বাঁচাও আমাকে!' বলে দু-হাত বাড়াল।

অপরিচিতের অনাকাঙ্ক্ষিত বাহুবন্ধন থেকে শিশু যেমন মা'র দিকে ব্যাকুল আগ্রহে হাত বাড়ায়, সেই ব্যাকুলতা ও আগ্রহ ওর চোখে ফুটে উঠল।

বিকাশ অরুণার শীর্ণ কম্পমান দেহটিকে বুকে টেনে নিল। অরুণা ওর বুকের মধ্যে মুখ রেখে নিশ্চিন্ত হল।

অরুণাকে ধীরে-ধীরে নিজের ঘরে নিয়ে এসে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিল। অরুণা ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, 'তুমি কোথায় শোবে?'

বিকাশ বলল, 'শোব না, তোমার কাছে বসে থাকব।'

অরুণা বলল, 'না, না, অসুখ করবে—'

'তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। ঘুমাও—' বলে ওর পাশে বসে ওর মাথায়-মুখে হাত বুলোতে লাগল। অচিরে গভীর নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ডুবে গেল অরুণা।

পাশে বসে রইল বিকাশ। অরুণার নিমীলিত চোখ দুটিতে হাত রাখল; কপালে, কপোলে, ঠোঁট দুটিতে। চুলগুলি কপালের উপর থেকে সরিয়ে দিতে লাগল। ওর শীর্ণ, বিবর্ণ মুখখানির অসহায়তা, তার উপরে ওর নিরতিশয় নির্ভরতা, বিকাশের বুকের মধ্যে কামনা নয়, গভীর স্নেহের সঞ্চার করতে লাগল। ওর মনে হল, পৃথিবীতে ধন, মান, গৌরব, কিছুরই আর প্রয়োজন নেই তার। যদি এই ভাগ্য-বিড়ম্বিতা মেয়েটির মুখে হাসি, দেহে স্বাস্থ্য, মনে সুখ-শান্তি ফিরিয়ে এনে দিতে পারে, তাহলেই তার জীবন সার্থক হবে।

রাত্রি শেষ হল। বারান্দায় এসে দাঁড়াল বিকাশ। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। কাছেই একটা জঙ্গল থেকে নানা পাখির কলরব ভেসে আসছে। একটু দূরে সাঁওতাল-পাড়া থেকে মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছে। জরাগ্রস্ত বাড়িটাও যেন সারা রাত্রির অনিদ্রার পর শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। পূর্বাকাশে উষার রক্তিমাভা ফুটে উঠছে।

অরুণার ঘর থেকে ওর বিছানাটা তুলে নিয়ে এসে মেঝেতে পাতল বিকাশ। শুয়ে পড়ল। অরুণার দেহের উত্তাপ ও সুরভি যেন এখনো লেগে রয়েছে বিছানায়। সর্ব দেহ দিয়ে তা শোষণ করে ওর মন নেশায় জড়িয়ে আসতে লাগল। অচিরে ঘুমিয়ে পড়ল বিকাশ।

৭।

বিকাশের যখন ঘুম ভাঙল, রোদ উঠে গেছে। উঠে বসল বিকাশ। চোখে ঘুম জড়িয়ে আছে। জোর করে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। অরুণা তখনো নিদ্রামগ্ন। কম্বলটা গা থেকে সরে গেছে। টেনে সারা গা ভালো করে ঢেকে দিল। ওর মুখে একটি নিরাময়তার ভাব ফুটে উঠেছে। অনেকদিন একটানা জ্বরভোগের পর জ্বরমগ্ন হয়ে গেলে রোগীর মুখের ভাব যেমন হয় তেমনি। সস্নেহে রুক্ষ বিশৃংখল চুলগুলি কপাল থেকে সরিয়ে দিল। আলগা ভাবে কপালে হাত দিল।

নিচে নামতেই ক্ষুদুর মা বলল, 'খুকি এখনো ঘুমোচ্ছে, জ্বর-টর হয়নি তো?'

বিকাশ বলল, 'মনে হল না।'

ক্ষুদুর মা বলল, 'আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিন।'

চা খেতে-খেতে ক্ষুদুর মাকে বলল বিকাশ, 'একটা কথা তোমাকে জিগগেস করছি। ভেবে জবাব দাও।' একটু থেমে বলল, 'অরুণাকে আমি বিয়ে করতে চাই। বিধবা-বিবাহ বে-আইনি নয় তা জানো তো?'

ক্ষুদুর মা বলল, 'আইনী বে-আইনী বুঝিনে আমি। ওর বিয়েই হয়নি। যা হয়েছিল নামেই বিয়ে, আইবুড়ো নামটা ঘোচানো শুধু। আপনি বিয়ে করুন ওকে। আমার একটুকু অমত নেই।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ছোটবেলা থেকে ও আপনাকে দেখেছে, আপনাকে চিনেছে, আপনার সংগে ওর মনের মিল হবে।'

ধীরে-ধীরে চায়ে চুমুক দিতে-দিতে ক্ষুদুর মা'র কথা শুনছিল বিকাশ। হঠাৎ বলে উঠল, 'কাল রাত্রে ও খুব ভয় পেয়ে চিৎকার করেছিল। ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙাতে না পেরে, দরজায় জোর ধাক্কা দিলাম। খিলটা ভেঙে গিয়ে দরজা খুলল। ওকে আমার ঘরে নিয়ে এসে আমার বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তার পর থেকে শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে।'

ক্ষুদুর মা উদাস কণ্ঠে বলল, 'কি আর করব বলুন। কোনো কথা শুনবে না। অবাধ্য মেয়ে। এমনি করে মরে যাবে একদিন।'

চা খাওয়া শেষ করে বিকাশ বলল, 'একবার দেখে আসি রুনু উঠেছে

কিনা।' উপরে গেল বিকাশ। অরুণা উঠেছে। নিজের বিছানাটা তুলে নিজের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। বিকাশ বলল, 'ওটা অত তাড়াতাড়ি ও ঘরে নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

অরুণা বলল, 'যাব না?'

'না, এ ঘরে রাখ।'

'তুমি শোবে কোথায়? কাল সারারাত তো মেজেতে পড়েছিলে।'

'আমার ব্যবস্থা হবে। সে তোমাকে ভাবতে হবে না। দাও দেখি'—বলে বিছানাটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে খাটের এক পাশে রাখল।

অরুণা ঘর থেকে যাবার উপক্রম করতেই বিকাশ বলল, 'আবার যাচ্ছ কোথায়?'

'ও ঘরটা একটু পরিষ্কার করতে হবে তো, আরও নানা কাজ।'

'থাক ওসব। ঘরটায় একটা তালা লাগিয়ে দিচ্ছি এখুনি।'

অরুণা হেসে বলল, 'বাপ রে কড়া ব্যবস্থা! কি করব তাহলে এখন?'

'মুখ-হাত ধোও। রাত্রে তো খাও না শুনলাম। খেয়ে নাও কিছু। ওকি! বেশ খোঁড়াচ্ছ যে—'

অরুণা বলল, 'বা রে! আঙুলটা কাল কাটল যে! ভুলে গেছ বুঝি?'

'না। সিঁড়িতে নামতে পারবে?'

'পারব।'

'দাঁড়াও, সঙ্গে যাচ্ছি।'

'কালকের মতো কোলে করে নিয়ে যাবে নাকি!'

'দরকার হলে করতে হবে। দোষ কি?'

'না-না, দরকার হবে না।'

অরুণা একটু টলে পড়বার উপক্রম করতেই বিকাশ ওর বাহু চেপে ধরল। বলল, 'তোমার গা গরম মনে হচ্ছে। জ্বর হয়েছে নাকি?' কপালে হাত দিয়ে বলল, 'হয়েছে একটু।'

ওকে হাত ধরে নামিয়ে দিল বিকাশ। ক্ষুদুর মাকে হেঁকে বলল, 'একটু গরম জল দিতে পার?'

অরুণা বলল, 'কেন? কি হবে?'

বিকাশ বলল, 'তোমার আঙুলটা একবার দেখি।'

'পরে হবে। তুমি খাবার, চা খেয়েছ?'

'হ্যাঁ। একবার দেখে নিই এখন। বিষিয়ে যেতে শুরু করেছে বোধ-হয়।'

ক্ষুদুর মা গরম জল নিয়ে এল। বিকাশ ওকে জিগগেস করল, 'গাঁয়ে ভালো ডাক্তার আছে?'

ক্ষুদুর মা মুখ কুঁচকে বলল, 'ভালো নয় এমন কিছু। আসবেও না হয়তো। কমলবাবুর বারণ আছে।'

বিকাশ সবিস্ময়ে বলল, 'তাই নাকি! ডাক্তারের এসব নীচতা! কমল-বাবুটি কে?'

'গাঁয়ের কর্তা এক রকম। জামাইবাবুর পিসতুতো ভাই।'

'বুঝতে পেরেছি।' তারপর অরুণার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাকেই চিকিৎসার ভার নিতে হবে তাহলে। বস দেখি।'

অরুণা বলল, 'কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ বল দেখি? এমন কিছু হয়নি।' একটু থেমে বলল, 'ছোটবেলা থেকে এমনি! একটুতেই বাড়াবাড়ি!'

'তা হোক. বস,' বলে হাত ধরে বসিয়ে দিল। 'দেখি পা-টা,' বলে পায়ের পাতাটা টেনে নিল।

'কাল থেকে কতবার যে পায়ে হাত দিলে!' বলে রাগ ও সোহাগের ভঙ্গীতে মুখখানি অপরূপ সুন্দর করে তুলল অরুণা। বিকাশ হঠাৎ মুখ তুলে ওর মুখখানি এক চোখ দেখে নিয়েই মুখ নামিয়ে নিজের কাজ করতে লাগল।

অরুণা বলল, 'কি দেখলে?'

বিকাশ বলল, 'তোমার মুখটি বেশ সুন্দর দেখাল।'

আঙুলটা ও পায়ের পাতাটা ফুলে উঠেছে। ক্ষত স্থানটায় পুঁজ জমতে শুরু করেছে। দেখে মুখ গম্ভীর করল বিকাশ। জিগগেস করল, 'খুব ব্যথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

গম্ভীর মুখে ভাবতে লাগল বিকাশ।

অরুণা বলল, 'প্যাঁচার মতো মুখ করলে যে?'

বিকাশ বলল, 'বিষিয়ে গেছে। কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে আরও বেড়ে যাবে। কাল এইটাই ভয় করেছিলাম। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে,

কিছু খেয়ে শুয়ে থাকবে। আমি ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করিগে। যাও দেখি চট করে, আমি ওপরে তুলে দিয়ে যাব।'

'আমি পারব নিজে।'

'থাক আর বাহাদুরী করে কাজ নেই।' একটু থেমে বলল, 'কাছেই একটা শহর আছে। দশ-বারো মাইল দূর। সব পাওয়া যায়। আমি যাব সেখানেই। তোমার গায়ের আর পায়ের মাপটা দিও। জুতো জামা কিনে আনতে হবে।'

অরুণা প্রতিবাদের সুরে বলল, 'না, না, কিছু দরকার নেই আমার।'

রাগে, অভিমানে মুখ লাল হয়ে উঠল বিকাশের। দেখে ভয়ে-ভয়ে বলল অরুণা, 'সত্যি বলছি, কি হবে ও-সবে?'

'আচ্ছা যাও,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল বিকাশ।

ঐ রোষারুণ মুখখানি, ঐ বিদ্যুত চকিত চোখের দৃষ্টি কতবার দেখেছে অরুণা! শৈশব থেকে পনেরো-ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত! সব ঘটনা মনের সামনে ভিড় করে দাঁড়াল। রাগলে তোমাকে খুব ভালো দেখায়, মণ্টুদা! বলেছিল একদিন। বিকাশ বলেছিল—তাহলে সব সময়ই রেগে থাকব। খুব ভালো লাগে তো তোর? তুই বলত তখন। কলেজে ঢুকে তুমি বলতে শুরু করল। প্রথম দিন শুনে সে ঠাট্টা করেছিল—কলেজে ঢুকেই সভ্য হয়ে গেলে যে!

কত কথা মনে পড়ল। প্রতিদিন মনে পড়ে। হাতে যখন কাজ থাকে না, বসে দাঁড়িয়ে সময় আর কাটতে চায় না, জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সামনের আদিগন্ত মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে আর এই সব কথা ভাবে। নিরুপায় নিঃসঙ্গতা যখন চারদিক থেকে চেপে ওর মনকে পিষে দিতে আসে, তখন শৈশব-কৈশোরের মধুর দিনগুলির স্মৃতির মধ্যে পালিয়ে গিয়ে ওর মন আশ্রয় পায়, সঙ্গ পায়।

একটু পরে ফিরে এল অরুণা। দেখল, বিকাশ চুপ করে বসে আছে। অরুণাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল তাহলে, তোমার মুখ যা থমথম করছে এখুনি তেড়ে জ্বর আসবে। দেখি হাতটা'—বলে ডান মণিবন্ধটা একটু চেপে বলল, '১০২ ডিগ্রির বেশি, চল—'

ক্ষুদুর মা কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। অরুণা বলল, 'আমি নিজেই যেতে পারতাম।'

অরুণাকে উপরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, কম্বলটা দিয়ে বেশ করে সর্বাঙ্গ ঢেকে দিয়ে বিকাশ বলল, 'চুপ করে শুয়ে থাক—আমি ঘুরে আসি। কেমন?' একটু পরে পোশাক পরে ফিরে এল। অরুণা চুপ করে শুয়েছিল। বিকাশ কপালে হাত দিতেই চোখ খুলে মৃদু হাসল। বিকাশ বলল, 'আমি যাচ্ছি, কেমন? মাথাটা খুব ধরেছে?'

নীরবে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানাল অরুণা।

'ক্ষুদু কাজে গেছে বোধহয়, না?' দাঁড়িয়ে একটু ভাবল বিকাশ। তারপর চলে গেল।

একটু পরেই গাড়ির শব্দ শোনা গেল।

অরুণার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। আসবে তো? যদি না আসে আর?

একটানা দুর্যোগের পর এই যে হঠাৎ আলোর আভা ফুটে উঠেছে, এর পর যদি না থাকে দীর্ঘ দীপ্ত দিন। এ যদি দিনান্তের হাসির মতো ক্ষণকালের মধ্যে মিলিয়ে গিয়ে নামে অন্তহীন রন্ধ্রহীন অন্ধকার! বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল অরুণার।

বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেখতে পেল বিকাশের গাড়ি পিছনে ধূলিজাল সৃষ্টি করতে-করতে ছুটেছে। অচিরে পথের বাঁকে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

শহর থেকে প্রায় দু মাইল দূরে একটা গ্রাম। তারপরেই একটা নদী। নদীটা প্রায় এক মাইল চওড়া। নদীতে জল নেই। এপার থেকে প্রায় ওপার পর্যন্ত একটানা বালি। ওপারের কোলে একফালি জল। গরুর গাড়ি আর্তনাদ করতে-করতে পার হয়ে যাচ্ছে। মোটর পার করা অসম্ভব। অনেক লোক মিলে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। নদীর ধারেই একটা চায়ের দোকান। বিকাশের সাহেবী পোশাক দেখে দোকানী খাতির করে বসাল। যত্ন করে চা খাওয়াল। বিকাশ বলল, 'একটা বিশ্বাসী লোক দিতে পার? ফিরে না আসা পর্যন্ত গাড়িটা পাহারা দেবে। বকশিশ দেব।' চায়ের দোকানের একজন ছোকরা সাগ্রহে রাজী হল। নদী হেঁটে পার হল বিকাশ। ওপারে জল পার হবার জন্য জুতো-মোজা খুলে ফেলতে হল।

নদীর ধার থেকে শহর প্রায় এক মাইল। রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যায়। বিকাশ একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করল। প্রথমে ডাক্তারখানায় গিয়ে ওষুধপত্র, ইঞ্জেকশান দেবার জন্য পিচকারী ইত্যাদি কিনল। মনোহারী দোকান থেকে অরুণার জন্য সাবান, তেল, টুথব্রাশ ও পেস্ট, তোয়ালে, হরলিক্স, দুটো লণ্ঠন, একটা স্টোভ, চা, মাখন, দুধ ইত্যাদি নানা জিনিস কিনল। কাপড়ের দোকান থেকে অরুণার জন্য শাড়ি, শেমিজ, ব্লাউজ, ক্ষুদুর মা'র জন্য এক জোড়া ধুতি, ক্ষুদু ও কানাইয়ের জন্য ধুতি জামা, বিছানার চাদর ইত্যাদি কিনল। জুতোর দোকান থেকে অরুণার জন্য এক জোড়া জুতো, এক জোড়া স্যাণ্ডাল কিনল। এই সব জিনিস ঘোড়ার গাড়িতে বোঝাই করে নদীর ধারে ফিরল। নদীর ধার থেকে একটা গরুর গাড়ি গাঁয়ে ফিরছিল। গাড়িটা ভাড়া করল। গাড়িতে জিনিসপত্র সমেত নিজে চেপে নদী পার হল।

গাড়ির শব্দ পেয়েই ক্ষুদুর মা, কানাই ছুটে এল। ক্ষুদু বাড়িতে ছিল, সেও এল। গাড়িটা যথাস্থানে রেখে বিকাশ ক্ষুদুকে বলল, 'তোমরা দুজনে জিনিসগুলি একে-একে উপরে নিয়ে এস।' ক্ষুদুর মাকে জিগগেস করল, 'রুনু কেমন?'

ক্ষুদুর মা বলল, 'জ্বরটা খুব বেড়েছে, অঘোরে ঘুমোচ্ছে

বিকাশ বলল, 'জানতাম। আমি উপরে যাই—আমাকে এক কাপ চা খাওয়াও দেখি—ভালো চা এনেছি। চিনি আছে তো?' বলে উপরে চলে গেল।

উপরে এসে দেখল—অরুণা অসাড় হয়ে শুয়ে আছে। হাঁপাচ্ছে। মুখ লাল হয়ে গেছে। কপালে হাত দিতেই হাত যেন পুড়ে গেল।

'অরুণা!' ডাক দিল বিকাশ।

চোখ দুটো মেলল অরুণা। জবাফুলের মতো টকটকে লাল চোখ।

'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। কখন এলে?'

'এই মাত্র।'

'খেয়েছ? খেয়ে নাও গে—'

'একটা ইঞ্জেকশান আগে দিই, তারপরে—'

ইঞ্জেকসান দেওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল বিকাশ। কানাই ও ক্ষুদু জিনিসগুলো এনে মেজের উপরে রাখতে লাগল।

অরুণা বলল, 'কত খরচ করেছ? এত ফল কে খাবে?'

বিকাশ বলল, 'তুমি। বেদানা, লেবু, আপেল আর ডাব নিয়ে এলাম। আঙুরের চেষ্টা করলাম ভালো পেলাম না।'

কানাই গুদোম-ঘর থেকে যোগাড় করে একটা টেবিল আনল। ওষুধ-পত্র ও ফলগুলো তার উপরে রাখা হল।

ইঞ্জেকশান দেওয়া হল। অরুণা বলল, 'এবার নেয়ে খেয়ে নাও গে—'

ঘণ্টা তিনেক পরে আরও একটা ইঞ্জেকশান দেওয়া হল। ওষুধও খাওয়ানো হল। ফলের রস ও হরলিক্‌স খাওয়ানো চলতে লাগল। জ্বরও চলতে লাগল।

বিকাশ সারাক্ষণ ওর পাশে বসে রইল। অরুণা একবার বলে উঠল, 'আমাকে ফেলে যেও না, বুঝলে—' বিকাশ ওর হাতটি কোলের উপর রেখে সস্নেহে ধরে রইল।

এমনি করে অনেকক্ষণ কাটল। ক্ষুদুর মা এসে বলল, 'আপনার খাবারটা বারান্দায় দিয়েছি, খেয়ে নিন। আমি কাছে বসছি—'

খাওয়া সেরে বিকাশ অরুণার কপালে হাত দিতেই চোখ খুলল। বলল, 'জল খাব।'

'ডাবের জল খাও।'

'না, এমনি জল।'

জল খেয়ে অরুণা বলল, 'কটা বেজেছে?'

বিকাশ ঘড়ি দেখে বলল, 'বারোটা।'

অরুণা বলল, 'খেয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'শোবে না? কোথায় শোবে?'

বিকাশ বলল, 'জ্বরটা একটু কমলে যেখানে হোক শোব, তোমাকে ভাবতে হবে না।'

অরুণা দু-চোখের কাতর বিহ্বল দৃষ্টি মেলে বলল, 'কেমন ভয় করছে। আমার কাছ ছেড়ে যেও না—'

রাত্রি দুটোর পর জ্বর অনেক কমে এল। রোগী শান্ত ভাবে ঘুমোতে লাগল। বিকাশ সারাদিনের পরিশ্রমের পর গভীর ক্লান্তিতে খাটের এক পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল বিকাশের। দেখে অরুণা কখন সরে এসে তার বুকের পাশে মুখটি রেখে ঘুমোচ্ছে। ওর তপ্ত একটি হাত তার বুকের উপরে আলগা ভাবে পড়ে রয়েছে।

পরদিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল বিকাশের। অরুণা সরে গেছে কখন নিজের জায়গায়। উঠতেই অরুণার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ল। মুখ-খানি আরও কাহিল, আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ঠোঁট দুটি শুকিয়ে গেছে। কপালে হাত দিল। জ্বর নেই বললেই হয়। গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে অরুণা। সন্তর্পণে খাট থেকে নেমে বাইরে গেল বিকাশ।

হাত-মুখ ধুয়ে চা-খাবার খেতে-খেতে ক্ষুদুর মাকে বিকাশ বলল, 'বাড়ির কি-কি জিনিস দরকার একটা লিস্ট কর দেখি। এখানে সব জিনিস কোথায় পাওয়া যায়?'

'পাশের গাঁয়ে বড় দোকান আছে।'

'ক্ষুদুর জামা পছন্দ হয়েছে তো?'

কৃতজ্ঞতা-উচ্ছল কণ্ঠে ক্ষুদুর মা বলল, 'খুব পছন্দ হয়েছে। বেশ মোটা-সোটা। শীত কাটবে খুব।'

'তোমার চাদরটি?'

'বেশ ভালো হয়েছে। খুকি কেমন আছে?'

'জ্বরটা নেমে গেছে। খুব দুর্বল। ভালো দুধ পাওয়া যাবে?'

'সাঁওতালদের পাড়ায় পাওয়া যায়। কানাই খোঁজ করবে—'

উপরে গিয়ে ঘরে ঢুকতেই অরুণার সঙ্গে চোখাচোখি হল। অরুণা জেগে উঠে ক্লান্ত দৃষ্টিতে ব্যাকুল প্রত্যাশায় দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল। বিকাশকে দেখেই ওর মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল।

বিকাশ সস্নেহে বলল, 'উঠেছ?' কাছে গিয়ে হাতখানি তুলে ধরে নাড়ী দেখল। বলল, 'জ্বর নেই। মুখ ধুয়ে নাও।'

অরুণা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'উঠতে পারব কি?'

'তোমাকে উঠতে হবে না। আমি তুলে দিচ্ছি,' বলে অতি যত্নে ওকে ধরে বসিয়ে দিল।

এক বালতি জল দিয়ে গেল কানাই। নতুন বালতি দেখে অরুণা বলল, 'ওটা কোত্থেকে এল?'

কানাই বলল, 'বাবু কিনে এনেছেন। আরও কত—কত জিনিস।'

অরুণা বলল, 'দুদিনের জন্য কেন এত খরচ করছ?'

বিকাশ বলল, 'দুদিনের জন্য কে বলল?'

'এখান থেকে তো তাড়িয়ে দেবে—'

'অন্য জায়গায় আস্তানা পাততে হবে তো? তখন এসব দরকার হবে। টুথপেস্ট নেবে না মাজন? দুই-ই আছে।'

অরুণা বলল, 'মাজন দাও একটু—'

মুখ ধোয়া হল। গরম জল আনিয়ে হরলিক্‌স বানিয়ে দিয়ে বিকাশ বলল, 'লেবু খাও একটা। বেদানা খাবে নাকি? দাঁড়াও ছাড়িয়ে দিচ্ছি।'

অরুণা অকৃত্রিম রোষের সঙ্গে বলল, 'কি সব কাণ্ড করেছ? টাকা-গুলোকে নয়-ছয় করে খরচ করে এসেছ। বড় উড়নচণ্ডী মানুষ, হাতে টাকা থাকলে আর রক্ষা নেই!'

নিজের কথাগুলো মনে-মনে চাখতে লাগল অরুণা। পরিপূর্ণ পাওয়ার তৃপ্তির স্বাদটুকু ওর মনকে মধুর করে তুলল। ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে ওকে এমন ভাবে শাসন করতে পারবে, ভেবেছিল কি কোনো দিন?

বিকাশ বলল, 'আর একটা ইঞ্জেকশান দেব।'

অরুণা বলল, 'আর দিও না বাপু! এতেই ভালো হয়ে যাব!'

বিকাশ বলল, 'আর একটা দিয়ে রাখাই ভালো। কেমন?'

ইঞ্জেকশান দিয়ে বলল, 'খানকতক ধোয়া শাড়ি, শেমিজ, ব্লাউজ এনেছি। ও নরুনপাড় ধুতিটা চোখে দেখতে পারছি না! ক্ষুদুর মাকে গরম জল করতে বলে দিচ্ছি। একটু গা-হাত মুছে মাথাটা ঠাণ্ডা জলে ধোও। আর ঐ ধুতিটা ছেড়ে ফেলে একটা শাড়ি পরে নাও।' বলে মেজে থেকে কয়েকখানা শাড়ি ব্লাউজ তুলে এনে ওর বিছানার উপরে রাখল।

কিছুক্ষণ পরে কানাইকে নিয়ে গাড়ি চড়ে বিকাশ গ্রামের দিকে রওয়ানা হল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প করছিল দুজনে। অরুণা শুয়েছিল। বিকাশ পাশে একটা ইজি-চেয়ারে বসেছিল। অরুণা বলল, 'দুদিনের জন্য এলে—কত কষ্ট দিলাম তোমাকে।'

বিকাশ বলল, 'দুদিনের জন্য আসিনি। কষ্টও কিছু পাইনি।'

'কত খরচ হয়ে গেল!'

'খরচ করবার জন্যই তো টাকা।'

'সে নিজের জন্য! পরের জন্য তো নয়?'

'পর কে? তুমি?' বলে বিকাশ অরুণার মুখের দিকে তাকাল। চোখ নামিয়ে নিল অরুণা। ওর ঐ চোখের চাহনি সহ্য করতে পারে না অরুণা। বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে। গলাটা চেপে আসে যেন।

বিকাশ বলল, 'আপনার পর, এর মীমাংসা শেষ করে দিচ্ছি যত শিগগির পারি—'

অরুণা বলল, 'মানে?'

'বিয়ে করব তোমাকে—'

অরুণা বলল, 'পাগল হয়েছ? আমি বিধবা। রুগ্না, কুরূপা। আমাকে বিয়ে করবে কি? তোমার আত্মীয়স্বজনেরা বলবে কি? তোমার বোনেরা? তাদের কত সাধ—রূপসী, শিক্ষিতা, বড়লোকের মেয়ে তাদের বাড়ির বৌ হয়ে আসবে, কত স্ফূর্তি করবে বিয়েতে। আমাকে তুমি বিয়ে করলে ওরা কোনোদিন আমার মুখ দেখতে চাইবে না, আমাকে তাদের বাড়িতে ঢুকতে দেবে না, আমাদের বাড়িতেও কখনো পা দেবে না। কেন মিছিমিছি দুঃখ দেবে, দুঃখ পাবে। আমিও সুখী হব না।'

বিকাশ বলল, 'আমি তো কাউকে চাইনে। তোমাকে নিয়ে আমি দেশ ছেড়ে চলে যাব—'

'ছিঃ! তা কেন করবে! তোমাকে দেখতে পেলাম, তোমার হাতের সেবা-যত্ন পেলাম, আর আমার কোনো খেদ নেই। তুমি আমাকে স্নেহ কর আমি নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছি, আর আমি কিছু চাইনে। যেটুকু পেলাম এই সম্বল নিয়ে আমি বাকি জীবন কাটিয়ে দেব। তুমি এত

বড় ডাক্তার হয়ে এসেছ। দেশের লোকের সেবা কর। দেশ ছেড়ে চলে যাবার কি দরকার? মনের মতো বৌ হোক, ছেলেমেয়ে হোক, প্রচুর ধন, মান, খ্যাতি হোক, দেশের মধ্যে গণ্য-মান্য হয়ে ওঠ। আমি যদি বেঁচে থাকি শুনেও তৃপ্তি পাব। যদি মরেও যাই, স্বর্গ থেকে চোখ মেলে দেখব। অবিশ্যি, স্বর্গে যাব না নরকে যাব জানিনে। পাপের তো সীমা নেই!'

গম্ভীর হয়ে উঠল বিকাশ। অরুণা বলল, 'রাগ করলে নাকি?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিকাশ বলল, 'না, রাগ কিসের?' টেবিলে হাতঘড়িটা ছিল, দেখে বলল, 'একটা ওষুধ খেতে হবে। খিদে পেয়েছে নাকি?'

অরুণা বলল, 'জ্বর তো নেই। আবার ওষুধ খেতে হবে কেন?'

'খেতে হবে,' বিকাশ একটা ট্যাবলেট এনে বলল, 'হাঁ কর।'

অরুণা বলল, 'জল নিয়ে এস। খাব কি করে?'

আরও কিছুক্ষণ পরে বিকাশ বলল, 'একটু হরলিক্স করে দেব?'

'তুমি করে দেবে?'

'দোষ কি? স্টোভ কিনেছি একটা, দেখনি?'

অরুণা বলল, 'একদিনের জন্য বিছানায় পড়েছি, আর তুমি যা ইচ্ছে তাই করে বসে আছ। তোমাকে শায়েস্তা করতে হলে জবরদস্ত বৌ চাই।'

'বেশ তো, দেখে-শুনে তাই যোগাড় করে দিও,' বলে বিকাশ স্টোভ ধরাতে বসল।

একটু পরে বলল, 'কানাইকে বলে দিয়েছি বাসের ড্রাইভারকে শহর থেকে পাঁউরুটি আনবার জন্য পয়সা দিতে। বাসটা এখানে আসে কখন?'

'সন্ধ্যার পরে।'

'তাহলে রাত্রে পাঁউরুটি খাবে, কেমন?'

সশব্দে স্টোভ জ্বলতে লাগল। জলের কেটলিটা বসিয়ে দিয়ে এসে চেয়ারে বসল বিকাশ। অরুণা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ চোখ পড়তেই বিকাশ বলল, 'কি দেখছ?'

অরুণা বলল, 'তোমাকে। দেখে নিচ্ছি প্রাণ ভরে যতক্ষণ কাছে আছ। মন ভরে নিচ্ছি। যখন থাকবে না, তখন একলা বসে-বসে এই ছবিগুলি দিনের পর দিন দেখব।'

বিকাশ বলল, 'তোমাকে মাঝে-মাঝে আমার ছবি পাঠিয়ে দেব। মনে আঁকা-আঁকি করবার দরকার নেই। এখানেই তো থাকবে স্কুলের মাস্টারনী হয়ে।'

অরুণা বলল, 'কোনো রকমে দুটি খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে তো। কে আর খেতে দেবে আমায়?' হঠাৎ চোখে জল এল। মুছে ফেলল অলক্ষ্যে।

বিকাশ বলল, 'সে কথা সত্যি!'

অরুণা তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল, 'বলতে লজ্জা করে না? ভাই-বোনের মতো এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি, বোনটা না খেতে পেয়ে মরবে, দেখবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে?'

বিকাশ বলল, 'আমি কি এখানে থাকছি যে দেখব। আমি থাকব সাত সমুদ্র পারে।'

অরুণা বলল, 'মানে?'

'বিলেত চলে যাব, সেখানে গিয়ে প্র্যাকটিস করব।'

'বিয়ে করবে না?'

'হ্যাঁ, করব বৈকি! করলে যুগল মূর্তির ছবিও পাবে।'

মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল অরুণার। বলল, 'আর দেশে আসবে না?

বিকাশ বলল, 'কি জন্য আসব? কিসের টানে আসব?'

অরুণা বলল, 'যদি একবার দেখতে ইচ্ছে করে?'

'ফোটো দেখবে। না হলে মনে যা আঁকছ তাই বার করে-করে দেখবে।' বিকাশের কণ্ঠস্বরে শ্লেষের আমেজ স্পষ্ট ধরা পড়ল।

অরুণা বলল, 'তুমি রাগ করে এসব বলছ — নয়?'

বিকাশ বলল, 'না, রাগ করে নয়।'

জলটা ফুটতে শুরু করল। বিকাশ উঠে গিয়ে যথাবিধি হরলিক্স তৈরি করে এক কাপ এনে সামনে ধরল। অরুণা বলল, 'আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।'

বিকাশ রাগে মুখ লাল করে বলল, 'ইচ্ছে না করে তো ফেলে দিই —'

'না, না, ফেলবে কি! দাও,' বলে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে কাপটা নিল অরুণা।

বিকাশ একটা বই নিয়ে এসে, ইজি-চেয়ারে বসে পড়তে শুরু করল।

হরলিক্স খেয়ে অরুণা নামবার উপক্রম করতেই বিকাশ বলল, 'নামছ কেন?'

অরুণা বলল, 'কাপটা রাখব না? জল খাব যে।'

'বললেই তো হয়। এসব বাহাদুরী না করে—' বলে কাপটা হাতে নিয়ে নিচে নামিয়ে রাখল। কলসী থেকে জল এনে দিল। তারপর ইজি-চেয়ারে বসে আবার পড়তে লাগল।

অরুণা বলল, 'তুমি ভারি রাগ করেছ, না? আমি কি বললাম যে এত রাগ?'

'কি বলতে বাকি রেখেছ? আমি কি এতই অবহেলার পাত্র যে ভিখিরীর মতো বার-বার চাইব, আর বার-বার তুমি দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেবে? যাকে ভালোবাসনি, শ্রদ্ধা করনি—'

'শ্রদ্ধা করেছি চিরদিন।'

ওর কোনো কথা কানে না তুলে বিকাশ বলতে লাগল, 'বিশ্বাস করনি।'

'বিশ্বাসও করেছি, না হলে তাঁর সঙ্গে এতদিন কাটালাম কি করে?'

'সে তো বেড়াল তাড়িয়ে-তাড়িয়ে মাছ-ভাজা আগলে রাখার মতো নিজের দেহটাকে আগলে রেখেছ। কলহ হয়েছে, মারধর চলেছে, শেষে এক পক্ষ আত্মহত্যা করেছে। এসব তো তোমার আত্মীয়স্বজনদের কথা। তুমি নিজেও তাই বলেছ।'

'সে তো তাঁর শরীরের জন্য। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে নিজেকে তাঁর হাতে তুলে দিতাম। মনঃক্ষোভ হত না এক বিন্দুও। সত্যি বলছি।'

বিকাশ বলল, 'স্বামীকে যদি সত্যি ভালোবেসেছিলে, সে তো ভালো কথা। তাঁর স্মৃতি নিয়ে তুমি এখানে থেকে জীবন কাটিয়ে দাও। তুমি একটু সেরে উঠলেই আমি চলে যাব। কোনোদিন আর বিরক্ত করতে আসব না।' একটু থেমে বলল, 'যেমন এতদিন ভেবেছি তুমি আমার জীবন থেকে একেবারে হারিয়ে গেছ, তাই ভাববার চেষ্টা করব।'

'আর যদি সেরে না উঠি?'

'তাহলেও যাব। আমি কেন বসে থাকব এখানে? আমি আমার

নিজের জীবনে ফিরে যাব, তুমি তোমার জীবন নিয়ে থাকবে।'

অরুণা করুণ স্বরে বলতে লাগল, 'আমার আবার জীবন! কদিনই বা বাঁচব! এবার তুমি ছিলে, বাঁচিয়ে তুললে। না থাকলে মরেই যেতাম। কে দেখত আমাকে? আমাকে দেখেও বুঝতে পারছ না, মরণ জড়িয়ে ধরেছে আমাকে। আমার প্রাণ জোঁকের মতো শুষে খাচ্ছে। আমাকে নিয়ে কার কি কাজ হবে? একটা ভাঙা, ফুটো প্রদীপে কার কি প্রয়োজন? কারও সংসার আলো করবার ক্ষমতা নেই আমার। তুমি যাবে, আমি জানি। প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছি তুমি চলে যাবার ছল খুঁজছ। আমার যদি রূপ, যৌবন, অর্থের মধু থাকত, কত ভ্রমর গুঞ্জন করত আমাকে ঘিরে; আমার কাছে থাকবার জন্য সাধ্য-সাধনা করত—' বলে হাঁপাতে লাগল অরুণা।

একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে শুনছিল বিকাশ। রাগে মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। অকথিত কথার চাপে ঠোঁট দুটি কাঁপছিল, চোখে বিদ্যুত ঘনিয়ে উঠছিল।

অরুণা বলল, 'চলে যাবার জন্য ছল খুঁজতে হবে কেন? আমার কাছে দুদিন থাক। প্রিয় বান্ধবীদের কাছে তো চিরদিনই থাকবে।'

বিকাশ রোষ-গাঢ় স্বরে বলল, 'নীচ লোকদের সঙ্গে থেকে তুমি অত্যন্ত নীচ হয়ে গেছ। এসব বলতে লজ্জা করছে না? আসার পর থেকে শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছি। কোনো কথায় কান দাওনি। বার-বার অপমান করে ঠেলে দিয়েছ। আর এখন উল্টো-উল্টো কথা! চিরদিন ঐ স্বভাব তোমার, নিজে ঝগড়া শুরু করে আমার ঘাড়ে চাপানো। আজও তাই করছ।'

অরুণা কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলল, 'এত কথার দরকার কি? তুমি যখন ইচ্ছা হবে যেও, আমি ধরে রাখব না। আমার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাও। যেন নির্ঝঞ্ঝাটে মরতে পারি, তেমন একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দাও। একদিন তো ছোট বোনের মতো ভালোবাসতে। সেই স্নেহের জোরে একটু দাবী করতে পারি না?'

বিকাশ বলল, 'তাই করে দিয়ে যাব। আজ যাব স্বামীজীর কাছে। ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করে যা করবার করে যাব।'

অরুণা ভয়ে-ভয়ে জিগগেস করল, 'কবে যাবে?'

'যত শিগগির ব্যবস্থা হবে—' বলে উঠে দাঁড়াল বিকাশ।

অরুণা বলল, 'এখুনি কোথায় যাচ্ছ?'

'একটু ঘুরে আসি।'

'চা খাবে না?'

'থাক্, পরে খাব।'

'আমি করে দিচ্ছি চা।'

বিকাশ শ্লেষের স্বরে বলল, 'থাক্, আর আপ্যায়ন করতে হবে না। খুব হয়েছে।'

অরুণা অশ্রু-সজল-কণ্ঠে বলতে লাগল, 'আমি গরীব। দুর্বল। তোমার মতো লোককে আপ্যায়ন করা কি আমার সাধ্য? দয়া করে এসেছ, দুদিন আমার কাছে আছ, এ যে আমার কত সৌভাগ্য তা তুমি বুঝতে পারবে না। আমার উপর রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি! আমি বড় অসহায়, বড় অভাগী। পৃথিবীতে আপনার বলতে কেউ আমার নেই।'

কেঁদে ফেলল অরুণা।

বিকাশ বলল, 'ঐ পার শুধু! কেঁদে জেতা।' বলে স্টোভ জ্বালতে শুরু করল।

অরুণা বলল, 'চা, চিনি, দুধ কই? এমনিই হবে চা?'

বিকাশ বলল, 'সব আছে বসে-বসে দেখ।'

চা তৈরি হল। নিজের জন্য এক পেয়ালা, অরুণার জন্য এক পেয়ালা। অরুণার চায়ের পেয়ালা ওর সামনে ধরতেই সে বলল, 'আবার চা খাব? এই তো হরলিক্স খেলাম।'

বিকাশ বলল, 'বেশ, না খাও তো আমিই খাব দু-পেয়ালা।' বলে ঠক্ করে সামনে টুলের উপর চায়ের পেয়ালা দুটো নামাল।

অরুণা বলল, 'এত জোরে নামাচ্ছ যে ভেঙে যাবে এখুনি। এত দামী পেয়ালা!' একটু থেমে বলল, 'রাগটি এখনো তেমনিই আছে। তোমার মা তো সহ্য করতেন না। বোনেরা করে না। রূপবতী, গুণবতী, ধনবতী বৌ এলে সেও করবে না।'

বিকাশ রাগে মুখ হাঁড়ি করে চা খেতে লাগল।

অরুণা বলল, 'একটু শান্ত হও না। এই মেজাজ নিয়ে বিদেশে এতদিন ছিলে কি করে? থাকবেই বা কি করে?'

বিকাশ বলল, 'পণ্ডিতমশায়গিরি ফলিও না রুনু, যথেষ্ট হয়েছে।' বলে মুখটা আবার হাঁড়ি করে তুলল।

অরুণা বলল, 'শুনছ, চা-টা দাও।' বিকাশ ও কথায় কান দিল না। অরুণা বিছানা থেকে নামবার উপক্রম করতেই বিকাশ চায়ের পেয়ালা ওর হাতে দিয়ে বলল, 'সেই করবে তবু প্যাঁচ না মেরে পার না। ভারি প্যাঁচালো চিরদিন।'

অরুণা বলল, 'আমার তো সবই দোষ। না হলে জীবনটা তছনছ হয়ে গেল! একদিনও সুখ-শান্তির মুখ দেখতে পেলাম না।'

চা খাবার পর পোশাক পরে বেরিয়ে পড়ল বিকাশ। যাবার আগে ক্ষুদুর মাকে বলল, 'সন্ধ্যের সময় একটা ওষুধ খাইয়ে দিও। আর হরলিক্স। কানাই যেন পাঁউরুটি এনে রাখে। দুধ তো পাওয়া গেছে, না?'

ক্ষুদুর মা বলল, 'এক সের করে দেবে।'

বিকাশ বলল, 'রুনুকে রাত আটটায় দুধ আর টোস্ট দিও।'

ক্ষুদুর মা জিগগেস করল, 'আপনার কি ফিরতে রাত হবে?'

'হতে পারে। তোমরা খেয়ে নিও। আমার খাবারটা বারান্দায় ঢাকা দিয়ে রেখে দিও।'

বিকাশের গাড়ি বড় রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল। কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থান নেই। যত দূর হোক ঘুরে ফিরে আসা। দু-পাশে মাঠ, পুকুর, বাগান, ঝোপ-ঝাড়, দু-একটা গ্রাম পার হয়ে যাচ্ছিল। গ্রাম্য বধূরা জল আনছে পুকুর থেকে। সারি বেঁধে রাস্তার ধারে-ধারে যাচ্ছে। বিকাশের গাড়ির শব্দ শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে থমকে দাঁড়াল। বিকাশকে কৌতূহলী চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল।

অরুণার কথা ভাবছিল বিকাশ। ঐটুকু মেয়ে, হীরের মতো শক্ত। ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে তবু নুইবে না। অথচ মুখে যতই অস্বীকার করুক, তারই জন্য অপেক্ষা করে আছে। তাকে ভালোবাসে বলেই সোমনাথের মতো ছেলেকে ভালোবাসতে পারেনি। সোমনাথের আশ্রয়ে থেকে, তার অনুগ্রহজীবী হয়েও তার দুরন্ত কামনাকে প্রতিরোধ করেছে। অথচ এখন তাকে দূরে ঠেলে দিতে চাচ্ছে। কি চায় ও? এইখানে বসে থেকে ওর বৈধব্যপালনের সমারোহ দেখবে সে! নিজের জীবনের সকল সম্ভাবনাকে ছুঁড়ে ফেলে, সব কামনা-বাসনাকে চেপে মেরে, ওর পাশে-পাশে সেবকের মতো কাটিয়ে দেবে! নিজেকে কি মনে করে ও যে তার মতো একজন পুরুষ পোষমানা কুকুরের মতো ওর সেবা করবে, ওর পায়ে লুটিয়ে পড়বে, অথচ ও কোনো দিন তার হাতে ধরা দেবে না। অথচ কি আছে ওর? রূপ, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, শীলার ঢের বেশি আছে ওর চেয়ে। শিক্ষায়-দীক্ষায়, কর্মকুশলতায়, জীবনের প্রাচুর্যে শীলার কাছে ও দাঁড়াতে পারবে না। তবু এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে অরুণার মধ্যে এমন কিছু আছে যা বোঝা যায় না, দেখা যায় না, মাপা যায় না, অথচ যা তার মনকে অমোঘ আকর্ষণে টানতে থাকে, যার কাছে তার হৃদয় নেতিয়ে পড়ে।

নানা কথা ভাবছিল। হঠাৎ দূরে দেখল একটা মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজন সাহেবী পোশাক-পরা ভদ্রলোক হাত তুললেন। বিকাশকে থামতে হল। গাড়ি থেকে নামতেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'মণ্টু না?'

বিকাশও চিনতে পারল, বলল, 'ধীরেন! তুই এখানে?'

'আরে! আমি তো এখানকার একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তুই তো মস্ত বড় ডাক্তার হয়েছিস। দিল্লীতে চাকরির জন্য ইণ্টারভিউ দিতে গিয়েছিলি।'

'এত সব কথা জানলি কি করে?'

'উষারা রয়েছে যে এখানে। ওর স্বামী নির্মলবাবু তো এখানকার এস. ডি. ও.। আমার সঙ্গে অনেকদিনের পরিচয়। এক সঙ্গে দু-তিন জায়গায় কাজ করেছি।'

বিকাশ বলল, 'তোর গাড়ির কি হল?'

ধীরেন বলল, 'চাকাটা ফেটেছে। কোথায় যাবি?'

'কোথাও নয়। এমনি ঘুরতে বেরিয়েছি। তুই কোথায় যাবি?'

'ডাক-বাংলোয়।'

'আমার গাড়িতে পেঁাছে দিচ্ছি তোকে। তোর গাড়িটা আসুক পরে—'

একটা ছোট টিলার উপরে ডাক-বাংলো। ওরা পেঁাছুতেই বাংলোর চৌকিদার ছুটে এল। ওদের সসম্ভ্রমে নিয়ে গিয়ে বারান্দায় বসাল। আগের থেকে 'হাকিম আসছেন' খবর পেয়েছিল সে!

অবিলম্বে চা এল। চা খেতে-খেতে ধীরে-ধীরে ওর এখানে আসার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করল ধীরেন।

এখানকার জমিদার রায়বাহাদুর কৃষ্ণপ্রসন্ন বোস মস্ত বড় ধনী ব্যক্তি। দশ-বিশটা কলিয়ারীর মালিক। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রটি এত ভোগের মধ্যে থেকেও যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়। দেশে-বিদেশে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের চিকিৎসাধীনে থেকেও সুস্থ হয়নি। মারা গেছে বছরখানেক আগে। পুত্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটা যক্ষ্মা-হাসপাতাল স্থাপন করছেন রায়বাহাদুর। তাঁর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি, জমি-জায়গা সব কিনে নিয়েছেন। সেইখানে হাসপাতাল স্থাপিত হবে। বাড়ির পুরোনো মালিক মারা গেছে। তার তথাকথিত স্ত্রীটি বাড়ি থেকে নড়তে চাচ্ছে না। ধীরেনের প্রথম কাজ সেই মহিলাটিকে বাড়ি থেকে সরানো। আগামী

শ্রীপঞ্চমীতে হাসপাতাল-গৃহের ভিত্তি স্থাপন হবে। ভিত্তি স্থাপন করবেন পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্য-মন্ত্রী। ধীরেনের দ্বিতীয় কাজ ভিত্তি স্থাপন উৎসব সংক্রান্ত সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে রাখা। স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাকে এ-দুটি কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়েছেন।

বিকাশ বলল, 'তথাকথিত স্ত্রী মানে?'

ধীরেন বলল, 'মানে বিবাহিতা স্ত্রী নয়। একজন রেফিউজি গার্ল পুরোনো মনিবের ঘাড়ে চেপেছিল।'

বিকাশ বলল, 'কে বলল?'

ধীরেন বলল, 'যে সব চেয়ে বেশি বলছে, এখুনি আসবে এখানে। তার কাছে নিজের কানেই সব শুনতে পাবি। ভদ্রলোক এখানকার ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। নাম, কমলবাবু। পুরোনো মালিকের নিকট ও রায়বাহাদুরের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। রায়বাহাদুরের এখানকার জমিদারীর ম্যানেজারও।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তা, তুই হঠাৎ এই অরণ্যবাস শুরু করেছিস কেন? সীতা-টিতার খোঁজে নাকি?'

বিকাশ ম্লান হেসে বলল, 'কতকটা তাই! হারিয়ে-যাওয়া সীতার খোঁজ পেয়েছি। উদ্ধার করতে পারব কিনা জানি না।'

সকৌতুকে ধীরেন বলল, 'ব্যাপার কি বল দেখি?'

বিকাশ বলল, 'রবিকে চিনতিস?'

'আরে! ওকে চিনব না। এক সঙ্গে কলেজ-টীমে পাশাপাশি ব্যাক খেলেছি কতদিন।'

'ওর বোন অরুণাকে দেখেছিলি?'

'কলেজে পড়ত তো? দেখেছি খুব সম্ভব—'

'সোমনাথকে চিনতিস? আমাদের কেমিস্ট্রির প্রফেসার যদুনাথবাবুর ছেলে—'

'ওকে চিনব না! ঢাকা ইউনিভারসিটির নাম-করা ছেলে! কোনো পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়নি।'

'যে মহিলাটিকে তাড়াবার জন্য এসেছিস সে সোমনাথের স্ত্রী, রবির বোন!'

গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে ধীরেন বলল, 'বলিস কি! বাড়ির মালিক

আমাদের সোমনাথ? মেয়েটি সোমনাথের বিবাহিতা স্ত্রী। তবে যে এরা বলে—'

'মিথ্যা কথা বলে।'

'ভদ্রমহিলার যাবার কোনো জায়গা নেই?'

'আছে। আমি নিয়ে যেতে এসেছি। একই গাঁয়ে পাশাপাশি বাড়ি আমাদের। ঢাকাতেও এক পাড়ায় কাছাকাছি থাকতাম। ছোটবেলা থেকে জানি ওকে।'

সব পরিচয় দিয়ে বিকাশ বলল, 'ওকে ভালোবাসতাম একদিন। অবস্থা বিপর্যয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম। আবার দুজনে দেখা হয়েছে। এখনো আমার ভালোবাসা মরেনি। ও যদি চায় তো আমার জীবনে ওকে প্রতিষ্ঠিত করতে দ্বিধা করব না। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন যে যাই বলুক, কারও কথা শুনব না, কারও মুখের দিকে তাকাব না। কিন্তু ও রাজী হচ্ছে না।'

ধীরেন বলল, 'সোমনাথ নাকি আত্মহত্যা করেছিল?'

বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ, ওর তো টি-বি হয়েছিল। একটু সেরেও ছিল। শেষটা মাথার গোলমাল হয়েছিল সম্ভবত।'

ধীরেন বলল, 'ও রকম একটা ছেলে! কত বড় হবে আশা করতাম আমরা। কিন্তু কি শোচনীয় পরিণাম!'

এক ভদ্রলোক সাইকেল চালিয়ে এল। সাইকেলটা বারান্দার ধারে ঠেকিয়ে রেখে, বারান্দায় উঠেই সসম্ভ্রমে নমস্কার করল। ধীরেন বলল, 'আসুন কমলবাবু, বসুন।' কমলবাবু একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে একটু দূরে বসল।

কমলবাবুর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দোহারা গঠন। শ্যামবর্ণ। মুখে দাড়ি গোঁফ দুই পরিষ্কার করে চাঁছা। মাথার সামনে টাক। পরনে ধুতি মালকোঁচা করে পরা। পায়ে মোজা ও বুটজুতো। গায়ে গলাবন্ধ গরম কোট। পেটের নেয়াপতি ভুঁড়িটা কোট ঠেলে উঁচু হয়ে রয়েছে।

ধীরেন বিকাশকে বলল, 'ইনিই কমলবাবু!' কমলবাবুকে বলল, 'ইনি বিকাশ রায়।'

দুজন দুজনকে নমস্কার করল।

কমলবাবু বিকাশকে বলল, 'ওঃ! আপনিই মেয়েটিকে নিয়ে

যেতে এসেছেন বুঝি? কি সম্পর্ক আপনার সঙ্গে? যাচ্ছেন কবে?'

বিকাশ মুখ টিপে হেসে বলল, 'এক সঙ্গে অনেক প্রশ্ন করলেন যে! মেয়েটি আমার বন্ধুর বোন। নিতেই এসেছি। ও যেতে চাচ্ছে না।'

কমলবাবু ধারাল গলায় বলল, 'যাবে না তো? আপনার আত্মীয়া হয়তো, কিন্তু বাধ্য হয়ে বলতেই হচ্ছে কিছু মনে করবেন না আশা করি—'

বিকাশ বলল, 'বলুন।'

'অত্যন্ত ধড়িবাজ মেয়ে! সোমনাথকে ভালোমানুষ পেয়ে ওর ঘাড়ে চড়েছিল। ঘাড় মটকে ওকে সাবাড় করে বাড়িটা জুড়ে বসেছে।'

ধীরেন বলল, 'আপনি তো সোমনাথের নাম কোনোদিন করেননি।'

কমলবাবু বলল, 'আপনি চিনবেন না যখন—তখন নাম করে কি হবে!'

ধীরেন বলল, 'জানেন, সোমনাথ আমার সহপাঠী ছিল?'

কমলবাবু বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, 'তাই নাকি! সোমনাথ আমার নিজের মামাতো ভাই। ওর বাবা আমার সাক্ষাৎ মাতুল ছিলেন।' কমলবাবু বলতে লাগলেন, 'ওঁরাই তো গ্রামের জমিদার ছিলেন। আমার মাতামহ ইন্দ্রনাথ মিত্র অত্যন্ত জবরদস্ত জমিদার ছিলেন। মামলা-মোকদ্দমা করাই ছিল তাঁর নেশা। জমিদারী সাবাড় করে দিয়ে যান ঐ নেশার মোহে। আমার মামা যদুনাথ মিত্র মস্ত বড় বিদ্বান ছিলেন। কিন্তু মাথায় ছিট ছিল। ব্যবসায় পেয়ে বসল তাঁকে। সম্পত্তি যা ছিল অধিকাংশ, পুরোনো বসতবাড়ি বিক্রি করে সেই টাকাতে ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসার শখ ছিল, কিন্তু বুদ্ধি ছিল না। সব ব্যবসা ফেল পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর হার্টও ফেল করল। আমার মামাতো ভাই সোমনাথ—সেও খুব বিদ্বান হয়েছিল। ঢাকায় প্রফেসারী করত। মুসলমানদের অত্যাচারে পালিয়ে এল। সঙ্গে জুটলো এই মেয়েটি আর তার বাবা। বাবাটি কলকাতায় এসে মরল, মেয়েটি সোমনাথের ঘাড়ে চড়ল। সোমনাথের অসুখ হল। তাতেও মেয়েটি নামল না। ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা সব বিক্রি করে চিকিৎসা হল। একটু সেরে এখানে ফিরল। আমিই জমিদারবাবুকে অনুরোধ করে ওদের ও-বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করলাম।'

ধীরেন বলল, 'মেয়েটির সঙ্গে তো সোমনাথের বিয়ে হয়েছিল?'

কমলবাবু মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আরে না বিয়ে হয়নি, আমরা খবর নিয়েছি। বিয়ে হলে সোমনাথের দিদি, আমারও দিদি, এখানে এসে ওখানে না উঠে আমার বাড়িতে উঠতেন না। ওখানে এক ফোঁটা জল-গ্রহণ পর্যন্ত করেননি।'

ধীরেন বলল, 'সোমনাথ আত্মহত্যা করল কেন?'

কমলবাবু বলল, 'ঐ মেয়েটার অত্যাচারে। একদম বনত না দুজনে। দিনরাত ঝগড়া। তা ছাড়া মেয়েটার নাকি আরও অনেক ভালোবাসার লোক ছিল কলকাতায়। সোমনাথকে পাত্তা দিত না মোটেই। ফলে সোম-নাথের চরিত্র-দোষ ঘটল। ও গাঁয়ে একটা বাউরীর মেয়ে বেশ্যাগিরি করে শহরে। এখানে এসেছিল দিন কয়েকের জন্য। তার পাল্লায় পড়ল সোমনাথ। শেষে খারাপ রোগে ধরল।'

'কি করে জানলেন আপনি?'

'আমাদের গ্রামের ডাক্তারকে নাকি দেখিয়েছিল সোমনাথ। ডাক্তারই আমাকে বলেছে। ডাক্তারের কাছে রোগের কথা জেনে সেই রাত্রেই আত্মহত্যা করে।'

ধীরেন বলল, 'কিন্তু বিকাশবাবু বলছেন মেয়েটি সোমনাথের বিবাহিতা স্ত্রী। ইনি কে জানেন?' বিকাশের সম্যক পরিচয় দিয়ে বলল, 'তা ছাড়া আপনার এস. ডি. ও. সাহেব এ'র নিজের ভগ্নীপতি।'

মন্ত্র-প্রভাবিত সাপের মতো নেতিয়ে পড়ল কমলবাবু। সবিনয়ে বলল, 'আপনি সাহেবের শ্যালক। আপনি যখন বলছেন তখন তাই সত্যি!'

বিকাশ বলল, 'স্বামীর জন্মভূমি, মৃত্যুভূমি ছেড়ে মেয়েটি যেতে চাচ্ছে না। এখানেই থাকতে চায়। বেশ তো, ওর একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিন। তাহলেই ও বাড়ি ছেড়ে দেবে।'

ধীরেন বলল, 'আপনাদের গ্রামে তো মেয়েদের জন্য হাইস্কুল হচ্ছে?'

কমলবাবু বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ! জমিদারবাবু স্থাপন করছেন। বাড়ি-ঘর হয়ে গেছে। মাস্টারনীও জুটেছে জনকয়েক। হেড-মাস্টারনীর জন্য বিজ্ঞাপন দিতে বলেছেন জমিদারবাবু। হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপনের পরেই স্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন হবে।'

ধীরেন বলল, 'মন্ত্রীমশাই করবেন নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে জানিয়েছেন?'

'জমিদারবাবু জানাবেন লিখেছেন।'

ধীরেন বিকাশকে জিগগেস করল, 'অরুণা কতদূর পড়েছে?'

বিকাশ বলল, 'বি. এ. পাশ করেছে।'

ধীরেন কমলবাবুকে বলল, 'বেশ তো, সোমনাথের স্ত্রীকেই হেড-মিসস্ট্রেস নিযুক্ত করে দিন। হেড-মিসস্ট্রেসের থাকবার বাড়ি আছে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেও প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। মাসখানেকের মধ্যে শেষ হবে।'

চৌকিদারকে ডেকে ধীরেন তিন কাপ চা আনতে আদেশ দিল। সিগারেটের টিন থেকে একটা সিগারেট বার করে কমলবাবুকে দিয়ে বলল, 'তাহলে আপনি মেয়েটিকে হেড-মিসস্ট্রেসের নিয়োগ-পত্র দিয়ে দিন। মাসখানেক উনি ঐ বাড়িতে থাকুন। তারপর ওঁর বাড়ি তৈরি হলে সেখানে গিয়ে উঠবেন।'

কমলবাবু বলল, 'আমাকে যা বলবেন করতে রাজী। আপনারা একবার জমিদারবাবুকে বলবেন। তাহলে আর কোনো গোলমাল হবে না।'

অবিলম্বে চা এল। চা খেতে-খেতে নানা গল্প হতে লাগল।

ধীরেন বলল, 'আপনারা এত বড় হাসপাতাল করছেন। বড়-বড় ডাক্তার নিযুক্ত করতে হবে তো?'

কমলবাবু বললেন, 'নিশ্চয়! জমিদারবাবু সব ব্যবস্থা করবেন।'

ধীরেন বলল, 'এই যে বিকাশবাবুকে দেখছেন, ইনি সাত বছর বিলেতে ছিলেন। মস্ত বড় ডাক্তার হয়ে এসেছেন।' বিকাশকে বলল, 'তুমি যক্ষ্মা-রোগের বিশেষজ্ঞ হয়ে এসেছ, না?'

বিকাশ ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' জানাল। ধীরেন বলল, 'এঁকেই ধরে রাখুন না। যদিও উনি দিল্লীতে একটা বড় চাকরি পাবেন শিগগির।'

কমলবাবু বলল, 'দিল্লীর চাকরি ছেড়ে কি এই অজ পাড়াগাঁয়ে চাকরি করবেন?'

'সোমনাথের স্ত্রী এ'র বোনের মতো—ওঁর টানে থেকে যেতে পারেন।'

কমলবাবু বলল, 'জমিদারবাবুকে আমি লিখে জানাব সব। উনি এলে আপনারা বলবেন।'

ধীরেন বলল, 'তাহলে মেয়েটিকে স্কুলের চাকরি দেবেন, আপনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তো?'

কমলবাবু বলল, 'আমার প্রতিশ্রুতির মূল্য কি? আমি জমিদার-বাবুর চাকর তো।'

ধীরেন বলল, 'দেখুন ও সব বিনয় আমার কাছে দেখাবেন না। আপনি কে, কি—সব জানি। একটা কথা বলে রাখছি, যদি চাকরি না হয় তাহলে বুঝব আপনি বাগড়া লাগিয়েছেন। আর একটা কথা, মেয়েটিকে ওখান থেকে যাবার জন্য আর তাগিদ দেবেন না। ও-বাড়িটা পরে মেরামত করলেই চলবে।'

কমলবাবু বলল, 'তাই হবে।'

ফিরতি রাস্তায় কমলবাবুকে বাড়ি পেঁছে দিল বিকাশ। কমল-বাবুর অনুরোধে ওর বাড়িতেও নামতে হল। কমলবাবুর স্ত্রী বহুদিন থেকে নানা রোগে ভুগছেন। তাঁকে একবার দেখবার জন্য কমলবাবু সবিনয়ে অনুরোধ করল। বিকাশ বলল, 'স্টেথোটা আনিনি, কাল দেখে যাব সকালে।' বলে বিদায় নিল।

বাড়ি ফিরতে রাত দশটা বেজে গেল। গ্রাম নিঃস্তব্ধ। গ্রামের কুকুরগুলো মাঝে-মাঝে ডেকে উঠছে, কখনো একক, কখনো সমবেত কণ্ঠে। দূরে পাহাড়ে হায়েনার হাসি রাত্রির স্তব্ধতাকে চৌচির করে দিচ্ছে। আকাশ নির্মল; তারকাকীর্ণ।

গাড়িটা দরজায় এসে থামল। হর্ন দিল বার কয়েক। কানাই ছুটে এসে দরজা খুলল।

বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই ক্ষুদুর মা'র সঙ্গে দেখা হল। বিকাশ জিগগেস করল, 'রুনু খেয়েছে?'

ক্ষুদুর মা গম্ভীর মুখে বলল, 'না খায়নি। ওষুধ, হরলিক্‌স কিছু খায়নি। আপনাদের দুজনের খাবার বারান্দায় রেখে এসেছি।'

উপরে এল। ঘরের এ-পাশে আর একটা খাট পাতা হয়েছে। কানাই কোথাও থেকে যোগাড় করে এনেছে নিশ্চয়। সেই খাটে নিজের বিছানায় অরুণা শুয়ে আছে। ঘুমে অচৈতন্য এমনি ভাব। বিকাশ পোশাক ছেড়ে রাত্রিবাস পরল। অর্থাৎ পাজামা ও রঙিন খেলোয়াড়ী গেঞ্জি। তারপর স্টোভ ধরাল। দুধের কড়াটা স্টোভের উপর চাপিয়ে দিয়ে অরুণার পাশে গিয়ে ওকে ডাক দিল।

বার কয়েক ডাকতেই ঘুমটা বোধহয় ফিকে হয়ে উঠল অরুণার। আরও কয়েকটা ডাকে ঘুম একেবারে ছাড়ল। অরুণা চোখ মেলে নিদ্রা-জড়িত স্বরে বলল, 'কখন এলে?'

বিকাশ বলল, 'এইমাত্র। ওষুধ খাওনি কেন?

'এমনিই তো ভালো আছি। আবার ওষুধ খাওয়া কেন?'

'দরকার না থাকলে খেতে বলতাম না। খেতে হবে।' ওষুধ এনে বলল, 'খাও।'

ওষুধ খেতে হল অরুণাকে।

অরুণা বলল, 'স্টোভ জ্বাললে কেন?

বিকাশ বলল, 'দুধ গরম করতে।'

'দিদিকে বললেই পারতে।'

'আহা! বেচারী সারাদিন খাটে, ওকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে হয় না! তোমার তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়া উচিত ছিল।'

অরুণা বলল, 'দেখ, তুমি জোর করছ বলেই ওষুধ খেতে হল। ওগুলোও গিলতে হবে। কিন্তু কি দরকার? আমার মতো অভাগীর বেঁচে থাকা লোকের ভার বৃদ্ধি করা মাত্র। যত শীঘ্র মরে যাই ততই ভালো।'

বিকাশ বলল, 'যে কদিন আছি আমার কথা মতো তোমাকে চলতে হবে। আমি যাবার পর যা ইচ্ছে করবে, যা হবার হবে, আমি দেখতে আসব না।'

দুধটা গরম হলে পাঁউরুটির খণ্ডগুলো একটু গরম করে নিল। তারপর বলল, 'নিচে এসে খাবে, না ওখানেই খাবে?'

অরুণা বলল, 'আমি যাচ্ছি। তুমি খাবে না?'

বিকাশ বলল, 'তোমার খাওয়া হোক আগে।'

অরুণা বলল, 'তুমিও বস।'

বারান্দায় ধীরে-ধীরে গিয়ে বসল অরুণা। বিকাশ ওর সামনেই খেতে বসল। অনেকক্ষণ চুপচাপ করে থেকে অরুণা বলল, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ? আশ্রমে?'

বিকাশ গম্ভীর মুখে বলল, 'না, এমনিই ঘুরে এলাম কতকটা। জায়গাটা দেখে এলাম। চলে যাব তো দুদিন পরে।'

বিকাশের যাওয়ার কথা বলতেই বুকে ধাক্কা খেল অরুণা। বুকের ভিতরে একটি অসহায় কান্না, রুদ্ধ আবেগে আকণ্ঠ উথলে উঠতে লাগল।

মাথা নিচু করে অরুণা খাবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু খাদ্য গলা দিয়ে পার হতে চাইল না।

বিকাশ অন্যমনস্কভাবে মাথা গুঁজে খেয়ে চলেছিল। একবারও তাকাল না অরুণার দিকে।

বিকাশ, ধীরেন ও কমলবাবুর সঙ্গে ওর আলোচনার কথা ভাবছিল। ধীরেন ও নির্মল চেষ্টা করলে অরুণার নিশ্চয় চাকরি হবে। এবং ওরা পিছনে থাকলে অরুণার উপর কেউ উৎপীড়ন করতে সাহস করবে না। অরুণার ব্যবস্থা পাকা হলেই সে এখান থেকে চলে যাবে। ধীরেন ও

নির্মলকে বলে যাবে ওর খোঁজ-খবর রাখতে—অবশ্য ওরা যতদিন এ-জেলায় থাকবে। ওরা চলে গেলে অরুণার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। অরুণা যখন তাকে চায় না, তখন এখানে বসে থেকে নিজের জীবনকে বঞ্চিত করবে কেন? শীলা তাকে ভালোবাসে। ভালোবাসার পরিচয় তার হাবভাবে কথাবার্তায় পেয়েছে সে। অরুণা যদি সোমনাথকে ভালোবাসতে পেরে থাকে, সেও একদিন শীলার ভালোবাসার প্রতিদান দিতে পারবে। শীলার প্রচুর প্রাণশক্তির সংযোগে তারও জীবন প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। তার জীবন-নদীতে এই যে ভাঁটার টান এসেছে, শীলার প্রাণ-সিন্ধুর সঙ্গে যোগ হওয়ামাত্র জোয়ারের পরিপূর্ণতা আসতে দেরি হবে না।

অরুণা উঠে দাঁড়াল। টলতে-টলতে মুখ ধুতে গেল, বিকাশ লক্ষ্যও করল না। অরুণা নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। বিকাশের উদ্দেশ্যে মনে-মনে বলতে লাগল—কি বলেছি যে এত অভিমান! একবার তাকাচ্ছে না পর্যন্ত! যদি এত অবহেলা করবে তো বাঁচালে কেন? মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করল, পরদিন থেকে আর ওষুধ খাবে না, পায়ের ঘা-টা পাথর দিয়ে ছেঁচে রক্ত বার করে, বিষিয়ে দিয়ে আবার জ্বর করে ছাড়বে। ইঞ্জেকসান নেবে না, ওর চোখের সামনে মরবে। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল অরুণার। বিকাশের পায়ের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি মুছল।

বিকাশ ঘরে ঢুকে অরুণার দিকে তাকিয়ে দেখল, অরুণা তার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে আছে। লণ্ঠনের আলোটা একটু কমিয়ে দিয়ে নিজের বিছানায় সে শুয়ে পড়ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। অরুণার ঘুম এল না। গত রাত্রির মতো বিকাশের বুকের কাছে মাথা রেখে, ওর গায়ে হাত দিয়ে ঘুমোবার দুর্নিবার ইচ্ছা মনকে ক্রমাগত তাগিদ দিতে লাগল। কিন্তু জ্বরের ঘোরে যা সম্ভব হয়েছে, সুস্থ মস্তিষ্কে তা সম্ভব নয়। উচিতও নয়। বিকাশের সুস্থ সবল দেহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার মতো ক্ষমতা তার রুগ্ন, দুর্বল দেহের নেই, ওর মনকে ভরে দেবার মতো অমৃতও তার ভাণ্ডারে নেই। মিছিমিছি তার পঙ্গু নির্জীব জীবনটা ওর জীবনের সঙ্গে যোগ করে ওকে ভারাক্রান্ত করে লাভ কি? কারণ বিকাশ যখন তার দৈন্য, তার অক্ষমতা বুঝতে পারবে, তখন শূন্য পাত্রের মতো তাকে ফেলে দেবার জন্য ব্যস্ত

হয়ে উঠবে। তার চেয়ে ভাগ্যবিধাতা তার জন্য যা ব্যবস্থা করেছেন, তাই মেনে নিয়ে ধীরে-ধীরে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়াই ভালো। জীবনের কারবারে দেউলে হয়ে আর নতুন করে ব্যবসা করার পাগলামী যেন তার না হয়। জীবনের চেয়ে মৃত্যুই তার বেশি আপনার। তারই আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হওয়াই ভালো।

অরুণা উঠল। আলোটা তুলে ধরে বিকাশের ঘুমন্ত মুখখানির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। ধীরে-ধীরে তার মুখ, তার পিপাসু অধরোষ্ঠ, বিকাশের মুখের কাছে, ওষ্ঠের কাছে এনে আবার সরিয়ে নিল। মনে হল, সেই রাজার মতো অবস্থা হয়েছে তার। পিপাসিত ওষ্ঠের নিচে রাশি-রাশি জল, অথচ এক বিন্দু পান করবার উপায় নেই। ধীরে-ধীরে ফিরে এল, বিছানায় শুয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে কান্না জমে উঠতে লাগল। হঠাৎ উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে অরুণা কাঁদতে লাগল।

অনেক বেলায় বিকাশের ঘুম ভাঙল। ও-পাশের খাটের দিকে তাকিয়ে দেখল, অরুণা উঠে গেছে। বিছানাটাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ঘরের জিনিসগুলিও যথাসম্ভব গোছানো। জলের প্লাশ, চায়ের পেয়ালা, আরও যা-যা জিনিস রাত্রে ঘরের মেজেতে ছিল, সব নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অরুণা সকাল থেকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে গেছে।

বাইরে এসে দেখল, ও-পাশের ঘরে শেকল তোলা। দরজা খুলে দেখা গেল, খাটে অরুণার বিছানা পাতা। সোমনাথের ছবির সামনে ধুনো দেওয়া হয়েছে। ধুনোর ধোঁয়ায় সারা ঘর ভরে উঠেছে।

নিচে এল। অরুণা এর মধ্যেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বারান্দায় স্টোভ জেবলে খাবার করতে লেগেছে। বিকাশের পায়ের শব্দ কানে এল। নিজের মেঘাচ্ছন্ন মুখ জোর করে মেঘমুক্ত করল অরুণা। অরুণা স্থির করেছে বিকাশ যে কদিন থাকবে, সে অভিমান করবে না, ওর সব কথা নীরবে হাসিমুখে শুনবে, প্রাণ ভরে ওর সেবা করবে। সে যেন তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের আনন্দময় জীবনে ফিরে যেতে পারে। তার দুঃখের কথা চিন্তা করে ওর আনন্দের দীপ্তি যেন বিন্দুমাত্র মলিন না হয়।

বিকাশ আসতেই অরুণা হাসিমুখে বলল, 'খুব ঘুমোচ্ছিলে! পরশু সারা রাত্রি জাগিয়ে রেখেছিলাম।'

বিকাশ বলল, 'তুমি তাড়াতাড়ি উঠতে গেলে কেন? পরিশ্রম করে আবার জবর আসে যদি।'

অরুণা বলল, 'শুয়ে থাকলেই আসবে। মুখ ধুয়ে এস।'

একটু পরে ফিরে এসে অরুণার সামনে একটা আসনে বসে বিকাশ বলল, 'আজও একটা ইঞ্জেকশান নিতে হবে—ওষুধ খেতে হবে।'

অরুণা বলল, 'বেশ তো!' বলে খাবার দিয়ে চা করতে বসল।

বিকাশ বলল, 'দেখি হাতটা একবার।' অরুণা হাত বাড়াতেই সে নাড়ি পরীক্ষা করে বলল, 'জবর নেই।'

বিকাশ গম্ভীর-মুখে মাথা নিচু করে নীরবে খেতে লাগল। অরুণা

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল। মুখে এক ফোঁটা ম্লান, করুণ হাসি। বিকাশ হঠাৎ মুখ তুলতেই চোখাচোখি হল। বিকাশ বলল, 'ক্ষুদুর মা কই?'

অরুণা বলল, 'স্নান করতে গেছে।'

বিকাশ বলল, 'আজ ভাত খেয়ো। মাছের ঝোল ভাত।'

অরুণা বলল, 'বিধবা হয়ে মাছ খাব কি করে? ক্ষুদুর মা'র কাছে ও-রকম কথা বলে বস না।'

'কেন?'

'পেট আলগা মানুষ, কার কাছে কি গল্প করে ফেলবে। এই যে তোমার ঘরে শুয়েছি, তাই কারও কাছে গল্প করে না বসে।'

'ওর ও স্বভাব আছে বলে জানতাম না তো!'

'ওই তো আমার ননদের কাছে এখানের সব কথা বলে দিয়েছিল।'

বিকাশ বলল, 'আমি তো এক সাংঘাতিক কথা বলেছি ওকে।'

অরুণা সভয়ে বলল, 'কি বলেছ আবার?'

'তোমাকে বিয়ে করব বলেছি।'

অরুণা বলল, 'বেশ করেছ! আমার এ-আশ্রয়টুকুও তুমি ঘুচিয়ে ছাড়বে!'

বিকাশ বলল, 'তাতে কি হবে? আমি বারণ করে দেব। তাহলেও বলবে?'

অরুণা বলল, 'কি জানি!' হঠাৎ হেসে ফেলে বলল, 'চিরদিনই এই রকম! যা মনে আসবে বলে দেবে, তারপর তাল সামলাও!'

বিকাশ বলল, 'কখন আবার কি আমি বললাম, আর তুমি তাল সামলালে!'

অরুণা বলল, 'কতবার! একবারের কথাই বলি। তোমার কাছে একদিন পাশের বাড়ির মেয়ে বিজলীর কাকার চেহারার প্রশংসা করেছিলাম। তুমি দাদাকে বলে দিলে, আমি বিজলীর কাকাকে ভালোবেসে ফেলেছি। দাদা ক্ষেপাতে লাগল। বিজলী "কাকীমা" বলে ডাকতে লাগল। তাই শুনে ক্লাশ সুদ্ধ মেয়ে "কাকী" বলে ডাকতে লাগল। আর মা শুনে ধমকাতে লাগলেন।'

বিকাশ বলল, 'তোমার মা আমাকে খুব ভালোবাসতেন।'

অরুণা বলল, 'সেবার কি বলেছিলেন জানো? মুখপুড়ি! যদি কোনোদিন কিছু শুনি, মুখে ঝাঁটা মারব। মহাদেবের মতো ছেলে চোখের সামনে, বাঁদরী নন্দী-ভৃঙ্গীর গুণ গেয়ে বেড়াচ্ছে!'

বিকাশ বলল, 'ওঁর বড় সাধ ছিল, আমাদের বিয়ে দেখে যেতে।'

ক্ষুদুর মা এল স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে। ঘরে চলে গেল কাপড় ছাড়তে। ফিরে এল একটু পরে।

বিকাশ বলল, 'ভালো পুরোনো চাল পাওয়া যাবে?'

'গাঁয়ে গেলেই পাওয়া যাবে।'

'কাঁচকলা?'

'তাও পাওয়া যাবে।'

'কানাইকে একবার পাঠিয়ে দাও, আমি টাকা দিচ্ছি।'

ক্ষুদুর মা বলল, 'দাদাবাবু অনেক খরচ করলেন।'

অরুণা বলল, 'বড়লোক দাদা গরীব বোনের বাড়িতে এসে খরচ করবেন না?'

বিকাশ উঠে উপরে গেল। ফিরল একটু পরে। দুটো দশটাকার নোট ক্ষুদুর মা'র হাতে দিয়ে বলল, 'আধ-মণ, ত্রিশ সের—যতটা চাল পাওয়া যায়, আনবে। আর যা-যা দরকার আনিয়ে নেবে।'

ক্ষুদুর মা চলে গেল। বিকাশ বসে পড়ে বলল, 'তোমাকে কাল বলা হয়নি।' অরুণা জিজ্ঞাসু মুখে তাকিয়ে রইল।

বিকাশ বলতে লাগল, 'কাল হঠাৎ আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। রবিরও বন্ধু। তোমাকে দেখেছে বলল—'

অরুণা সাগ্রহে বলল, 'কে বল দেখি?'

'ধীরেন। এখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন হবে তো! তারই ব্যবস্থার ভার ওর উপরে পড়েছে। তাই এখানে এসেছে। রাস্তায় গাড়ির চাকা ফেটে গিয়েছিল। দাঁড়িয়েছিল রাস্তায়। আমার গাড়িতেই এল। এক সঙ্গে বসে অনেক কথাবার্তা হল। কমলবাবুও ছিল। তোমাকে এ-বাড়ি থেকে সরিয়ে দেবার জন্য ওরা খুব ব্যস্ত!'

'আমার ভাসুর তো অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করছেন—তোমার বন্ধুর এত আগ্রহ কেন?'

'তোমার পরিচয় ও জানত না—'

'জেনে কিছু সুবিধা হল?'

'ওরা কি করবে? ম্যাজিস্ট্রেট-এর হুকুম তামিল করছে মাত্র। এ বাড়িটায় নার্সদের থাকবার ব্যবস্থা হবে। কাজেই মেরামত করে দিতে হবে তো।'

অরুণা বলল, 'আমি কোথায় যাব জিগগেস করলে না কেন?'

বিকাশ বলল, 'করেছিলাম। একটা ব্যবস্থা করে দেবে। হেড-মিসস্ট্রেসের চাকরি দেবে তোমাকে, কমলবাবু কথা দিয়েছে।'

'আমাকে চাকরি দেবেন উনি? আমি বেশ্যা। ভুলিয়ে ওঁর ভাইয়ের কাঁধে চড়েছি।'

'ধীরেনের কাছে কমলবাবু সব জানতে পেরেছে। আমি যে মহামান্য এস. ডি. ও. সাহেবের শ্যালক তাও জানতে পেরেছে। তাছাড়া ওর স্ত্রীর চিকিৎসা করাবে আমাকে দিয়ে। কাজেই কমলবাবু বাধা দেবে না। হেড-মিসস্ট্রেসের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। মাসখানেকের মধ্যে হয়ে গেলে তুমি সেখানে গিয়ে থাকতে পারবে। কোনো অসুবিধা হবে না।'

অরুণা চুপ করে রইল। আশ্রয়ের এমন চমৎকার ব্যবস্থার কথা শুনেও তার মুখে আনন্দের আভাস পর্যন্ত ফুটল না।

বিকাশ বলল, 'ইঞ্জেকশানটা এখনই দিয়ে দেব। তুমি একবার উপরে এস।'

উপরে এসে বিকাশ ইঞ্জেকশান দেওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল। অরুণা আসতেই ওকে ইজি-চেয়ারটায় বসতে বলল।

ইঞ্জেকশান দিয়ে, পিচকারী পরিষ্কার করতে-করতে বিকাশ বলল, 'তোমার যাতে কষ্ট না হয়, তার জন্য ধীরেন নিজে রায়বাহাদুরকে বলবে, নির্মলও বলবে। তিনি ভালো লোক শুনেছি।'

অরুণা বলল, 'তুমি এখান থেকে চলে গেলে ধীরেনবাবু, নির্মলবাবু আমার জন্য কি কিছু করবেন?'

বিকাশ বলল, 'আমি তোমাকে চাকরিতে বসিয়ে দিয়ে যাব। আমি যাবার পর ওরা তোমার খোঁজ রাখবে। তাছাড়া স্বামীজী আছেন। উনি তো তোমাকে খুবই স্নেহ করেন। ওঁর দৃষ্টি সর্বদা তোমার উপরে থাকবে।'

বিকাশ ওর বাইরে বেরোবার পোশাক নিয়ে বার হয়ে গেল। একটু পরে পোশাক বদলে ফিরে এল। অরুণা বলল, 'এখন কোথায় যাবে?'

'ধীরেন আসবে বলেছিল। ওর সঙ্গে একটু ঘুরে আসব—'

মোটরের শব্দ শোনা গেল। বিকাশ বলে উঠল, 'এসে গেছে!' অবিলম্বে হর্নের শব্দ শোনা গেল। বিকাশ বলল, 'আমি তাহলে একটু ঘুরে আসি,' বলে বেরিয়ে গেল।

অরুণা নির্জীবের মতো ইজি-চেয়ারে বসে জানলার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল।

বিকাশ বেলা একটায় বাড়ি ফিরল। ক্ষুদুর মাকে জিগগেস করল, 'রুনু খেয়েছে?'

ক্ষুঁদুর মা বলল, 'খেতে চাইছিল না। জোর করে খাওয়ালাম।'

'খেতে পারল?'

'কিছু না, দুটি মুখে দিল। ওই তো করছে! বাঁচবে না দেখবেন।'

বিকাশ উপরে গিয়ে দেখল, অরুণা তার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বুকের উপরে একটা খোলা বই উপুড় হয়ে রয়েছে।

বিকাশ সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পোশাক ছাড়ল। তারপর স্নানাহারের জন্য নিচে চলে গেল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ফিরে এসে দেখল, অরুণা ইজি-চেয়ারে বসে বই পড়ছে। তাকে দেখে বলল, 'খেয়েছ?'

বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ।'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ওঠানো উচিত ছিল। এত দেরি হল কেন?'

বিকাশ বলল, 'কত জায়গায় গিয়েছিলাম। বড়-বড় লোক সব আসবেন। তাঁদের আদর-অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা। ধীরেনকে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে খুব। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল। কমলবাবুর স্ত্রীকে দেখলাম। ব্যবস্থা করে দিলাম। খুব খুশি। চা খাওয়াল। রাত্রে নেমন্তন্ন বাগিয়ে এলাম।'

অরুণা বলল, 'তুমি এখানে বস, আমি ও-ঘরে যাচ্ছি,' বলে উঠে দাঁড়াল।

বিকাশ বলল, 'বস, বস। যে কদিন আছি কাছে-কাছে থাক। তারপর কে কোথায়—' বলে ম্লান হাসল।

বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল অরুণার। বলে উঠল, 'সত্যি!' পাশেই বিছানার উপর বসল।

বিকাশ গম্ভীর-মুখে বলল, 'তোমার সব ব্যবস্থা পাকা করে এলাম। রায়বাহাদুর এসেই তোমায় চাকরির নিয়োগ-পত্র দিয়ে দেবেন। কমলবাবু নিজে অনুরোধ করে চিঠি দেবে তাঁকে। স্বামীজীর সামনে কমলবাবু কথা দিয়েছে।' একটু থেমে বলল, 'কমলবাবু এখন খুবই নরম হয়ে উঠেছে। সে বলল—আমার বাড়িতেই তো থাকতে পারেন। ছোট ভায়ের স্ত্রী। বাড়ির বৌ। কিন্তু রাজী হবেন না যে! তবে যেখানেই থাকুন, সব সময়ে নজর থাকবে আমার। কোনো চিন্তা করবেন না ওঁর জন্য।'

অরুণা ম্লান হেসে বলল, 'সত্যি নিশ্চিন্তে বসে থাকবে নাকি? আর কোনোদিনও খবর নেবে না?'

বিকাশ বলল, 'যদি থাকি তো খবর নেব।'

'কোথায় থাকবে?'

'স্থির করতে পারিনি। কাল থেকে তো সারাক্ষণই ভাবছি।'

অরুণা মুচকি হেসে বলল, 'ভাবনা তো কিছুই দেখলাম না! কাল রাত্রে বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ফিরলে, খেলে, ঘুমোলে। সারা রাত্রি ঘুম হল না, উঠলাম, বসলাম, বাইরে গেলাম, তোমার কোনো হুঁশ আছে বলে মনে হল না।'

বিকাশ বলল, 'ঘুম হয়নি তো জাগিয়ে দিলেই পারতে। ঘুমের ওষুধ আছে দিতাম।'

সরোষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অরুণা বলল, 'ঘুমের ওষুধ দিতাম!' বলে সক্ষোভে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

বিকাশ বলল, 'আমার উপরে রাগ করে লাভ কি? যে কদিন আছি একটু ভালো-টালো বাস, অন্তত হাবে-ভাবে মুখের কথাতে ভালোবাসা দেখাও। এইটুকু মনে করে রাখব,' বলে হাসল।

একটা বই নিয়ে এসে মনোযোগ সহকারে পড়তে শুরু করল বিকাশ। অরুণা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল, 'যতগুলো বই কিনে নিয়ে এসেছ, সবই কি একদিনে পড়ে ফেলবার চেষ্টা করছ নাকি?'

বিকাশ হেসে বলল, 'এ বই তো সব তোমার জন্য। এই বন-জঙ্গলে পড়ে থাকবে। এগুলো কতকটা সঙ্গ দেবে।'

একটু চুপ করে থেকে অরুণা বলল, 'তুমি যে বিলেত চলে যাবে বলছ চিরদিনের জন্য, তোমার বোনরা কেউ কিছু বলবে না?'

বিকাশ বলল, 'কি আর বলবে? নিজের-নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত তারা, ভাইয়ের জন্য ভাববার অবসর কোথায়?'

অরুণা বলল, 'আচ্ছা মণ্টুদা! তুমি এমন কাউকে চেনো না যার সংসার বলতে কিছু নেই—যার প্রচুর অবসর, যে সর্বদা তোমার কথা ভাববে?'

বিকাশ বলল, 'তোমার কথা বলছ?'

অরুণা বলল, 'আমি কি কেউ নই তোমার?'

'একদিন খুবই আপনার ছিলে। মায়ের পরই তোমাকে জানতাম। কিন্তু এখন তো অন্য লোকের হয়ে গেছ।'

অরুণা বলল, 'আমার এমনি অদৃষ্ট! তিনি বলতেন, আমি তোমার। তুমি বলছ, আমি তাঁর। আমি কারও আপনার হতে পারলাম না।'

বিকাশ বলল, 'নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে দেবার মতো ভালোবাসার তীব্রতা তোমার নেই। তাই কারও আপন হতে পারলে না। নিজের বৃন্তটুকু সর্বস্ব ভেবে সেখানেই ফুটে রইলে। কাউকে তৃপ্তি দিতে পারলে না, নিজেও তৃপ্তি পেলে না।'

অরুণা বলল, 'কি বলতে চাও তুমি? শুধু মন দিয়ে আপন করা যায় না? তাহলে দেবতাকে আরাধনা করে কেন সব?'

বিকাশ ক্ষোভের হাসি হেসে বলল, 'মানুষ দেবতা নয় অরুণা! শুধু মন নিয়ে মন ভরে না তার। তার চাই দেহ, দেহের উপর একাধিপত্য অধিকার।'

অরুণার মুখে বেদনার রেখা ফুটে উঠল। ক্ষোভের স্বরে বলল, 'দেহ, দেহ, দেহ! দেহই হয়েছে জঞ্জাল! এ শেষ হয়ে গেলে বাঁচি আমি।'

বিকাশ চুপ করে রইল। একটু পরে উঠে দাঁড়াল। টেবিল থেকে সিগারেটের টিনটা নিয়ে এসে একটা সিগারেট বার করে ধরাল। অরুণা বলল, 'ওটা আবার কিনলে কখন?'

'কিনতে হয়নি। কমলবাবু গাড়িতে তুলে দিল।'

'সিগারেট খেতে না তো?'

'বিলেতে খেতাম। এখানে এসে ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

'ছাড়লে কেন?'

'মা পছন্দ করতেন না।' একটু থেমে বলল, 'তুমিও পছন্দ করতে না।'

'আবার শুরু করলে কেন?'

'এখন তো বড় ভাইয়ের ভূমিকায় ফিরে এসেছি। এখন যা ইচ্ছে করতে পারি।'

একটু চুপ করে, অরুণা হেসে বলল, 'এখান থেকে কোথায় যাবে?'

বিকাশ বলল, 'দিল্লী। একটি চাকরি পাবার কথা আছে। তা ছাড়া একজনকে একটা কথার জবাব দিতে হবে।'

একটা ছবি ফুটে উঠল বিকাশের মনে। রাত্রি দশটা। সুপরিসর কক্ষ। সুসজ্জিত। আলোকোজ্জ্বল। পালঙ্কের উপর দুধের মতো শাদা নেটের মশারি টাঙানো। একটা ইজি-চেয়ারে বসে পড়ছে সে। শীলা এল। লাবণ্যময়ী শীলা। অত্যুজ্জ্বল আলোকে ওকে দেবকন্যার মতো দেখাল। বিছানা ঠিক করে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। জিগগেস করল—বাবা কি বলছিলেন?

সে বলল—জানো না?

—জানি।

—আড়ি পেতেছিলে নাকি?

মুচকি হেসে বলল—না এমনিই জানতাম। কি বললেন বাবাকে?

—কিছু বলিনি এখনো। সময় নিয়েছি।

—এত ভাবছেন কেন? এতদিন আরাধনা করেও বর পাবার যোগ্য হইনি?

শীলার মুখখানি আত্মনিবেদনের ঐকান্তিকতায় রমণীয় হয়ে উঠল। কৃষ্ণায়ত চোখ দুটিতে আকুল প্রার্থনা নিবিড় হয়ে উঠল।

—কিছুদিন পরে জবাব দেব, সে বলল।

অরুণা প্রশ্ন করল, 'কাকে?'

বিকাশ জবাব না-দিয়ে স্বপ্নালু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আবার প্রশ্ন করল অরুণা।

বিকাশ বলল, 'একটি মেয়েকে।'

'দিল্লীতে থাকে বুঝি?'

'দিল্লীতে তার বাবা থাকেন। সে থাকে কলকাতায়। দিদির ননদের মেয়ে। দিদির বাড়িতে থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে এম. এস. সি. পড়ে। মা'র খুব সেবা করেছিল। আমারও খুব সেবা-যত্ন করে।'

'কেমন দেখতে?'

'খুব সুন্দরী।'

'বয়স?'

'কুড়ি-একুশ।'

অরুণা বলল, 'বিয়ে করবে—এই জবাব দেবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'বিয়ের পর ওকে নিয়ে বিলেত যাবে?'

'শীলা যদি রাজী হয় তবেই। না হলে যদি দিল্লীর চাকরিটা পাই তবে দিল্লীতেই থেকে যাব।'

'মেয়েটির নাম বুঝি শীলা?'

বিকাশ ঘাড় নেড়ে জবাব দিল।

অরুণা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বিয়ে হবার পর একবার বৌ নিয়ে আসবে না?'

বিকাশ বলল, 'কি জন্য আর আসব?'

অরুণা বলল, 'বৌ দেখব না?' একটু থেমে বলল, 'আচ্ছা মণ্টুদা, বিয়ে হলে একেবারে ভুলে যাবে?'

বিকাশ বলল, 'বৌ হলে কি আর বোনের কথা মনে থাকে? যে মেয়েটি তার সর্বস্ব নিয়ে জীবনের মধ্যে আসবে সে-ই সব মন জুড়ে বসে থাকবে।'

অরুণা বলল, 'বল কি! একেবারে তোমার মন থেকে মুছে যাব? পৃথিবীতে কেউ নিজের বলতে থাকবে না?'

বিকাশ বলল, 'কি করবে, যতটুকু দিয়েছ তার বেশি পাবার আশা করা বৃথা।'

অরুণা তিরস্কারের সুরে বলতে লাগল, 'ওঃ! এতটুকু দয়ামায়া নেই!

কাজে যাই কর মুখের সান্ত্বনাটুকু দিতে পারছ না? দেহটাকে ভোগ করতে পাবে না বলে এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছ যে এতদিনের এত স্নেহ, এত ভালোবাসা, এত মায়া-মমতা সব ভুলে গিয়ে চিরদিনের মতো আমাকে ত্যাগ করবে? তুমি এমন বলে কখনো ভাবিনি, মণ্টুদা! তোমাকে অনেক বড় বলে জানতাম।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে-মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অরুণা।

পাঁচটার সময় ধীরেনের গাড়ি এল। বিকাশ পোশাক পরে প্রস্তুত হয়েই ছিল। গরম পাঞ্জাবী, ধুতি, পায়ে পাম্প-সু, গায়ে দামী শাল। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। চা আর কুচো নিমকি। খেতে চায়নি প্রথমে। বলেছিল, 'রাত্তিরের নেমন্তন্ন। এখন আর কিছু খাব না—'

ক্ষুদুর মা বলল, 'খুকি তৈরি করল আপনার জন্য।'

সেই যে কাঁদতে-কাঁদতে বেরিয়ে গিয়েছিল অরুণা, তারপর আর আসেনি। মনে আঘাত পেয়েছে খুব। কিন্তু কি করা যাবে? পাছে অরুণা আবার দুঃখ পায়, এই জন্য তাকে খেতে হল।

বেরিয়ে দেখল, অরুণা চুপ করে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখখানি শুষ্ক, বিষণ্ণ। জিগগেস করল, 'কখন ফিরবে? বেশি রাত কোরো না।'

বিকাশ বলল, 'তাড়াতাড়ি ফিরবার চেষ্টা করব। তুমি সন্ধ্যের পরেই খেয়ে নিও।'

অরুণা সঙ্গে-সঙ্গে গেট পর্যন্ত এল। বিকাশ গাড়িতে চড়ল। ও চুপ করে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

গাড়ি চলে গেল। বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অরুণা। সেদিনের কথা মনে পড়ল। বিকাশদা কোলে করে তুলে এনেছিল, সেবা করেছিল। যে জীবনটা শুকিয়ে এসেছিল, এতেই একটু সরস হয়ে উঠেছে। বিকাশদা চলে গেলে আবার শুকিয়ে যাবে। প্রখর তাপে পিপাসায় হা-হা করবে। আকাশে এক টুকরো মেঘ আসারও সম্ভাবনা থাকবে না আর। তারপর একদিন আসবে মৃত্যু—সব তৃষ্ণা, সব কামনার অবসান হয়ে যাবে।

লাল সূর্য দিগন্ত-রেখার উপরে স্থির হয়ে দাঁড়াল। ধীরে-ধীরে নীলাভ বনরাজির ওপারে ডুবে গেল। পশ্চিমাকাশে গলিত সোনার রঙ ঝলমল করে উঠল। ধীরে-ধীরে অস্তরাগ ম্লান হয়ে এল; ক্রমে আঁধারের রাজত্ব এল ঘনিয়ে।

অরুণা বাড়ির মধ্যে ফিরে গেল। তুলসীতলায় প্রদীপ জেলে ক্ষুদুর

মা প্রণাম করছে। কল্যাণ কামনা করছে একমাত্র পুত্রের। তার মুখের দিকে চেয়েই ও বেঁচে আছে। পুত্রের জীবন সার্থক হলেই ওর জীবন সার্থক হবে।

অরুণাও গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করল। প্রার্থনা করল বার-বার, হে ঠাকুর! আমার যেন এমন রোগ হয় অনেকদিন ভুগি। অনেকদিন বিকাশদা আমার কাছে আটকে থাকে। তারপর ওর চোখের সামনে মরে যাই — হে ঠাকুর!

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। কানাইকে সজাগ থাকতে উপদেশ দিয়ে অরুণা উপরে গেল। বিকাশের ঘরে জানলার পাশে বসে রইল। হাতে একখানা বই। মাঝে-মাঝে চোখ বুলোতে লাগল। কিন্তু মন বার-বার বইয়ের পাতা থেকে সরে গিয়ে চিন্তার জাল বুনতে লাগল।

ভাবতে লাগল বিকাশের কথা। আজ সারাদিন কেমন ছাড়া-ছাড়া ভাব। ভালো করে হেসে, মন খুলে কথা বলেনি একটাও। সকালবেলার ইঞ্জেকশান দিল, ডাক্তার যেমন অনাত্মীয় একজন রোগীকে দেয় এমনি ভাব। যেন নীরস কর্তব্য, বিন্দুমাত্র মমতা নেই। অন্যদিন তার অলক্ষ্যে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সর্বাঙ্গে ওর দৃষ্টির স্পর্শ অনুভব করে, পরম আরামে তার সর্ব চৈতন্য যেন ঝিমিয়ে পড়ে। আজ একবারও তেমন করে তাকায়নি। প্রতি মুহূর্তে যেন জানিয়ে দিয়েছে — তোমার সঙ্গে আজ থেকে কর্তব্যের সম্পর্ক। বোনের মতো স্নেহ করতাম একদিন। অসহায় অবস্থায় বিদেশে পড়ে আছ জানতে পেরে এসেছি। যথাসম্ভব আশ্রয় ও জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে যাব। বিকেলে বেরোবার আগে, নেহাত কর্তব্য সারার মতো বলে গেল — সন্ধ্যের পরই খেয়ে নিও।

অভিমান হয়েছে ওর। বড় অভিমানী তো! ছোটবেলায় কথায়-কথায় অভিমান করত। কথা বন্ধ করত। সেধে-সেধে ভাব করতে হত তাকে। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল।

বড়দিদি ও জামাইবাবু বড়দিনের ছুটিতে ঢাকা গেলেন। দুটো বোট ভাড়া করে নদীর উপরে পিকনিকের ব্যবস্থা হল। অরুণা প্রতি বছর ওদের সঙ্গে যেত। কাজেই এবারও যাবে বিকাশ ধরেই নিয়েছিল। সে বছর সে কলেজে ভর্তি হয়েছে। কলেজের মেয়েরা মিলে পিকনিকের ব্যবস্থা করল সেদিনই। পিকনিকের আগের দিন মণ্টুদা তাকে পরদিন

সকালে তৈরি হয়ে থাকতে বলল। বলল—সে নিজে এসে ওকে নিয়ে যাবে। অরুণা বলল—তা কি করে হবে? বিকাশ দু-চোখ কপালে তুলে বলল—হবে না কেন? অরুণা বলল—আমরা কলেজের মেয়েরা মিলে অন্য জায়গায় পিকনিকে যাচ্ছি যে! বিকাশ স্বভাবসিদ্ধ জবরদস্তির সঙ্গে বলল—না, না, ওদের সঙ্গে যেতে হবে না। আমাদের সঙ্গে যাবে। উপায় ছিল না অরুণার। সে পাণ্ডাদের মধ্যে একজন। সে না গেলে অন্য মেয়েরা কি মনে করবে? কাজেই দৃঢ়তার সঙ্গে বলল—না ভাই, আমি যেতে পারব না। বিকাশ রেগে আগুন হয়ে বলল—আচ্ছা দেখা যাবে, যাও কি না যাও—বলে চলে গেল।

ভোর রাত্রে উঠে সে এক বন্ধুর বাড়ি চলে গেল। মণ্টুদা যথা সময়ে তাকে ডাকতে এল। তাকে না পেয়ে, বা তার কোনো সন্ধান না পেয়ে ফিরে গেল। তারপর একমাস কথা বন্ধ। কাছে গেলে মুখ ফিরিয়ে নিত। বাড়িতে এলে সটান দাদার ঘরে গিয়ে উঠত। চা নিয়ে কাছে গেলে গম্ভীর-মুখে পেয়ালাটা নিয়ে মুখ ফিরিয়ে খেত।

একদিন কলেজের ফেরত ওর সঙ্গ নিল অরুণা। বলল—মণ্টুদা, আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে? মণ্টুদা বলল—তোমার দাদা কোথায়? সে বলল—ওকে খুঁজে পেলাম না। গম্ভীর-মুখে পাশে যেতে লাগল। সে বলে ফেলল—মণ্টুদা, আমার অপরাধ হয়েছে, মাপ কর। মণ্টুদা গোঁজ হয়ে চলতে লাগল। সে বলল—বাড়ি গিয়ে বরং পায়ে ধরব। এবার মণ্টুদা বলল—খুব বাহাদুর! অপমান করে পায়ে ধরলেই ক্ষমা পাওয়া যায় নাকি? সে বলল—কি করতে হবে? নাকে খৎ দেব বরং, যতটা বলবে।

খ্যাঁদা নাক আরও খ্যাঁদা হয়ে যাবে—বলে হেসে ফেলল মণ্টুদা। অরুণা সাহস পেয়ে বলল—খ্যাঁদা নাক আমার? বললেই হয় না! তুমিই বল শুধু, আর তো কেউ বলে না—ভাব হয়ে গেল।

এমনি কতবার! এখনো তেমনিই আছে। জেদ, বিয়ে করব তোমাকে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিধবা-বধূ, লোকে কি বলবে? সে সব বোঝে না। তা ছাড়া তার নিজের বাড়ির সবাই রাজী হবে কেন? কিছু ভাবে না। বলে—সমাজ কি, বাড়ির কাউকেও চাইনে, দেশ ছেড়ে চলে যাব তোমাকে নিয়ে। সায় না দিলেই অভিমান, রাগ। তেমনি ছেলেমানুষ আছে

মণ্টুদা। অথচ ভাবতেও ভালো লাগে, মণ্টুদার সঙ্গে এক দেহ, এক মন, এক আত্মা হয়ে মিশে গেছে। ভাবতেই সারা দেহে, মনে, পুলকের হিল্লোল বয়ে যায়।

দূর বিদেশে মণ্টুদার সঙ্গে ওর সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী, ওর হৃদয়েশ্বরী, ওর সম্মানের ও সমৃদ্ধির অংশভাগিনী, ওর নামেই পরিচয় —মিসেস বি. সি. রায়, শ্রীমতী বিকাশ রায়, ওর সন্তানদের জননী, জীবনের পথে ওর সহচরী, সেবিকা, মন্ত্রণাদাত্রী—ভালো লাগে ভাবতে। বিয়ের আগে কতদিন কল্পনায় বিবাহিত জীবনের ছবি এঁকেছে মনে-মনে! বিবাহিত জীবনের দুঃখ-ব্যর্থতার মধ্যেও কোনো-কোনোদিন ভেবেছে, যদি হঠাৎ উপকথার রাজপুত্রের মতো মণ্টুদা পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এসে ছাদে নামে, তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে নদ-নদী, পাহাড়-প্রান্তর পার হয়ে অনেক-অনেক দূরে কোনো দেশে নিয়ে গিয়ে হাজির করে। তারপর সেই দেশে দুজনে মিলে সংসার পাতে। কোনো-কোনোদিন মনে হত, হঠাৎ এই দুঃস্বপ্ন কেটে গিয়ে যদি দেখি, মণ্টুদার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, ওর পাশে, ওর বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছি!

বাড়ির কাছে একটা পেঁচা ডেকে উঠল। কত রাত্রি হয়েছে কে জানে! কখন আসবে ফিরে? কলেজের বন্ধুর সঙ্গে গল্পে মেতে গেছে—অথবা কমলবাবুর বাড়িতে আড্ডা জমেছে। কমলবাবু সরকারী কর্মচারী-দের তোয়াজ করে খুব। অবশ্য রায়বাহাদুরের খরচে। জমিদারী রাখতে হলে হাকিমদের হাতে না-রাখলেই নয়।

বাইরে এল। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। নিজের ঘরে গেল। লণ্ঠনটা মৃদু জ্বলছে। লণ্ঠনের আলোটা উসকে দিল।

সোমনাথের ছবির সামনে দাঁড়াল। তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। অরুণা বলল—জীবনের সীমার ওপারে দাঁড়িয়ে এখনো প্রতীক্ষা করছ নাকি আমার জন্য? কিন্তু যেতে পারলাম না। এই কামনাভরা মন নিয়ে যাব কি করে? আমার কামনার দাহকে যে শীতল করবে, সেই আমার চির-বাঞ্ছিত মেঘ আবার আকাশে দেখা দিয়েছে। তার উন্মুখ বর্ষণকে গ্রহণ করবার জন্য আমার সর্ব দেহ-মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমি যেতে পারব না। ক্ষমা কর আমাকে।

আবার ফিরে এল এ-ঘরে। জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কি গাঢ়

অন্ধকার! সারা বাড়িটা থমথম করছে। যেন মৃত্যুপুরী! এখানে একা সে এতদিন কাটাল কি করে? হঠাৎ মনে হল, বিকাশদা ফিরে আসবে তো? যদি আর না আসে? তাহলে এই সীমাহীন নিঃসঙ্গতার মাঝে সে বাঁচবে কি করে? আবার ভাবল, মন্টুদার এত জিনিসপত্র রয়েছে, মোটরটা রয়েছে, আসবে নিশ্চয়। তাকে ফেলে দিয়ে যেতে পারে, এগুলো ফেলে দিয়ে যাবে না নিশ্চয়ই। এগুলোর মূল্য তার চেয়ে বেশি ওর কাছে। অথচ একটি মাত্র কথায় ও মন্টুদার জীবনে সব চেয়ে মূল্যবান হয়ে উঠবে। একটি মাত্র কথায়। শুধু বলা—প্রিয়তম! নিঃশেষে নিজেকে তুলে দিলাম তোমার হাতে। নাও আমাকে। যেন একটি মন্ত্র! জীবনের চেহারা বদলে যাবে সঙ্গে-সঙ্গে। এই পাথরের মতো জমাট স্তব্ধতা গলে গিয়ে, আনন্দ-কল্লোল প্রবহমান হয়ে উঠবে। এই জরাজীর্ণ বাড়িটাই রাজপ্রাসাদের মতো মনোরম হয়ে উঠবে। এই শীর্ণ, রুগ্ন দেহটা বাঞ্ছিতের ব্যগ্র আলিঙ্গনে রমণীয়, কমনীয় হয়ে উঠবে।

টেবিলের কাছে গিয়ে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখল। খুব খারাপ হয়ে গেছে। মন্টুদার কেন ভালো লাগে কে জানে! কতদিন ভালো লাগবে? যদি দুদিন ভোগ করেই বিস্বাস লাগে ওর, মনে অনুশোচনা জাগে, সেই স্বাস্থ্যবতী, রূপলাবণ্যময়ী ধনী-দুলালীর জন্য অস্থির হয়ে পড়ে?

তবু দুদিনের জন্যও তো ওকে পাবে! সেই দুদিনেই ও নিজেকে ঢেলে দেবে ওর তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে। তাতেই সে সার্থক হবে, পরিতৃপ্ত হবে। সুধা ফুরিয়ে গেলে সুধাপাত্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। কিন্তু সুধা-পায়ীর ওষ্ঠের স্পর্শেই তো সে ধন্য হয়, সার্থক হয়! তারপর ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই।

গাড়ি এসে দাঁড়াল। কানাই দরজা খুলে দিচ্ছে শব্দ পাওয়া গেল। বিকাশ বাড়ির ভিতরে ঢুকল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেল অরুণা—বিকাশ সিগারেট টানছে। ধীরে-ধীরে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আলোটা কমিয়ে দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

বিকাশ সিঁড়ির দরজা বন্ধ করল, নিজের ঘরে ঢুকল। পোশাক ছাড়ছে সম্ভবত। শিস দিয়ে একটা কি গানের সুর ভাঁজছে। পুরাতন বন্ধুর সঙ্গ পেয়ে ওর স্ফূর্তির জোয়ার এসে গেছে। সারাদিন গোমড়া

মুখে বসেছিল। বন্ধুর সাহচর্যে স্ফূর্তির খোলা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। চটি পায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবার শুয়ে পড়বে। অথচ শোবার আগে সে কি করছে—একবার খবর নিল না!

ধীরে-ধীরে ঘরে গিয়ে দাঁড়াল অরুণা। আর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে বিকাশ। পিছন ফিরেই তাকে দেখে বলে উঠল, 'এখনো জেগে আছ নাকি?'

অরুণা বলল, 'না, ঘুম এসে গিয়েছিল। তোমার জুতোর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।'

বিকাশ বলল, 'ওঃ তাই নাকি! খুবই দুঃখিত। আচ্ছা, আমি শুয়ে পড়ছি। তুমিও শোও গে। হ্যাঁ একটা কথা—ধীরেন কাল শহরে ফিরে যাচ্ছে। আমিও ভাবছি ঘুরে আসি। উষাদের সঙ্গে দেখা করে আসিগে। অনুষ্ঠানটার তো দেরি আছে। নির্মল, ধীরেন, দুজনেই আসবে কিছু আগে। আমি ওদের সঙ্গেই আসব। সেদিন এসে সব ব্যবস্থা করা যাবে। কোনো চিন্তা নেই। কমলবাবু যথাসাধ্য চেষ্টা করবে—কথা দিয়েছে। এখানকার সার্কল অফিসার, দারোগাবাবু, দুজনেই নিমন্ত্রণে এসেছিলেন। ওঁরা দুজনেই খুব সহানুভূতি দেখালেন। সাহায্য করবার আগ্রহ দেখালেন। তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমি কাল বিকেলেই যাব। আচ্ছা, এস তাহলে। শুয়ে পড়গে। বেশি রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে।'

চলে এল অরুণা। মণ্টুদা তাকে ছেড়ে চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে! আর একদিনও তার কাছে থাকতে চায় না! এখান থেকে চলে গেলে ও আর দেখা পর্যন্ত দেবে না! চিরদিনের মতো সরে যাবে তার কাছ থেকে। এই দীর্ঘকাল যার অদর্শন সহ্য করেছে, তার আর দেখা পাবে না ভাবতেই মনটা হাহাকার করে উঠল। মণ্টুদা কাছে নেই, চির-দিনের মতো তার জীবন থেকে হারিয়ে যাবে, ভাবতেই তার চার পাশ থেকে সমস্ত বাতাস সরে গিয়ে একটা নিষ্ঠুর শূন্যতা হিংস্র মুষ্টিতে তার গলা চেপে দম-বন্ধ করে আনতে লাগল।

বিকাশ শুয়ে পড়েছে। অরুণা ওর কাছে গিয়ে ডাকল, 'মণ্টুদা—'

বিকাশ বলে উঠল, 'কে?'

'আমি—অরুণা।'

বিকাশ সাগ্রহে বলল, 'কি হয়েছে, শরীর খারাপ হচ্ছে নাকি?' বিছানায় উঠে বসল। বিছানার থেকে নেমে লণ্ঠনের আলোটা একটু উসকে দিয়ে বলল, 'কি হচ্ছে বল দেখি?'

'আর পারছি না, মণ্টুদা!' আর্তস্বরে বলে উঠল অরুণা। ওর সামনে জানু পেতে বসে ওর পায়ে মাথা রেখে বলল, 'আমাকে বাঁচাও।'

বিকাশ বিস্ময়ের স্বরে বলল, 'কি হল তোমার!' অরুণাকে জোর করে তুলতেই সে বিকাশের বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল। বিকাশ ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগল, 'কি হয়েছে? ভয় পেয়েছ? বেশ তো, আমার বিছানায় শোও! আমি অন্য ব্যবস্থা করছি।'

মাথা নাড়ল অরুণা। বিকাশ জিগগেস করল, 'কি তা হলে?'

অরুণা বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে নাও তুমি। একেবারে তোমার করে নাও। আর কিছু ভাবব না নিজের জন্য। আমার ভালো-মন্দ সব তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। যা ইচ্ছা হয় কর। শুধু আমাকে ফেলে রেখে যেও না!'

ওর মুখখানি প্রগাঢ় স্নেহে বুকে চেপে ধরে বলল বিকাশ, 'আমি তো চলে যেতে চাইনে। তোমাকে বুকে তুলে নিতেই তো এসেছি, রুনু!'

১৪

পরদিন বিকেল চারটায় ধীরেন এল। ডাক দিল বাইরে থেকে। বিকাশ বার হওয়ামাত্র বিস্ময়ের স্বরে বলল, 'এখনো তৈরি হসনি?'

বিকাশ বলল, 'বাড়ির ভিতরে আয়। সব বলছি।'

ধীরেনকে উপরে নিয়ে এল বিকাশ। খোলা ছাদে একটা টেবিল ও তিনখানা চেয়ার পেতে বসবার ব্যবস্থা আগে থেকে করাই ছিল। ধীরেনকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বসাল। ধীরেন বলল, 'এইখানেই আড্ডা জমাস নাকি?'

বিকাশ বলল, 'না, তোর জন্যই এই ব্যবস্থা। এতদিন তো আড্ডা জমাবার লোক ছিল না।'

ধীরেন বলল, 'জুটেছে নাকি?'

বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ, মত হয়েছে।'

ধীরেন সাগ্রহে বলল, 'বলিস কি?'

বিকাশ বলল, 'কাল ফিরে আসার পরই ও মত দিল।'

ধীরেন বলল, 'ভালো হয়েছে।'

বিকাশ বলল, 'ও যে মত দেবে তা আমি জানতাম। লোহার আকৃষ্ট হওয়ার সম্বন্ধে চুম্বক যেমন নিশ্চিত, আমার অন্তরের মধ্যে বাইরের সমস্ত টাল-মাটালের মধ্যেও একটি স্থির বিশ্বাস ছিল যে ও আমার কাছে না এসে পারবে না। যে আকর্ষণ সাত সমুদ্র পার থেকে আমাকে টেনে এনেছে, সে আকর্ষণ তো ওর উপরেও কাজ করছে। আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম বলে ও স্থির ছিল। যেই আমি স্থির হলাম ও এগিয়ে এল।'

ধীরেন বলল, 'তাহলে তুই যাচ্ছিস না?'

'না, যাব না। নির্মলদের আমার কথা এখন কিছু বলিস না। ও এলে ওকে সব বলব।'

ধীরেন বলল, 'সেই মেয়েটিকে কি বলবি?'

বিকাশ বলল, 'তাকে চিঠি লিখে সব জানাব। সে বুদ্ধিমতী, আমার অবস্থা বুঝবে।'

'মেয়েটি মনে খুব কষ্ট পাবে তো?'

'হয়তো পাবে। কিন্তু কি করব। তার জীবনে অনেক আছে। অরুণার কিছু নেই। আমি না এসে পড়লে কি হত বল দেখি! তোরাই তো ঘাড় ধরে ওকে রাস্তায় বার করে দিতিস।'

লজ্জা পেল ধীরেন। বলল, 'সত্যি! উনি আসছেন নাকি? ভারি লজ্জা হচ্ছে ভাই!'

বিকাশ বলল, 'আমি বুঝিয়ে দিয়েছি ওকে—তোর কোনো দোষ নেই। তুই ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের হুকুম তামিল করছিস মাত্র। তুই আবার ফিরছিস কবে?'

ধীরেন বলল, 'চার-পাঁচদিন পরে।'

'একটা পরামর্শ আছে তোর সঙ্গে। বিয়ের ব্যাপারটা চটপট শেষ করে ফেলতে চাই।'

ধীরেন বলল, 'ফিরে আসি। স্বামীজীর কাছে গেলেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওঁর এ-সব বিষয়ে মত খুবই উদার।'

অরুণা এল। দু হাতে দুটি রেকাবীতে খাবার। কানাই দু-গ্লাশ জল নিয়ে এল। ধীরেন বলল, 'আমি এ'কে দেখেছি আগে। তখন স্বাস্থ্য ভালো ছিল এর চেয়ে।'

বিকাশ বলল, 'খুব ভালো ছিল। ক'বছরেই সব শেষ হয়ে গেছে। অনেক কষ্ট পেয়েছে তো!'

অরুণা আসতেই ধীরেন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আবার খাবারের ব্যবস্থা করলেন?'

বিকাশ বলল, 'অত ভদ্রতা দেখাতে হবে না! তোর বন্ধুর ছোট বোন তো! অবশ্য আমার গৃহিণী হলে খাতির করাব।'

অরুণা রেকাবী দুটি টেবিলে নামিয়ে রাখল। তারপর গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ট হয়ে ধীরেনকে প্রণাম করতেই সে আঁৎকে উঠে বলল, 'আরে! ও কি করছেন!'

অরুণা বলল, 'আপনি দাদার বন্ধু। আমারও দাদা।'

'তা বটে। তাহলে তো আশীর্বাদ করতে হয়।' মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'আশীর্বাদ করি সুখী হোন। অনেক কষ্ট পেয়েছেন, এবার তার চিরদিনের মতো অবসান হোক।'

চোখে জল এসে গেল অরুণার।

কাছেই বালতিতে জল ছিল। ওরা হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসল। অরুণা দাঁড়িয়েছিল কাছে। ধীরেন বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।' অরুণা বলল, 'ছোট বোনকে এত খাতির!'

ধীরেন বলল, 'আচ্ছা আর করব না।'

অরুণা বাকি চেয়ারটায় বসল। খেতে-খেতে ধীরেন বিকাশকে বলল, 'তোমাদের প্ল্যানটা কি? এখানে থাকা খুব সুবিধের হবে না। কমলবাবু লোকটি বাইরে খুব মোলায়েম, কিন্তু ভিতরে সুবিধের নয়। ওঁর স্ত্রীর চিকিৎসা করছিস বলে ওঁর ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে তোর এই বিয়ে উনি সমর্থন করবেন বলে মনে হয় না। তবে নির্মলবাবু যতদিন থাকবেন, ততদিন কোনো ক্ষতি করতে সাহস করবে না। আর এক কথা—স্বামীজীকে খুব ভয় করেন। আশ্রমের ও-পাশে যে গ্রামটা আছে ওখানে অনেক ধনী ও শক্তিশালী লোকের বাস। ওখানে স্বামীজীর খুব প্রতিপত্তি। স্বামীজী তোদের বিয়ে সমর্থন করলে কেউ কোনো গোলমাল করবে বলে মনে হয় না।'

বিকাশ বলল, 'এখানে থাকবার ইচ্ছে আমার নেই। দিল্লীর চাকরি পেলেও নেব না। ভারতের বাইরে কোথাও চলে যাবার ইচ্ছে। কাবুল ও বর্মা সরকার অনেক ভারতীয় ডাক্তার চাইছে। আমি চেষ্টা করব ভাবছি।'

ধীরেন চলে গেল। বিকাশ এগিয়ে দিতে গেল। গাড়িতে চাপবার সময় ধীরেন বলল, 'ভালো লাগল মেয়েটিকে। বড় ক্লান্ত, দুর্বল মনে হল। যেন বহু দূর দুর্গম পথ হেঁটে ও ওর অভীষ্ট দেবতার কাছে এসে পৌঁছেছে। সার্থকতার আনন্দে ক্লান্তির ভাবকে ও ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। অবশ্য তোর উদারতা ও মহত্ত্ব প্রশংসনীয়, কিন্তু ও-ধরনের মেয়েও দুর্লভ। স্বামীর উপরে ওর ব্যবহার সামাজিক রীতি ও নীতির দিক দিয়ে সমর্থনযোগ্য নয়, বরং নিন্দনীয়। কিন্তু যুগ-যুগ ধরে মানুষ যে অপরাজেয় স্বর্গীয় প্রেমের জয়গান করে আসছে, অরুণার প্রেম তা থেকে আলাদা নয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ও যেন সুখী হয়। ওর প্রেম তোর মধ্যে সার্থক হয়।'

বিকাশ হেসে বলল, 'খুব বক্তৃতা দিয়ে দিলি।'

ধীরেন বলল, 'কি জানি ভাই, চেপে যেতে পারলাম না। আমি ফিরে এসে আবার দেখা করব।'

অরুণা চুপ করে বসেছিল। ভাবছিল— আর এক জীবন শুরু হল। যে জীবনকে সে স্বপ্নে দেখেছে, কল্পনায় ছবি এঁকেছে, সেই জীবনের সূচনা হল আজ। কেমন ভাবে এ-জীবন কাটবে কে জানে? বিকাশ সুখী হবে তো? ওর অন্তর যদি রূপ চায়, যৌবন চায়, আমার কাছে কতটুকু পাবে? একেবারে নিঃস্ব হয়ে বসে আছি যে! এক চুমুকে নিঃশেষ হয়ে যাব! তারপর যদি ওর পিপাসা না মেটে, না মেটে দেহের ক্ষুধা, তাহলে? অতৃপ্তির গ্লানিতে প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্ত যদি বিষিয়ে ওঠে!

বিকাশ এল। অরুণা বলল, 'এতক্ষণ ধরে কি কথা হচ্ছিল?'

বিকাশ ওর পাশে বসে বলল, 'তোমার প্রশংসা করছিল।'

অরুণা বলল, 'কি এমন করলাম যে প্রশংসা করলেন?'

'তোমার প্রেমের নিষ্ঠার প্রশংসা করছিল।'

অরুণা বলল, 'প্রশংসা তো তোমারই করা উচিত।'

বিকাশ বলল, 'বিয়ের ব্যবস্থার জন্য পরামর্শ করছিলাম। ও বলল ফিরে এসে সব ব্যবস্থা করবে।'

অরুণা বলল, 'আবার বিয়ের হাঙ্গামা করতে হবে নাকি?'

বিকাশ বলল, 'হবে না? আমাদের মিলিত জীবনের পিছনে সমাজ ও রাষ্ট্রের সমর্থন চাই। তা না হলে আমাদের ছেলে-মেয়েরা সমাজ ও রাষ্ট্রে সম্মান ও সুবিধা পাবে কেন?'

অরুণা বলল, 'আমাদের ছেলে-মেয়ে হবে, তারা বড় হবে, মানুষ হবে, সমাজে ও দেশে মান্য-গণ্য হবে, বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না।'

বিকাশ বলল, 'ভরসা হয় না কেন?'

'আমি বড় অভাগী। এত সুখে আমার ভয় হয়। মনে হয় দেখতে-দেখতে সন্ধ্যার আকাশে রঙের খেলার মতো মিলিয়ে যাবে।'

বিকাশ বলল, 'তোমার দেহের নয়, মনের চিকিৎসা করতে হবে। ওঠ দেখি, বেড়িয়ে আসি কতকটা। ফিরবার সময় স্বামীজীকে প্রণাম করে আসব।' একটু থেমে বলল, 'কাপড় ছাড়বার দরকার কি? গরম চাদরটা নাও। স্যান্ডালটা পরে নাও—'

অরুণা বলল, 'পায়ে লাগবে না?'

'পায়ে লাগবে কেন? পরেই দেখ না।'

মোটরে বড় রাস্তা দিয়ে বরাবর চলল ওরা। কিছুক্ষণ পরে একটা নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছুল। দু-পাশে ঘন জঙ্গল। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে একটি সুগভীর স্তব্ধতা ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে। কোথাও একটা পাখির ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

সামনে নদীর নাতিবিস্তৃত বালুবক্ষ শুভ্র উত্তরীয়ের মতো পড়ে রয়েছে। নদী পার হয়েই রাস্তাটা ক্রমোচ্চ পাড়ে উঠে, কতকটা গিয়ে একটা বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওপারেও রাস্তার দু-পাশে জঙ্গল। মনে হচ্ছে যেন নীল আকাশটা নিচু হয়ে ঐ জঙ্গলের সীমান্তেই পৃথিবীকে স্পর্শ করেছে। ঐ পৃথিবীর শেষ, ওর পরে আর কিছু নেই।

চুপ করে বসে রইল দুজনে। হঠাৎ অরুণা বিকাশের কাছে ঘেঁষে বসল। বিকাশ বলল, 'খুব ভালো লাগছে, নয়?'

অরুণা বলল, 'তুমি কাছে আছ বলেই ভালো লাগছে। না হলে দম বন্ধ হয়ে আসত।'

বিকাশ সস্নেহে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'আর তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না, রুনু।'

কিছুক্ষণ পরে বিকাশ বলল, 'চল, নদীর ধারে গিয়ে বসি।' অরুণা খালি পায়ে নামবার উপক্রম করতেই বিকাশ বলল, 'স্যান্ডাল পরে নামো। খুব লাগছে নাকি?'

অরুণা ঘাড় নেড়ে 'না' জানাল।

ধীরে-ধীরে নদীর ধারে গিয়ে শুভ্র কোমল বালির উপরে দুজনে পাশাপাশি বসল।

ধীরে-ধীরে সূর্য অস্ত গেল। অস্তাচলশায়ী মেঘপুঞ্জ লাল হয়ে উঠল। তার লাল আভা অরুণার মুখখানিতে পড়ে যেন আবীর ছড়িয়ে দিল। ধীরে-ধীরে ম্লান হয়ে, মেঘের রঙ ধূসর কালো হয়ে উঠল। নদীর ধারে গাছগুলি পাখির কলরবে মুখর হয়ে উঠল। একটা বাতাস উঠল সামনের জঙ্গলে। একটা মর্মরধ্বনি তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ল সারা জঙ্গলের বুকে। জঙ্গল ছাড়িয়ে এসে নদীর ধারের গাছগুলির মাথায় স্পর্শ হানল।

বিকাশ বলল, 'শীত করছে তো চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নাও।' বিকাশ অরুণার জন্য যে শালটি কিনে এনেছিল সেটা ওর কোলের উপরে

ছিল। শালটি অরুণার গায়ে ভালো করে জড়িয়ে দিল বিকাশ।

কিছুক্ষণ পরে ওরা ফিরবার জন্য রওয়ানা হল। ফিরবার পথে আশ্রমে গেল। স্বামীজী মন্দিরে ছিলেন। ওরাও মন্দিরে গিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। ঠাকুরের আরতি হচ্ছিল। স্বামীজী মন্দিরের চত্বরে দরজার পাশে জোড় হাতে দাঁড়িয়েছিলেন। নিচে ছাত্ররা ও শিক্ষকেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে-ছিল। আরতি শেষ হল। সকলে প্রণাম করে বিদায় নিল। ওরা স্বামীজীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

স্বামীজী নেমে এলেন। ওদের লক্ষ্য করলেন না। ধীর পায়ে নিজের আশ্রমের দিকে চললেন। ওরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওঁকে অনুসরণ করল।

স্বামীজী তাঁর বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসলেন। বিকাশ ও অরুণা কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল। স্বামীজী সস্নেহে অরুণাকে বললেন, 'কেমন আছ মা?' বিকাশকে বললেন, 'এখনো আছেন তাহলে?'

বিকাশ একটু ইতস্তত করে স্বামীজীকে বলল, 'অরুণা বিয়েতে মত দিয়েছে—'

একটু বিস্ময়ের চমক লাগল স্বামীজীর মনে। বললেন, 'তাই নাকি?' অরুণার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ মা?'

অরুণা লজ্জায় মুখখানি নামাল। স্বামীজী একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তা বেশ! শাস্ত্র-সঙ্গত অনুষ্ঠান করে বিবাহ করতে হবে কিন্তু।'

বিকাশ বলল, 'নিশ্চয়। অরুণা আপনার নাম করে বলছিল, উনি আমার পিতৃতুল্য, উনি যা করবেন তাই হবে!'

স্বামীজী বললেন, 'আমিই সব ব্যবস্থা করব, তোমাদের কিছু ভাবনা নেই। আমার এখানেই বিবাহ হবে। আমাদের মন্দিরের পুরোহিত পৌরোহিত্য করবেন।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'এর আগে দুটি বিধবা-বিবাহ হয়েছে আমার এখানে।'

বিকাশ বলল, 'খুব হৈচৈ না হওয়াই ভালো।'

স্বামীজী বললেন, 'প্রয়োজন কি? অরুণার তো কোনো আত্মীয় নেই। তোমার কোনো আত্মীয় বিবাহে উপস্থিত থাকবেন নাকি?'

বিকাশ বলল, 'না, আমার দু-একজন বন্ধু থাকতে পারে।'

স্বামীজীকে প্রণাম করে ওরা বিদায় নিল।

[১৫]

পরদিন সকালে বিকাশ বলল, 'আজ একবার শহরে যাব ভাবছি। কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে।'

অরুণা বলল, 'আবার জিনিসপত্র কি হবে?'

'বিয়ের জিনিসপত্র কিনতে হবে না?'

'তুমি জানো কি-কি জিনিসপত্র লাগে?'

'জিগগেস করে নেব এখন।'

'তার চেয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।'

'তা হলে তো খুবই ভালো হয়, তোমার পছন্দমতো সব কেনা যাবে। দরকার হলে হাঁটতে হবে কিন্তু।'

অরুণা হেসে বলল, 'পারব। না পারলে সেদিনের মতো—'

বিকাশ হেসে বলল, 'এবার কোলে নয়, কাঁধে। কাঁধেই তো চাপলে শেষে।'

'ইচ্ছে হয় তো নামিয়ে দাও,' মুখে অভিমানের ছায়া নামল অরুণার।

'আরে ঠাট্টা করে বলেছি!' বিকাশ অরুণার চিবুকটি ধরে মুখখানি তুলে বলল, 'ঠাট্টা বুঝতে পার না খুকি!'

ভ্রুভঙ্গী করে অরুণা বলল, 'তুমিই তো খোকা!'

হেসে ফেলল দুজনে। বহুদিনের স্মৃতি ভেসে উঠল দুজনের মনে। অরুণাকে রাগাতে হলে বিকাশ ওকে বলত 'খুকি!' সঙ্গে-সঙ্গে সগর্জন জবাব আসত, 'খোকা!'

'কচি খুকি!'

'ধাড়ি খোকা!'

একটি স্নিগ্ধ মধুর মায়া ঘনালো দুজনের মনে।

নদীর ধারে গাড়ি পেঁছাল। চায়ের দোকানী খুব খাতির করে বসাল দুজনকে। চা খাওয়াল বিকাশকে। অরুণা খেল না। যে ছোকরাটি সেদিন গাড়ি পাহারা দিয়েছিল ও মোটা বখশিস পেয়েছিল, সে ভূমিষ্ঠ

হয়ে প্রণাম করল দুজনকে। বিকাশ তাকে পাঠাল একটা গরুর-গাড়ি যোগাড় করে আনবার জন্য। সে অবিলম্বে এনে হাজির করল।

অরুণাকে গরুর গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে বিকাশ পিছু-পিছু হেঁটে চলল। অরুণা বলল, 'আমি গাড়িতে চড়ে যাব, আর তুমি হাঁটবে?'

বিকাশ বলল, 'আমার হাঁটতে ভালো লাগছে।'

ওপারের কাছাকাছি এসে গাড়ি জলে নামল। গরুগুলোর পেট ছাড়িয়ে জল উঠল। 'একেবারে ডুবে যাবে না তো?' ভয়ে-ভয়ে বলল অরুণা।

বিকাশ বলল, 'ডুবলেই বা! সাঁতার দেওয়া ভুলে গেছ নাকি?'

'ও কি আর কেউ ভোলে?'

'আমার চেয়ে ভালো সাঁতার দিতে। ভাই-বোনে নদীতে নামলে উঠতে চাইতে না।'

'তুমিও কিছু কম যেতে না!'

নদী পার হল। গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করতে বলে, ওরা একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে শহরে চলে গেল।

নানা দোকান ঘুরে নানারকম জিনিসপত্র কেনা হতে লাগল। অরুণাই পছন্দ করে কিনতে লাগল, বিকাশ দাম দিতে লাগল। অরুণাকে দেখে কারও মনে হল না—বহু দুঃখ-দুর্দশাময় সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সে সদ্য বিকাশের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বরং মনে হল বহুদিন এক সঙ্গে ঘর করেছে ওরা, বহুদিন ধরে ও কর্তৃত্ব করে আসছে বিকাশের উপর। বিকাশের হাব-ভাব দেখে তাকেও জবরদস্ত গৃহিণীর অনুগত স্বামী বলে মনে হল সবারই।

একটা চায়ের দোকানের সামনে এসে বিকাশ বলল, 'এক কাপ চা খেলে হত না?'

অরুণা বলল, 'খাবে? চল—'

'তুমি খাবে তো?'

'তুমি বল তো খাব।'

'একটা জিনিস কেনা হয়নি কিন্তু,' বলল অরুণা।

বিকাশ বলল, 'কি বল দেখি।'

'শাঁখা—'

বিকাশ বলল, 'আমার মনে আছে। দেখে-শুনে ভালো দেখে কিনব।'

শাঁখা কেনা হল। বিকাশ বলল, 'কিছু গয়না কিনতে হবে।'

অরুণা বলল, 'অনেক টাকার ব্যাপার। থাক এখন। তা ছাড়া কি দরকার গয়নার—' কণ্ঠস্বর নিচু করে বলল, 'তুমি ও তোমার ভালোবাসাই আমার গয়না—আমার হীরে, মানিক, জহরত।'

বিকাশ বলল, 'পরে খোঁটা দেবে, বিয়ের সময় এক টুকরো সোনাও দাওনি।'

অরুণা বলল, 'না গো, না। কোনোদিন কিছু বলব না, দেখ।'

তবু বিকাশ জোর করে একজোড়া কঙ্কণ কিনল। অরুণাকে জিগগেস করল, 'তোমার পছন্দ হচ্ছে।'

অরুণা বলল, 'তুমি যা দেবে, তাই আমার পছন্দ।'

বিকাশ বলল, 'মা তো ওঁর গয়না সব দিদি আর উষাকে দিয়েছেন। কিছু হয়তো আছে দিদির কাছে।'

বিরক্তির স্বরে বলল অরুণা, 'চাইনে ওসব। বাদ দাও ও কথা। তোমার জন্য একটা আংটি কেনো।'

'তোমার জন্যও।'

'না-না, আমার চাইনে।'

দুটো আংটি কেনা হল। অরুণা বলল, 'অনেক খরচ হয়ে গেল। এর পর চলবে কি করে?'

বিকাশ বলল, 'ব্যাঙ্কের উপর থেকে চেক কেটে। তোমার চিন্তা নেই।'

মোটরে ফিরবার সময়ে বিকাশের পাশে বসে অরুণা মাঝে-মাঝে ঢুলতে লাগল। ওর মাথাটা হেলে এসে মাঝে-মাঝে বিকাশের ঘাড়ে ঠেকতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বিকাশের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল অরুণা। হঠাৎ একটা ঝাঁকানিতে অরুণার ঘুম ভেঙে গেল। সভয়ে বলল, 'কি হল?'

বিকাশ বলল, 'কিছু না। খুব ঘুমিয়ে নিলে?'

অরুণা লজ্জিত-মুখে বলল, 'ঘাড়ে ব্যথা হয়নি তো?'

বিকাশ বলল, 'শুধু মাথার ভারেই ব্যথা? মানুষটাকে বইতে হবে সারা জীবন ধরে!' একটু থেমে বলল, 'ভালো লাগছিল। তোমার ঐ

নিশ্চিন্ত নির্ভরতাটি। মনে হচ্ছিল, আমার ছোটবেলার হারানো বান্ধবীটিকে খুঁজে পেয়েছি আবার।'

গাড়িটা বাড়ির দরজাতে এসে দাঁড়াতেই কানাই ছুটে বার হয়ে এল। অরুণা আগেই নেমে গেল। বিকাশ কানাইকে জিনিসগুলো নিয়ে যাওয়া ও রাখা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগল।

বাড়িতে ঢুকতেই ক্ষুদুর মা বলল, 'চা খাবেন নাকি?'

'খাব বৈকি! আনো।' বলে রান্নাঘরের বারান্দায় গিয়ে বিকাশ বসে পড়ল। অরুণা উপরে চলে গিয়েছিল।

অবিলম্বে চা আনল ক্ষুদুর মা। বিকাশ চা খেতে লাগল। অরুণা ফিরে এসে ওকে চা খেতে দেখে বলল, 'চা-ই খাচ্ছ যে শুধু। কিছু খেতে হবে না? আমি কিছু খাবার করে দিই।' বলে রান্নাঘরে ঢুকল।

ক্ষুদুর মা কাছে দাঁড়িয়েছিল। ফিসফিস করে বলল, 'একেবারে বদলে গেছে! এ-রকম ভাব দেখিনি! আপনি বিদেশ যাবার পর থেকে যেন পাষাণ হয়ে গিয়েছিল—অহল্যার মতো। রামের পায়ের ছোঁয়া লেগে অহল্যা যেমন প্রাণ পেয়েছিল, আপনার ছোঁয়াতে ওরও তাই হয়েছে।'

'বিয়েতে তোমার কোনো অমত নেই তো?'

'না, ভাই। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমাদের ভালো হোক। ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীমন্ত হও। ওর কথা ভেবে আমার চোখে ঘুম আসত না। ভাবতাম কে ওকে দেখবে, ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন।'

বিকাশ বলল, 'তোমার জন্য গরদ কিনেছি, ক্ষুদুর মা।'

'তোমার দয়া, দাদা!'

'দয়া আবার কি? অনেক যত্ন তো অনেকদিন করেছ আমার। নিজের দিদির মতো অরুণাকে স্নেহ করেছ! দয়া নয়, তোমার ন্যায্য পাওনা।'

অরুণা খাবার আনল। বিকাশ বলল, 'তুমি খাবে না?'

অরুণা ঘাড় নেড়ে জানাল—না।

বিকাশ বলল, 'খাবে না কেন?'

ক্ষুদুর মা চলে গেল।

বিকাশ বলল, 'খাও আমার সঙ্গে। না খাও তো ঘাড় ধরে মুখে গুঁজে দেব।'

অরুণা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা বাপু, খাচ্ছি। ছোটবেলা থেকে জোর-জুলুম। না মানলেই রাগ-অভিমান।'

বিকাশ বলল, 'মেনে এসেছ তো বরাবর!'

'কি আর করব! ভগবান যা করতে পাঠিয়েছেন, তা এড়ায় কার সাধ্যি!'

কিছুক্ষণ পরে বিকাশ বলল, 'চল আশ্রমে যাই।'

অরুণা বলল, 'হেঁটে যাব কিন্তু!'

'টর্চটা নাও সঙ্গে।'

স্বামীজী আশ্রমেই ছিলেন। যেতেই বললেন, 'দিন স্থির হয়ে গেছে।' আরও নানা বিষয়ে আলোচনা হল। স্বামীজী বললেন, 'এখানে হাসপাতাল হলে একজন বড় ডাক্তারের দরকার হবে। আপনি থাকতে চান তো রায়বাহাদুরকে বলতে পারি।'

বিকাশ বলল, 'অরুণা যদি এখানে থাকতে চায় তো আপত্তি নেই।'

স্বামীজী অরুণাকে বললেন, 'তুমি কি আমাদের ছেড়ে যেতে চাও, মা?'

'না, বাবা! তবে গ্রামের লোক আমাদের থাকা পছন্দ করতে পারবে কি?'

স্বামীজী বললেন, 'আমার উপর নির্ভর কর মা। আমি যতদিন থাকব কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তা ছাড়া বাবাজী এত বড় ডাক্তার। দু-চারমাস থাকলে সকলকেই সাহায্যের জন্য ওঁর দ্বারস্থ হতে হবে। ওঁর গুণের পরিচয় পেলে তখন এ-ত্রুটি কারও মনে থাকবে না। সবাই তোমাদের এখানে ধরে রাখবার জন্যই চেষ্টা করবে।'

ফিরবার সময় অরুণা বলল, 'সত্যি এখানে থাকবে নাকি?'

বিকাশ বলল, 'দিন কতক তো থাকা যাক। তারপর সুবিধা না হলে ছেড়ে দিলেই হবে।'

অরুণা বলল, 'ও-বাড়িতে থাকব না কিন্তু।'

বিকাশ বলল, 'এত বড় হাসপাতাল হবে, আর ডাক্তারের থাকবার ব্যবস্থা হবে না? না ব্যবস্থা হয় তো সরে পড়ব।'

বাড়ির কাছাকাছি এসেই হঠাৎ অরুণা বলল, 'একটা কথা কিন্তু তোমাকে বলা হয়নি।'

বিকাশ আঁতকে উঠল, 'আবার কি কথা!' থমকে দাঁড়িয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল।

অরুণা বলল, 'খুব গোপনীয় কথা। কানে-কানে বলতে হবে।'

একটা শঙ্কা ও বিস্ময় জাগল বিকাশের মনে। আবার পাগলামী শুরু হল নাকি।

অরুণা বলল, 'মাথাটা কাছে আনো না।' বলে দু-হাতে ওর মুখটা কাছে টেনে এনে একটা প্রগাঢ় চুম্বন এঁকে দিল।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে বিকাশ বলে উঠল, 'আরে এই! আগে বলতে হয়! এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে—ভাবলাম না জানি আবার কি ফ্যাসাদ বাধায়! দাঁড়াও—' বলে অরুণাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, ওর ওষ্ঠে একটি আবেগ-ভরা চুম্বন দিল।

[১৬]

দিনকয়েক পরে স্বামীজীর আশ্রমে বিকাশ ও অরুণার বিয়ে হয়ে গেল। ধীরেন যথাসময়ে ফিরে এসেছিল এবং বিবাহে উপস্থিত ছিল। আর উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সার্ক্‌ল্‌ অফিসার। তাঁর একটি ছেলে টাইফয়েডে ভুগছিল। বিকাশের চিকিৎসাধীনে এসে ক্রমে সেরে উঠেছিল। কমলবাবু উপস্থিত থাকতে পারেনি। বিকাশের চিকিৎসার গুণে তার স্ত্রী অনেকটা সেরে উঠেছিলেন এবং এইজন্য সে বিকাশের কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ছিল। তবু কৃতজ্ঞতার খাতিরেও নিজের ভ্রাতৃবধূর পুনর্বিবাহে যোগদান করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন শিক্ষকমহাশয় ও বোর্ডিং-এর ছেলেরা। ছেলেরা খুবই উৎসাহ দেখিয়েছিল। বিকাশ অরুণা রাজী হয়নি, তাই; না হলে তারা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বিবাহ ব্যাপারটাকে রীতিমতো চমকপ্রদ করে তুলতে পশ্চাৎপদ হত না।

বিবাহ অনুষ্ঠানের পর অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল। যাবতীয় খরচের জন্য টাকা বিকাশ আগেই স্বামীজীর হাতে দিয়ে দিয়েছিল। ব্যবস্থা হয়েছিল স্কুলের বোর্ডিঙে। মোটের উপর অনুষ্ঠানটি বেশ নিখুঁতভাবেই সম্পন্ন হল।

ধীরেনের গাড়িতে ওরা বাড়ি ফিরল। নামবার সময় ধীরেন বলল, 'বাসর জাগা হবে না? যাব নাকি বাসর জাগতে?'

অরুণা বলল, 'আসুন।'

ধীরেন ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটিয়ে ডাক-বাংলোয় ফিরল।

সে রাত্রে ওরা ঘুমোল না। মুখোমুখী বসে গল্প করতে লাগল। এতদিন একসঙ্গে থেকেও ওরা নিজের-নিজের মনকে পরস্পরের চোখের সামনে সম্পূর্ণভাবে মেলে দেয়নি। আজ যখন তাদের জীবন নিশ্চিত-ভাবে মিলিত হয়ে গেল, তখন আর কোনো বাধাই রইল না। অরুণা বলল এক সময়, 'আচ্ছা মণ্টুদা—না—হ্যাঁগো!' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'অভ্যাস করতে হবে, বাপু!' বিকাশ বলল, 'তুইয়ের বদলে তুমি বলতে আমার কমাস লেগে গিয়েছিল!'

অরুণা বলল, 'যখন তুমি শুনলে আমার বিয়ে হয়ে গেছে, তখন কি করেছিলে?'

বিকাশ বলল, 'কি আর করব? বাবার মৃত্যুর খবর যেভাবে নিয়েছিলাম, এও সেইভাবে নিলাম। দরজা বন্ধ করে বিছানায় উবু হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদলাম কতক্ষণ। তারপর সেটাকে একেবারে মনের অন্দরে ঢুকিয়ে দিলাম। পিতৃ-বিয়োগের শোক, প্রিয়া-বিয়োগের শোক পাশাপাশি জ্বলতে লাগল। হাতাহাতি পরীক্ষা ছিল, দিতে পারলাম না।'

আরও কত কথা হল। ভাবী জীবনের কত ছবি আঁকল। ছেলে-মেয়ে হলে কি নাম হবে ঠিক হয়ে গেল। আগে ছেলে না আগে মেয়ে, তা নিয়ে তর্ক বাধল। অরুণা বলল, 'আগে ছেলে, ঠিক তোমার মতো দেখতে।' বিকাশ বলল, 'আগে মেয়ে, ঠিক তোমার মতো দেখতে।' অরুণা বলল, 'আমি ছেলেকে খুব ভালোবাসব।' বিকাশ বলল, 'আমি মেয়েকে খুব ভালোবাসব।' ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও রঙিন ছবি আঁকল ওরা। অরুণা বলল, 'খুব বড় ডাক্তার হবে।' বিকাশ বলল, 'মেয়েকেও ডাক্তার করব আমি।' অরুণা বলল, 'আহা! সে আবার কি? জামাই ডাক্তার হবে।'

ভোর হয়ে এল। বিবাহিত জীবনের প্রথম রাত্রি কাটল। নতুন দিনের শুরু হল। বাইরে এসে দাঁড়াল দুজনে।

পূর্বাকাশে রঙের খেলা শুরু হয়েছে। প্রণাম করল দুজনে। হে আকাশ, তোমাকে প্রণাম। হে সূর্য, তোমাকে প্রণাম। প্রার্থনা করল— যেন আমাদের জীবন সার্থক হয়, যেন সুখ-শান্তিতে ভরে ওঠে, হে ভগবান!

দিনগুলি যেন পাখা মেলে পার হয়ে যেতে লাগল সুন্দর-সুন্দর পাখির মতো।

এক মাস কেটে গেল। এর মধ্যে কি ঘটল, কি দেওয়া হল, কি পাওয়া গেল, হিসাব নেই অরুণার। শুধু ওর হৃদয় কানায়-কানায় ভরে উঠেছে। ওর চোখে পৃথিবীর রঙ বদলেছে। যে ভবিষ্যৎ চোখের সামনে ধূসর, উষর বিস্তারে পড়েছিল, তা শস্য-শ্যামল হয়ে উঠেছে। উর্বর হয়ে উঠেছে। আর ধীরে-ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে তলিয়ে যাওয়া নয়, প্রচুর সম্ভাবনাময় জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। ওদের দুটি জীবনের মাঝের সংযোগ-রেখা মিলে গিয়ে কখন যে দুই এক হয়ে উঠেছে, ওদের কারও মনে নেই।

ইতিমধ্যে 'ভিত্তি-স্থাপন উৎসব' পরম সমারোহে সম্পন্ন হয়ে গেছে। সভা-সমিতি, মন্ত্রীমশাইয়ের বক্তৃতা, ভূরিভোজ, গান-বাজনা, কিছুই বাদ যায়নি। ধীরেনের সুপারিশে বিকাশও নিমন্ত্রিত হয়েছিল। কমলবাবুর চেষ্টায় রায়বাহাদুরের সংগে আলাপ-পরিচয়ও হয়েছে। বিকাশ সোমনাথের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করেছে জেনেও তিনি বিন্দুমাত্র অসৌজন্য প্রকাশ করেননি। বরং তার বিদ্যার পরিচয় পেয়ে তাকে যথেষ্ট সমাদর করেছিলেন। স্বামীজী তাঁর কাছে বিকাশকে প্রধান চিকিৎসকের পদে নিয়োগ করার কথা বলতেই সংগে-সংগে সাগ্রহে রাজী হয়ে গেলেন। কথা হল যে ১৫ই অগাস্ট হাসপাতালের কাজ শুরু হবে। কমলবাবু ইতিমধ্যে হাসপাতাল গৃহনির্মাণ শেষ করে ফেলবে। অগাস্ট মাসের প্রথম দিনে বিকাশকে কাজে যোগ দিতে হবে। মাসিক বেতন এখন পাঁচশো টাকা। পরে বাড়বে। সম্ভবমতো প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করতে দেওয়া হবে। প্রধান চিকিৎসকের বাসের জন্য বাড়ি দেওয়া হবে। সে বাড়িও ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে যাবে।

বিয়ের পরেই বিকাশ অরুণাকে নিয়ে দুদিনের জন্য কলকাতা গিয়ে একটা হোটেলে উঠেছিল। দিদির বাড়িতে গিয়েছিল দেখা করতে। দিদিকে বলেছিল—বন্ধুর স্ত্রীর অসুখ। কলকাতায় আনা হয়েছে

ডাক্তার দেখাবার জন্য। সেখানে তাকেও থাকতে হবে। তারই উপরে নির্ভর করে এখানে এসেছে ওরা।

'বন্ধু আসেনি?'

না। ও এলে আর তাকে ছুটোছুটি করতে হবে কেন? বন্ধুর স্ত্রী এসেছেন, আর ওর মা এসেছেন—

দিদি বললেন, 'ডাক্তার দেখিয়ে ওদের বিদেয় করে দে।'

'তা কি হয়। পেঁৗছে দিতে হবে তো।'

'ওরা তো দুটি মেয়েমানুষ। তুই ওদের সঙ্গে থাকবি কি করে?'

'দুটো ঘর নেওয়া হয়েছে হোটেলে।'

বড়দিদি সন্দিগ্ধ-স্বরে বললেন, 'কে জানে বাবু, কি করে বেড়াচ্ছিস। শীলা চিঠি লিখেছে—ওর বাবার শরীর খুব খারাপ। ছুটি নেবেন। তোর দিল্লীর চাকরিটা নাকি হয়ে যাবে—ওর বাবা খবর নিয়ে জেনেছেন। তুই ওদের চিঠি লিখিসনি কেন জানতে চেয়েছে। কবে ফিরবি ওদের পেঁৗছে দিয়ে?'

'দিন কয়েক দেরি হবে। ওখানেও একটা বড় চাকরি খালি আছে। আমার বন্ধু চেষ্টা করছে আমার জন্যে। ওটা পাই তো দিল্লী যাব না। ঐ চাকরিটার জন্যেই আমার আরও কিছুদিন ওখানে থাকা দরকার। কাপড়-চোপড় তো কম নিয়ে গিয়েছিলাম, কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে যেতে হবে। টাকাও বার করতে হবে।'

বড়দি বললেন, 'উনি বলছিলেন, বিয়েটা এই বৈশাখেই সেরে ফেলতে।'

বিকাশ বলল, 'কার বিয়ে?'

'ন্যাকামী করিসনে মণ্টু! তোর বিয়ে যে মা শীলার সঙ্গে ঠিক করে গেছেন তা ভুলে গেছিস নাকি? মা ওকে তোর হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। নিজের গহনার বাক্স ওকে দিয়ে গেছেন। শীলা জানে তোর সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে। এখন যদি নানা লোকের কুচক্রে পড়ে মা'র কথা অগ্রাহ্য করিস, তাহলে তোর পাপের সীমা থাকবে না। তা ছাড়া মেয়েটাও বাঁচবে না। আমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মন আমি বুঝি।'

বিকাশ বলল, 'মরে যাবে না আর কিছু। সায়েন্স-পড়া আপটুডেট মেয়ে, মরে-টরে যাবে না। টেনিস টুর্নামেণ্টে ট্রফি না পেলে যেমন মন

খারাপ হয়, তেমনি হবে, তারপর দুদিন পরেই চাঙ্গা হয়ে উঠে নতুন করে খেলা শুরু করবে।'

বড়দি বললেন, 'শীলা ও-ধরনের মেয়ে নয়। ওকে নিয়ে দুদিন ঘর করলেই বুঝতে পারবি।'

কলকাতা থেকে ওরা পুরী গিয়েছিল। সমুদ্র-তীরে সারা বিকেলটা বসে থাকত দুজনে। অরুণা একদিন বলল, 'কত কান্নাই কাঁদছে! বুক-ফাটা কান্না! কি চায় ও জানে না।' বিকাশের আরও কাছ ঘেঁষে বসল, 'এই যে তোমার এত কাছে-কাছে রয়েছি, তোমার সঙ্গে মিশে রয়েছি, তাতেই কি আমার কান্না গেছে! মন খালি কাঁদছে। সব যেন পাচ্ছি না তোমার কাছ থেকে। এতদিন এমন করে নষ্ট না হলে, যেমন ভাবে যতখানি পেতাম, তেমন করে ততখানি বোধহয় পাওয়া যাবে না।'

বিকাশ ওকে আদর করে বলল, 'চিরদিনই তো অমনি খুঁতখুঁতে! ফাউন্টেন পেন কিনে দিলাম উষাকে আর তোমাকে। খুঁতখুঁত করলে উষার মতো সুন্দর নয়। সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেলাম, উষা এক পাশে বসল, তুমি আর এক পাশে বসলে। ফিরবার সময় খুঁতখুঁত করতে লাগলে, ও-পাশটায় বসলে ভালো দেখতে পেতাম। তোমার ভারি হিংসে ছিল তো উষার উপর।'

অরুণা বলল, 'ও আমাকে দেখতে পারত না। ইচ্ছে করে আমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে অন্যের সঙ্গে ভাব করত। আমরা গরীব বলে ঘেন্না করত। ভারি অহঙ্কারী মেয়ে তো!'

আরও নানা জায়গা ঘুরল ওরা।

অরুণা বলল, 'ঘোরাঘুরি অত ভালো লাগছে না। হোটেল আর হোটেল! ফিরে গিয়ে থিতি-বিতি হয়ে বসা যাক। রাতদিন নাড়া-চাড়া করলে ভালোবাসা দানা বাঁধবে না।'

বিকাশ বলল, 'এক হয়ে মিশে থাকাই তো ভালো।'

অরুণা রহস্যময় স্বরে বলল, 'কতকটা মিশে থাকা, কতকটা দানা

বাঁধা—এই চাই আমি।' বলে ওর চোখের উপর চোখ রেখে তাকিয়ে রইল। বিকাশ বুঝল ওর মনের কথা। হেসে গাল টিপে দিয়ে বলল, 'বুঝেছি।'

ফিরে এসে এখানে স্থির হয়ে বসল ওরা।

কমলবাবুর স্ত্রী সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন। 'খুব প্রোপাগান্ডা করছে ভদ্রলোক তার জন্য। বিকাশের রোগী আসছে চারদিকের গ্রাম থেকে। রোজগার হচ্ছে কিছু-কিছু। আশ্রমের ও-পাশের বড় গ্রামটির নাম রাম-গোবিন্দপুর। ওখানে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ধনী-পরিবারে কয়েকটি কঠিন রোগী সারিয়েছে বিকাশ। ওখানে খুব সুনাম হয়েছে। তা ছাড়া দরিদ্র রোগীদের বিকাশ বিনা পয়সায় দেখে, চিকিৎসা করে। গরীবদের মধ্যেও খুব নাম হয়েছে তার।

সংসারের কাঠামোটা তৈরি করে নিয়েছে অরুণা। নতুন বাড়িতে স্থায়ী হয়ে বসলে পাকা-পোক্ত করে গড়ে তুলবে। ক্ষুদুর মা ও ক্ষুদু চলে গেছে জমিদার ও জমিদার-গৃহিণীদের সঙ্গে। ভিত্তি-স্থাপনের সময় ওঁরা যখন এসেছিলেন। যাবার সময় ক্ষুদুর মা কান্নাকাটি করে-ছিল। দেখিয়ে নয় সত্যি। অরুণাকে সত্যি স্নেহ করত। যাবার সময় বলে গেল—কিছু মনে করিসনে, দিদি! যেখানে থাকি, আশীর্বাদ করব। ছেলে-মেয়ে হবার সময়ে নিশ্চয় খবর দিবি। এসে থেকে যাব দু-মাস।

স্বামীজী লোকজন যোগাড় করে দিয়েছেন। একজন ব্রাহ্মণ—রান্না করবার জন্য। একজন বয়স্ক চাকর রাখা হয়েছে। কানাই তো আছেই। কানাইয়ের মা ঝিয়ের কাজ করছে।

অরুণা রাগ করে, 'এত খরচ, রোজগার নেই।'

বিকাশ বলে, 'টাকা ফুরোলেই বোলো—ধার করে নিয়ে আসব।'

তহবিল এখন অরুণার হাতে। সংসারের ব্যবস্থা ওর হাতে। ওই সংসারের কর্ত্রী। মুখ-চোখ ঘুরিয়ে বিকাশকে ধমক দেয়। বিকাশ ঠাট্টা করলে অরুণা থমথমে গম্ভীর-মুখে বলে, 'দেখ, চাকর-বাকরদের সামনে হালকা করে দিও না। ওরা মানবে না তাহলে।'

কথা বলতে-বলতে হঠাৎ চমকে যায় অরুণা। থমকে যায়। সত্যি তো, না স্বপ্ন! এখুনি স্বপ্নের ঘোর কেটে গিয়ে দেখবে হয়তো—যা ছিল তাই! কোনোদিন হয়তো নিচে কাজ করছে হঠাৎ উপরে গিয়ে বিকাশের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়, গায়ে হাত দেয়, মুখে হাত দেয়, বুকে মাথা রেখে বুকের শব্দ শোনে।

বিকাশ হাসে, বলে, 'পাগল হয়ে যাচ্ছ নাকি?'

অরুণা বলে, 'কি জানো? আমার সব সময়ে সন্দেহ হয়—স্বপ্ন দেখছি না তো? তুমি শুধু ছবি না তো?'

বিকাশ উঠে দাঁড়িয়ে ওকে দু-হাতে পাঁজা-কোলা করে তুলে একেবারে বুকের কাছে—দোলা দেয় প্রবলভাবে! তারপর নামিয়ে দিয়ে গালটা টিপে দেয় সজোরে।

অরুণা আদরে গলে গিয়ে কৃত্রিম যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'উঃ!' তর্জন করে বলে, 'কি যে আদর তোমার! আমি বলে সহ্য করি। অন্য মেয়ে হলে পারত না।'

অপরিসীম সুখে চোখে জল আসে তার।

দু-একদিন রাত্রে বিকাশ বেরিয়ে যায় কোনো দূর গ্রামে রোগী দেখতে। কানাই থাকে কাছে। তবু ভয় হয়। মনে হয়, সোমনাথ যদি কাছে এসে দাঁড়ায়, মিনতি করে—একবারটি এস আমার কাছে। পায়ে ধরে কেঁদে বলতে থাকে—আর একা থাকতে পারছি না। এস আমার কাছে। ওর কান্না-ভরা কণ্ঠস্বর এই থমথমে ঘরে ও স্পষ্ট শুনতে পায় যেন। ভয়ে সর্বদেহ ঠাণ্ডা হয়ে আসে ওর। কানাইকে ডেকে বলে, 'কানাই!'

কানাই বলে, 'কি বলছ মা?'

'একটা গল্প বল্ না।'

'গল্প তো জানি না। আপনি বলুন বরং।'

'শোন্ তবে'—কানাইকে গল্প বলতে বসে।

কোনো-কোনোদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় ওর। মনে হয় কে যেন কাছে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। তার তৃষ্ণার্ত

দৃষ্টি প্রখর সূর্যকিরণের মতো ওর জীবনের স্বল্প রস-সঞ্চয়টুকু শুষে নিচ্ছে। বুকটা আবার ওর শুকিয়ে যাচ্ছে, খালি হয়ে যাচ্ছে। বিকাশের কাছে ঘেঁষে ডাকে, 'শুনছ?' বিকাশ নিদ্রাজড়িত স্বরে বলে, 'কি বলছ?' অরুণা বলে, 'আমাকে ভালো করে জড়িয়ে ধর না—' বলে নিজেই ওর বুকে মুখ গুঁজে দেয়।

জীবন চলছে এমনি করে। অরুণা ভাবে—চলুক, যতদিন চলে। এ-বাড়ি ছেড়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। নতুন পরিবেশে জীবনের সব পূর্ব-সঞ্চিত গ্লানি, ক্লেদ, ধুয়ে যাবে। নতুন, পরিচ্ছন্ন, আনন্দোজ্জ্বল জীবনের শুরু হবে; চলতে থাকবে বহুদিন ধরে। তারপর আসবে, ছেলে-মেয়েদের কচি কণ্ঠের কলধ্বনি-মুখর, প্রত্যাশা-ভরা জীবন।

সন্তানের জন্য প্রাণটা আকুল হয়ে ওঠে অরুণার। সুতীব্র পিপাসা। কবে আসবে? বিকাশকে জিগগেস করতে লজ্জা করে। কি ভাববে? একটি ননীর মতো নরম, হাসি-কান্না জড়ানো শিশু-বিকাশকে বুকের মধ্যে ধরবার জন্য ওর মাতৃত্ব উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় দিন গুণতে থাকে।

[১৮]

বিকেলে বিকাশ বেরিয়ে গিয়েছিল পাশের গ্রামে একটা রোগী দেখতে। রোগীটি নতুন এসেছে তার হাতে। জটিল রোগ। ছোট-বড় অনেক ডাক্তারের হাত ফিরে তার হাতে পেঁছেছে। ভালো করতে পারলে এখানে তার প্রতিষ্ঠা আরও দৃঢ় হয়ে উঠবে। যত্ন করে চিকিৎসা করছে।

অরুণা শুয়ে-শুয়ে একটা বই পড়ছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন। কানাই এসে ডাকতেই ঘুম ভাঙল। কানাই বলল, 'মোটর গাড়ি করে একটা লোক এসেছে।'

অরুণা বলল, 'কে, চিনিসনে?'

কানাই বলল, 'না, এই চিঠিটা দিল।'

চিঠিটা নিয়ে অরুণা বলল, 'যা বলে দে গিয়ে বাবু বাড়িতে নেই।'

খোলা খামে চিঠি। চিঠিটা বার করে পড়ল অরুণা।

'দাদামণি — আজ প্রায় দু-মাস এসেছ। প্রতিদিন আশা করছি, দেখা দিতে আসবে। হতাশ হয়ে আমিই এসেছি দেখা করতে। জমিদারের বাংলো-বাড়িতে উঠেছি। উনিও সঙ্গে এসেছেন। তুমিও পত্রপাঠ চলে এস। অরুণাকেও এনো। — স্নেহের উষা।'

কানাই তখনো দাঁড়িয়েছিল। অরুণা জিগগেস করল, 'গাড়িতে কেউ আছে নাকি?'

কানাই বলল, 'ড্রাইভারবাবু শুধু আছেন, বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

'চল, দেখি,' বলে নিচে নেমে এসে অরুণা দেখল একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েসের যুবক দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই সসম্ভ্রমে নমস্কার করল।

অরুণা বলল, 'আপনি চিঠি নিয়ে এসেছেন?'

যুবক সবিনয়ে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

অরুণা বলল, 'বলে দেবেন উনি ডাকে বেরিয়ে গেছেন। ফিরে এসে যাবেন।'

নমস্কার করে চলে গেল যুবকটি।

অরুণা ফিরে এসে ইজি-চেয়ারে বসে পড়ল। উষা যে একদিন

আসবে, অরুণা আশা করেছিল। তাদের বিয়ের কথা শুনেছে; এত কাছে থেকেও তাদের আমন্ত্রণ করা হয়নি। অভিমান করেছে খুব। অভিমান করাও স্বাভাবিক। অথচ দোষ তাদের কিছুই নেই। বিধবা-বিবাহ আইন-সঙ্গত হলেও সামাজিক মন ও মতের সমর্থন পায়নি। হিন্দু-সমাজের পুরুষ ও মেয়েরা, এমন কি যারা শিক্ষিত ও প্রগতি-সম্পন্ন তারাও, বিধবা-বিবাহ বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে সমর্থন করলেও হৃদয় দিয়ে সমর্থন করে না। পুনর্বিবাহিতা বিধবা দেখলে নাসিকা কুঞ্চিত করে। তা ছাড়া উষাদের পরিবার শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হলে কি হবে, অত্যন্ত গোঁড়া। কাজেই উষা যদি আগেই বিয়ের কথা জানতে পারত তাহলে যথাসাধ্য বাধা দিতে চেষ্টা করত। নির্মলবাবুর কাছে সে তাদের বিয়ের কথা শুনেছে অথচ এ-চিঠিতে তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। তাকেও অরুণা বলেছে। বৌদিদি বলেনি। কাজেই তাদের বিয়ে সে মনে বা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।

এর মধ্যে ওদের দু-বোনের পরামর্শ হয়ে গেছে বোধহয়। দু-বোনের কেউই ছোটবেলা থেকে তাকে দেখতে পারে না। বিকাশ তাকে স্নেহ করে বলে ঈর্ষা করে। তাদের ভাইকে ডাইনীর কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য দু-বোনে মিলে নিশ্চয় একটা কর্মপন্থা স্থির করেছে। সেইজন্যই উষার আসতে দেরি হল। অস্ত্রে শান দিচ্ছিল বসে-বসে। বেশ করে প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধে নেমেছে। সে যদি উষার কাছে হার মানে, তাহলে সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে তাকে আবার আগেকার মতো ভিখারিণী সাজতে হবে। তা সে কিছুতেই হতে রাজী নয়। স্বামীকে যদি সে সামলে রাখতে না পারে, তাহলে তার বিয়ে করা উচিত হয়নি।

বিকাশ ফিরে এল। চিন্তিত-মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল অরুণা। ওকে দেখে বিকাশ বলল, 'কি এত ভাবছ?'

অরুণা গম্ভীর-মুখে বলল, 'একটা চিঠি এসেছে; টেবিলের উপরে দেখগে—'

বিকাশ শঙ্কিত হয়ে উঠে বলল, 'কি চিঠি? কার চিঠি?'

তিন পায়ে ঘরে ঢুকে, টেবিলের কাছে গিয়ে চিঠিটা পড়ে নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ওঃ! উষারা এসেছে। তাতে কি হবে?'

অরুণা ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল, 'কি হবে? এতদিন আছ খবর নাওনি,

বিয়েতে খবর দাওনি। তা ছাড়া একটা বিধবাকে বিয়ে করে বসে আছ।'

'নির্মল তো সব জেনে গিয়েছিল। তার কাছেই তো জানতে পেরেছে। তা ছাড়া যাকে বিয়ে করেছি—সে সধবা না বিধবা, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অধিকার কারও নেই—না দিদির, না উষার।'

অরুণা বলল, 'এখন তো বক্তৃতা দিচ্ছ, তখন চুপ করে থাকবে। সব ঝক্কি আমাকে পোয়াতে হবে।'

'কিছু হবে না। নির্মল সঙ্গে আছে। তার কাছে উষা মুখ খুলতে সাহস করবে না। তা ছাড়া দু-চার কথা যদি শোনায়, সহ্য করবে। ননদরা বৌদিদের কবে মিষ্টি কথা বলে!'

'বৌদি বলে স্বীকার করলে কড়া কথা কেন, মারলেও কিছু বলব না।' বলল অরুণা।

সন্ধ্যের পর ওরা রওয়ানা হল। অরুণা নেহাত শাদাসিধে শাড়ি পরল। বিকাশের শাদা শালটা জড়িয়ে নিল। সীমন্তে সিঁদুর-রেখা আরও স্পষ্ট ও স্থূল করে আঁকল। কপালে সিঁদুরের টিপ পরল।

বিকাশ পরেই ছিল গরম স্যুট, যোগ-বিয়োগ করল না কিছু।

পৌঁছতেই নির্মলের পিয়ন ছুটে এল, বলল, 'আসুন, সাহেব একটু বেরোলেন। আসছেন এখুনি।'

শ্লেষের স্বরে বিকাশ বলল, 'মেমসাহেব?'

'বাড়িতেই আছেন,' বলতে না বলতেই উষা এসে হাজির হল।

দীর্ঘাঙ্গী, ফরসা রঙ, ভারিক্কি মুখ, চোখে চশমা। অরুণার দিকে তাকালই না। বিকাশকে প্রণাম করল। বিকাশ বলল, 'বৌদিকে প্রণাম কর।'

'করছি,' বলে উষা অরুণাকে প্রণাম করবার উপক্রম করতেই অরুণা 'থাক, থাক,' বলে নিষেধ করল।

উষা প্রণাম সেরে নীরস স্বরে বলল, 'খুব কাহিল হয়ে গেছ, চেহারা বিশ্রী হয়ে গেছে, চেনা যায় না।'

বিকাশ বলল, 'তোরও তো শরীর খুব "বেশ" আছে বলে মনে হচ্ছে না। এ অবস্থায় এত দূর বেড়াতে আসা উচিত হয়নি।'

উষা হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'কি করব! বোন যে। বোনকে ভাই অবহেলা করতে পারে, কিন্তু বোন ভাই-ভাই করে মরে যায়। না হলে

দু-মাস এসেছ, একদিন এক ঘণ্টার জন্যও গিয়ে দেখে আসতে পারনি!' অরুণাকে বলল, 'তোমার জোর করে পাঠানো উচিত ছিল। পুরুষদের উচিত-অনুচিত খেয়াল না থাকতে পারে কিন্তু মেয়েদের থাকা উচিত।'

একতলা বাড়ি। খান পাঁচেক ঘর। সামনে চওড়া বারান্দা। বাড়ির সামনে অনেকটা জায়গা। মাঝখানে চওড়া কাঁকর-বিছানো রাস্তা। এক পাশে টেনিস খেলার মাঠ। বাড়ির ভিতরেও চওড়া বারান্দা। এখানেও সামনে অনেকখানি জায়গা। এক পাশে রান্নাঘর। অন্যদিকে কুয়ো, স্নানের ঘর, ইত্যাদি।

বিকাশ ও অরুণাকে ভিতরের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বসাল উষা। তিনটি চেয়ারে তিনজনে বসল।

নির্মল এল। 'এসেছেন', বলে আনন্দ প্রকাশ করল। অরুণাকে প্রণাম করতে যেতেই সে লাফিয়ে উঠে বলল, 'ও কি করছেন?'

নির্মল বলল, 'লাফাবেন না, প্রণাম নিন দেখি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।' প্রণাম করে বলল, 'আপনি বৌদিদি, দাদার উপরে স্থান আপনার, আপনাকে দুবার প্রণাম করা উচিত।'

উষা মুখটা গোমড়া করে বসে থেকে যে গুমোট আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল, নির্মলের হাশি-খুশি ভাব, সরল, সহজ, অকৃত্রিম আপ্যায়ন, এক মুহূর্তে তা দূর করে খোলা হাওয়া এনে ফেলল। অরুণা বিকাশ আরামের নিঃশ্বাস ফেলল।

'গণেশ!' হাঁকল নির্মল। গণেশ পিয়নটির নাম। 'হুজুর' বলে ছুটে এল সে। নির্মল বলল, 'মামাবাবু, মামীমাকে চা খাওয়াও।' ছুটেই চলে গেল গণেশ।

নির্মল বলল, 'খুব নাম করছিলেন কমলবাবু। ওঁর স্ত্রীকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। বলছিলেন, এত কম বয়েসে এত ভালো ডাক্তার দেখা যায় না। শৈলেনও খুব নাম করছিল। ওব ছেলেটি আপনার চিকিৎসায় সেরেছে। এখানকার দারোগা প্রভাতবাবু সেদিন গিয়েছিল আমার কাছে। সেও আপনার খুব ভক্ত হয়ে উঠেছে। ওর মেয়েটি নাকি অনেকদিন ধরে ভুগছিল। আপনার চিকিৎসায় অনেকটা ভালো হয়ে উঠেছে।'

উষা মুখ টিপে হেসে বলল, 'সাত-আট বছর বিলেতে থেকে ফিরে এসে এই পাড়াগাঁয়েই বসে গেলে!'

নির্মল বলল, 'দোষ কি! হাসপাতালের সি.এম.ও. হলে নেহাত গেঁয়ো ডাক্তার হবেন না। রায়বাহাদুর হাজার টাকা পর্যন্ত মাইনে দিতে প্রস্তুত।'

'তা বলে দিল্লীর চাকরি আর এই তেপান্তর মাঠের মধ্যে চাকরি এক হল?' ধারাল স্বরে বলল উষা।

নির্মল বলল, 'মাঠ হলেও বৌদি পাশে থাকবেন তো। রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে চোদ্দ বছর বনে কাটিয়েছিলেন।'

তীক্ষ্ম কণ্ঠে উষা বলল, 'পরকে উপদেশ দেওয়া সোজা! তুমি কদিন এখানে কাটাতে পার শুনি?'

নির্মল কথার জবাব না-দিয়ে সিগারেট ধরাল, বিকাশকে একটা দিয়ে ধরিয়ে দিল। অরুণা চুপ করে বসেছিল। উষার যুদ্ধং দেহি ভাব দেখে ভাবছিল, ভাগ্যে ওকে কিছু জানানো হয়নি।

কিছুক্ষণ পরে বিকাশ উষার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পুষি বেরালের মতো মুখ হাঁড়ি করে বসে আছিস কেন, বল্ দেখি?'

উষা ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমি কোনো কথা বলতে গেলেই যত দোষ। কিছু বলব না। যে যা পারে করুক। আমি কিছুতেই থাকব না।'

'তা থাকিস না। চা খাওয়াবি তো?'

নির্মল হাঁক দিল, 'গণেশ!' সাড়া দিল গণেশ, 'হুজুর!'

'দেখ দেখি ঠাকুর চায়ের কতদূর করল।'

বারান্দার অন্য প্রান্তে একটি মেয়ের আবির্ভাব ঘটল। বয়স একুশ-বাইশ। মাঝারি আঁট-সাট গঠন। রঙ খুব ফরসা নয়। কচি ধানের পাতার মতো রঙ। মুখখানি অনিন্দ্য-সুন্দর, চোখ পড়লে নড়তে চায় না। ছোট কপালটি ঘিরে কোঁকড়া চুলগুলি বঙ্কিম রেখায় বিন্যস্ত। সুন্দর চোখ দুটিতে ও পাতলা ঠোঁটে একটি মিষ্টি হাসি চিকমিক করছে। সুঠাম, সুন্দর দেহখানি। রজনীগন্ধার মঞ্জরীর মতো ঋজু ও নমনীয়। স্বাস্থ্য-প্রাচুর্যে ওর সারা দেহ কানায়-কানায় ভরে উঠেছে। প্রাণ-প্রাচুর্যে ওর প্রতি অঙ্গ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পরেছে একখানি কালো-পাড় ফিকে বাসন্তী রঙের শাড়ি—আধুনিক কায়দায়। মাথার কোঁকড়া খাটো চুলের রাশ কাঁধে-পিঠে এসে লুটিয়ে পড়েছে। হঠাৎ চোখ পড়ল বিকাশের।

বিস্ময়ের চমক লাগল ওর দেহে, ওর কণ্ঠস্বরে। বলে উঠল, 'আরে শীলা যে!' অরুণাও ওর কথা শুনে সামনে তাকিয়ে শীলাকে দেখতে পেল। তার মুখে-চোখে ফুটে উঠল জিজ্ঞাসা—এ কি সেই?

বিকাশের সঙ্গে চোখাচোখী হতেই শীলা হাসল। হাসতেই ওর চোখ দুটি কুঁচকে ছোট হল, দুটি গালে দুটি সুন্দর টোল পড়ল। এগিয়ে এসে বিকাশকে প্রণাম করল। একে-একে পর-পর নির্মল, অরুণা ও উষাকে প্রণাম করল। অরুণা ও শীলার পরিচয় করিয়ে দিল বিকাশ। অরুণার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শ্রীমতী অরুণা রায়, মানে—'

শীলা হেসে বলল, 'বুঝেছি।'

শীলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শ্রীমতী শীলা বোস।'

'মানে—' অরুণা হেসে বলল, 'বুঝেছি।'

শীলা চেয়ারটা টেনে অরুণা ও উষার মাঝখানে বসল। বিকাশ বলল, 'তোমার পরীক্ষার ফল জানা গেছে?'

শীলা বলল, 'হ্যাঁ।'

উষা বলল, 'ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে।'

বিকাশ বলল, 'তাই নাকি? কনগ্র্যাচুলেট করছি। এর পর?'

'দেখা যাক,' বলে ম্লান হাসল শীলা।

উষা বলল, 'বিলেত যাবে, ডাক্তারী পড়বে।'

সকৌতুকে বিকাশ বলল, 'তাই নাকি!'

শীলা বলল, 'বাবা তাই বলছেন।'

'কেমন আছেন তোমার বাবা?'

'শরীর ভালো নয়। খুব কাজের চাপ পড়েছিল। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছেন। দিনকতক বিলেতে ঘুরে আসতে যাবেন। আমিও সঙ্গ নেব ভাবছি।'

বিকাশ জিগগেস করল, 'এখানে কদিন আছ?'

'বেশিদিন নয়। কলকাতার আস্তানা গুটিয়ে দিল্লী চলে যাচ্ছি তো, সকলের সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছি। শুনলাম আপনারা এখানে রয়েছেন। ভাবলাম—দেখা করে যাই। বিলেতে চলে যাই তো আবার কবে দেখা হবে ঠিক কি?' শেষ দিকে কণ্ঠস্বরে একটু অশ্রুর জড়িমা লাগল। সবলে দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলল শীলা।

নির্মল বলল, 'শীলাদেবীর বিদায় উপলক্ষে কাল রাত্রে একটা প্রীতি-ভোজের আয়োজন করব ভাবছি। দাদা, বৌদিদি কাল রাত্রে কি আমাদের এখানে পায়ের ধুলো দিতে পারবেন?'

গণেশ এসে বলল, 'কমলবাবু আর শৈলেনবাবু এসেছেন।'

বিকাশ ও নির্মল দুজনে উঠে বাইরে চলে গেল।

এখানে রইল উষা, শীলা ও অরুণা। অরুণার নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হতে লাগল। একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। বুঝতে পারল—ও-পাশ থেকে শীলা তার দিকে দৃষ্টি উঁচিয়ে রয়েছে। উষার দিকে এক নজর তাকিয়ে ওর মুখের চেহারা দেখে বুঝল—সে মনে-মনে তার মুণ্ডপাত করছে। উঠে চলে যাবার ইচ্ছাকে সে সবলে দমন করল।

ঠাকুর চা নিয়ে এল পেতলের পরাতে করে। অরুণা বলল, 'চা খাইনে।'

উষা বলল, 'আগে তো খেতে, বিধবা হবার পর ছেড়ে দিয়েছিলে বুঝি?'

রাগে, অপমানে অরুণার মুখ কঠিন হয়ে উঠল। জবাব দিল না।

ওরা চা খেতে লাগল। শীলা অরুণাকে বলল, 'আপনার কি কোনো শক্ত অসুখ হয়েছিল? চেহারা দেখে তাই মনে হচ্ছে।'

অরুণা বলল, 'শারীরিক না হোক, মানসিক তো বটেই। উনি তো আপনাকে সব জানিয়েছিলেন।'

'উনি!' বলে শ্লেষের হাসি হাসল উষা।

কঠিন উত্তর এল অরুণার মুখে, চেপে গেল।

শীলা বলল, 'অনেক দুঃখ পেয়েছেন। তবু আপনাকে ভাগ্যবতী বলব। দুঃখের পর সুখের মুখ দেখলেন। এ-সুখ বড় মধুর। অনেকের জীবনে সুখ আর আসেই না, দুঃখেই জীবন কেটে যায়—' সন্তর্পণে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল শীলা।

একটু পরে শীলা উঠে গেল।

উষা বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

শীলা বলল, 'বাবাকে একটা চিঠি লিখতে হবে।'

ও-পাশের বারান্দায় বিকাশ, নির্মল, কমলবাবু ও শৈলেনবাবু গল্প

করছিলেন। শীলার ঘরটি বারান্দার কাছেই। সেখান থেকে বিকাশকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। নিজের বিছানায় বসে শীলা বিকাশকে যেন দু-চোখ দিয়ে গিলতে লাগল।

শীলা চলে যেতেই উষা বলল, 'অরুণা, তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে।'

অরুণা বলল, 'বাড়িতে ডেকে এনে সেটা না করাই ভদ্রতা-সঙ্গত হবে।'

উষা তীক্ষ্নস্বরে বলল, 'তোমার সঙ্গে ভদ্রতা বাঁচিয়ে চলার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে। যে আমার একমাত্র ভাইকে ভুলিয়ে তার সর্বনাশ করেছে—'

অরুণা প্রতিবাদ করল, 'আমি ভোলাতে যাইনি, তোমার ভায়ের সর্বনাশও হয়নি, জিগগেস করে দেখ তোমার ভাইকে।'

'সর্বনাশ হয়নি! আত্মীয়স্বজন তাকে ত্যাগ করেছে, সমাজে স্থান নেই। শীলার মতো একটি মেয়ে হাতছাড়া হয়ে গেছে। জানো শীলা কে? কলকাতার বোস পরিবারের নাম শুনেছ? সেই পরিবারের মেয়ে! মস্ত বড়লোক ওরা। কলকাতায় মস্ত বাড়ি। লাখ টাকার উপর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স। তার উপরে ওর বাবা আই.এম.এস. অফিসার। মাসে দু-হাজার টাকা মাইনে পান। বাপের একমাত্র মেয়ে শীলা। শীলাকে বিয়ে করলে দাদা ওর বাবার কলকাতার বাড়ি ও ব্যাঙ্কের সব টাকা পেত। তা ছাড়া মা মরবার আগে শীলাকে দাদার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন ওকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করিসনে।'

অরুণা বলল, 'তোমার দাদার সঙ্গে বোঝাপড়া করগে ভাই, আমার সঙ্গে ঝগড়া করছ কেন?'

উষা বলল, 'দাদা তো চিরদিনই অমনি। তোমার উপর ওর চিরদিনই দুর্বলতা। তোমার একটু দুঃখ দেখলে ও নেতিয়ে পড়ে। তাহলেও তোমার ওকে বোঝানো উচিত ছিল। নিজের সুবিধে না দেখে ওর সুবিধাটা দেখা উচিত ছিল।'

অরুণা বলল, 'আমি তো বার-বার নিষেধ করেছিলাম।'

উষা ধমকের সুরে বলল, 'বাজে বোকো না অরুণা। তুমি যদি শক্ত হয়ে থাকতে, দাদা জোর করে তোমাকে বিয়ে করতে পারত না। তুমি যদি

দু-চারটে কড়া কথা শুনিয়ে দিতে, দাদা যা অভিমানী—পালিয়ে যেত তোমার কাছ ছেড়ে।'

অরুণা চুপ করে রইল। মনে পড়ল বিকাশ চলে যেতেই চেয়েছিল, সেই যেতে দেয়নি।

উষা বলতে লাগল, 'তা ছাড়া তুমি হিন্দুর মেয়ে। স্বামী যেমনই হোক তাকে জোর করে শ্রদ্ধা করা, ভালোবাসা উচিত ছিল। সোমনাথবাবুর মতো স্বামীকে ভালোবাসতে পারলে না? তিনি কত করেছিলেন তোমাদের জন্য। প্রাণ পর্যন্ত দিতে পিছ-পা হননি। সব তো শুনেছি। অথচ তুমি নাকি একদিন হেসে কথা বলনি, স্বামী বলে স্বীকার করনি। মনের দুঃখে বেচারা আত্মহত্যা করলেন শেষে! এই অকৃতজ্ঞতার পাপ কি এমনিই যাবে? এর কোনো শাস্তি হবে না? তুমি যতই সুখের জন্য চেষ্টা কর, সুখ পাবে না কিছুতেই। সোমনাথবাবু যত দুঃখ পেয়েছেন তোমার কাছে, সব জমে আছে। জমাট কালো হয়ে উঠেছে, হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড়ের মতো নেমে এসে তোমার সুখের ঘর লণ্ডভণ্ড করে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে।'

অরুণা আর্তস্বরে বলে উঠল, 'চুপ কর উষা! যথেষ্ট হয়েছে, আর সহ্য করতে পারছি না। দয়া করে ওঁকে খবর দাও। আমি আর এক মিনিট বসতে পারছি না।'

গণেশ এসে বলল, 'ডাক্তারবাবু আপনাকে ডাকছেন।'

অরুণা উঠে চলে গেল। একটা বিদায় সম্ভাষণও জানিয়ে গেল না।

রাস্তায় গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে বিকাশ। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে নির্মল, শৈলেন ও কমলবাবু। শীলাও একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অরুণাকে দেখে শীলা এগিয়ে এসে বলল, 'বৌদি, কাল নেমন্তন্ন রইল। সকাল-সকাল আসবেন কিন্তু।'

বিকাশ গাড়ি চালাতে লাগল। অত্যন্ত অন্যমনস্ক। বারান্দা থেকে শীলাকে দেখতে পেয়েছিল। ওর তৃষ্ণার্ত দৃষ্টির স্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করছিল। ওর চোখ দুটি যেন দুটি গবাক্ষের মতো ওর অন্তরের সীমাহীন অন্ধকারকে তার মানস-চক্ষুর সামনে প্রকট করছিল।

পিছনে অরুণা ক্লান্ত অবসন্নভাবে বসেছিল। তার দু-চোখ থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

পরদিন সকালে বিকাশ বন্দুকটা পরিষ্কার করছিল। পরনে পাজামা ও গেঞ্জি। মাটিতে উবু হয়ে বসে বন্দুকের নলে চোখ লাগিয়ে দেখছিল।

অরুণা এল। মুখ শুকনো, চুল বিশৃঙ্খল। কাছে এসে দাঁড়াল। একটুখানি দেখে বলল, 'বন্দুকটা নিয়ে কি হচ্ছে?'

বিকাশ বলল, 'পরিষ্কার করছি।'

'হঠাৎ বন্দুক পরিষ্কার করছ কেন?'

'শিকার করতে যাব। কমলবাবু বলেছে।'

অরুণা বলে উঠল, 'না, না, ওসব করতে হবে না। কি বিপদ বাধিয়ে বসবে তার ঠিক নেই।'

বিকাশ বলল, 'আমার মতো শিকারীর স্ত্রীর কথা হল না তো?'

'স্ত্রী!' অরুণার কানে অমৃত বর্ষণ করল কথাটা। 'উনি' বলেছিল বলে উষা কাল ঠোক্কর মেরেছিল। আজ তার দাদা কি বলছে—ও নিজের কানে শুনে গেলে ভালো হত।

অরুণা বলল, 'তুমি আবার শিকারী হলে কখন? দাদা ছিল বরং।'

'তোমার দাদা আমারই সাকরেদ ছিল। বাবার বন্দুক লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে আমিই শিখিয়েছিলাম ওকে।' একটু থেমে বলল, 'নির্মলের হাত নাকি খুব ভালো—কমলবাবু বলছিল।'

হঠাৎ গাড়ির শব্দ শোনা গেল। অরুণা সন্ত্রস্ত-স্বরে বলল, 'ঐ ওরা এসে পড়ল। আমি যাব না, বলে দিও।'

বিকাশ বলল, 'যা বলবার নিজের মুখেই বোলো—আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছ কেন?'

অরুণা বলল, 'মানে? আজও কি বোনকে দিয়ে অপমান করাতে চাও নাকি? কাল সাধ মেটেনি!' কণ্ঠে কলহের সুর বাজল, চোখে চমকাল বিদ্যুত।

বিকাশ বলল, 'বৌদের কত সহ্য করতে হয়! আগে শুনেছি, ননদরা বৌদের ধরে পিটতো।'

অরুণা বলল, 'আমি পারব না সহ্য করতে ওর অভিসম্পাত। বলে

কিনা আমার সর্বনাশ হবে, আমার সুখের ঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। পারব না, পারব না—'

গাড়িটা থামল। অরুণা বলল, 'বন্দুকটা রেখে দেখ না—কে-কে এল।'

বিকাশ জানলার কাছে গিয়ে বলল, 'নির্মল আর শীলা।'

'তোমার সেই অহঙ্কারী বোনটি আসেননি তাহলে। বেশ আমি শুয়ে পড়লাম; বোলো কাল রাত থেকে জ্বর হয়েছে—' বলে একটা চাদর নিয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

বিকাশ বলল, 'সদা সত্য কথা বলিবে—ছোটবেলায় পড়েছিলাম। এই সকালবেলাতেই আমাকে দিয়ে মিথ্যে কথা বলাবে?'

অরুণা চাদরের ভিতর থেকেই বলল, 'খুব সত্যবাদী যুধিষ্ঠির তুমি!'

নিচে নির্মলের গলা শোনা গেল, 'দাদা কোথায়?'

বিকাশ সিঁড়ির মুখে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এই যে এখানে। এস।' বলে নিচে নেমে গেল।

বিকাশকে দেখে নির্মল বলল, 'কি করছিলেন?'

বিকাশ বলল, 'বন্দুকটা পরিষ্কার করছিলাম। যদি শিকারে যেতেই হয়।'

নির্মল বলল, 'বৌদি কোথায়?'

'ও শুয়ে রয়েছে। একটু জ্বরের মতো হয়েছিল কাল রাত্রে। সকালে একটু ভালো আছে। তবে খুব দুর্বল।'

শীলা কাছেই দাঁড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। বিকাশ তাকে বলল, 'তুমিও সকালেই বেরিয়ে পড়েছ? উষা এল না?'

নির্মল বলল, 'ওর আবার অনেকটা এগিয়ে এসেছে কিনা। শীলা আসতে চাইলেন বলে ওকে আসতে হল। না হলে মায়ের মত ছিল না।'

ওরা উপরে উঠতে লাগল। বিকাশ বলল, 'খোকা বুঝি ওর মায়ের কাছে থাকে না?'

নির্মল বলল, 'খোকা আমার মায়ের কাছেই থাকে।'

ঘরে এল ওরা। অরুণা পাশ ফিরে শুয়ে আছে। শীলা ঘরে ঢুকল। ঘরটি অবশ্য বেশ বড়। তবে পোড়ো-বাড়ির ঘরের মতো চেহারা। বিকাশ

ও অরুণার সব জিনিসে ঘরটা বোঝাই হয়ে আছে। তার উপরে চেয়ার, টেবিল ও ইজি-চেয়ার ঘরে ঢুকেছে। যে খাটে অরুণা শুয়ে রয়েছে, বিকাশও শোয় যেখানে, তার যা অবস্থা! শীলাদের বাড়ির চাকররাও তার চেয়ে ভালো খাটে শোয়। শয্যাও স্বল্প। এ-ঘরে এভাবে বিকাশের মতো শৌখিন লোক বাস করছে কি করে ভেবে পেল না শীলা। অরুণার জন্যই বিকাশ এত কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করছে ভেবে, মনের মধ্যে ঈর্ষার কাঁটা খচখচ করতে লাগল। তবু মুখখানা যত দূর সম্ভব স্বাভাবিক করে দাঁড়িয়ে রইল।

বিকাশ অরুণাকে ডাক দিল, 'শুনছ? রুনু!'

প্রথম ডাকে ঘুম ভাঙল না। দ্বিতীয় ডাকে চোখ মেলল। ক্লান্ত মিহি গলায় বলল, 'কি বলছ?' বিকাশ বলল, 'কে-কে এসেছে দেখ।' বিহ্বল নয়নে অরুণা তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। ঘুমের ঘোরটা কাটেনি তখনো। বিকাশ বলল, 'নির্মল, শীলা এসেছে।'

অনেক কষ্টে উঠে বসল অরুণা; বলল, 'আসুন, বসুন।'

নির্মল উৎকণ্ঠিত-স্বরে বলল, 'কখন জ্বর হল?'

অরুণা বলল, 'কাল রাত্রে। আপনাদের ওখানেই শরীর খারাপ হয়েছিল। রাত্রে জ্বর এল।'

বিকাশ মনে-মনে অরুণার অভিনয়ের প্রশংসা করতে লাগল।

নির্মল বলল, 'কিন্তু আমরা যে আপনাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।'

অরুণা বিছানা থেকে নেমে বলল, 'বসুন আপনারা।'

নির্মল বলল, 'আমার প্রশ্নটার জবাব দিলেন না তো?'

অরুণা বলল, 'জ্বর নিয়ে তো আমার যাওয়া চলবে না। উনি যাবেন।'

শীলা সমর্থন করল, 'সত্যি! জ্বর নিয়ে কি করে যাবেন?'

অরুণা চলে যাবার উপক্রম করতেই নির্মল বলল, 'জ্বর নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?'

অরুণা বলল, 'আসছি এখুনি।'

নির্মল বলল, 'আমরা চা-টা খেয়ে বেরিয়েছি কিন্তু—'

অরুণা যাওয়ামাত্র বিকাশ বলল, 'শোনো নির্মল, একটা কথা বলে নিই এই সময়ে। কাল রাত্রে উষা ওকে কি-কি সব বলেছে। এসে কান্নাকাটি করতে লাগল; খেল না কিছু; মেজেতে পড়ে রইল। তুলে আনতে

গেলাম, কিছুতেই আসবে না। বলে আমি তো তোমার স্ত্রী নই, কেন শোব তোমার বিছানায়। তারপর ফুলে-ফুলে কান্না। কিছুতেই থামানো যায় না। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অনেক রাত্রে শান্ত করতে পারলাম। এতে জ্বর হওয়া আশ্চর্য কি?'

নির্মলের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। বলল, 'কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারছি না, দাদা! বিয়ে যখন হয়ে গেছে তখন ওঁকে ওঁর ন্যায্য সম্মান দিতেই হবে। তা ছাড়া যে একনিষ্ঠ প্রেমের পরিচয় উনি দিয়েছেন, দাদা, সত্যি বলছি আমি কখনো দেখিনি।'

টেবিলের সামনে বসে একটা বই নিয়ে মাথা নিচু করে পড়ছিল শীলা। বিকাশের প্রতিটি কথা ছুরির ধারাল ফলার মতো ওর মনে গায়ে কেটে-কেটে বসে যাচ্ছিল; ক্ষত স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। অভিমানিনী প্রিয়তমার মানভঙ্গের ইতিহাস ওর প্রত্যাখ্যাত প্রেমকে ধিক্কার দিতে লাগল।

ঠাকুর দুজনের জন্য চা-খাবার নিয়ে এল। বারান্দায় টেবিলে রাখল। পিছনে-পিছনে এল অরুণা, এসে বলল, 'সামান্য কিছু খেতে হবে। দেখছেন তো আমাদের এখানের অব্যবস্থা, তবু পরম আত্মীয় আপনারা—'

নির্মল বলল, 'বড় সুখী হলাম বৌদি যে আত্মীয় বলে স্বীকার করেছেন। সেই অধিকারে আপনাকে একটা অনুরোধ করছি। যদি রাখেন তো কৃতার্থ হব।'

অরুণা বলল, 'কি বলুন?'

নির্মল বলল, 'আপনার ননদটির কথায় যদি কোনো আঘাত পেয়ে থাকেন তো আমি করজোড়ে তার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছি—' বলে হাত জোড় করল।

অরুণা তার হাত দুটি ধরে বলল, 'ছিঃ, ও রকম করে বলবেন না!' বিকাশের দিকে কটাক্ষ হানল, মনে-মনে বলল—কি মানুষ বাপু, বলে দিয়েছে! চিরদিন পেট-আলগা মানুষ! একটা কথা চেপে রাখতে পারে না। নির্মল বলল, 'তাহলে বলুন যাবেন? আমি গলবস্ত্র হয়ে বলছি।'

অরুণা মুচকে হেসে বলল, 'বস্ত্র কই আপনার, যে গলায় দেবেন? সাহেব সেজে কি ওসব বিনয় চলে?'

শীলা বলল, 'উষাদির পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আমার আঁচল আছে, বলেন তো গলায় জড়াতে পারি—'

অরুণা বলল, 'আমার শরীর ভালো থাকে তো নিশ্চয় যাবার চেষ্টা করব। কিন্তু আমাকে খাবার জন্য টানাটানি করবেন না।'

নির্মল বলল, 'তাই হবে। আপনি দয়া করে গেলেই আমরা পরম সৌভাগ্য বলে মানব।'

অরুণা বলল, 'ঠাট্টা করছেন নাকি?'

'বৌদিকে ঠাট্টা করব? আপনার ননদের স্বামী হলেও আমি অতটা কাণ্ডজ্ঞান হারাইনি, বৌদি।'

ওরা বিদায় হলে বিকাশ বলল, 'কি করবে? যাবে?'

অরুণা বলল, 'যা থাকে কপালে, যাব। ঐ মেয়েটির কাছে তোমাকে একলা ছেড়ে দিতে সাহস হচ্ছে না আমার।'

বিকাশ বলল, 'শীলার কাছে তো বছরখানেক কাটালাম। তাতেও তো হারিয়ে যাইনি।' অরুণাকে আদর করে বলল, 'কোনোদিনই আমি হারাব না। তোমার কোনো ভয় নেই, রুনু!'

অরুণা বলল, 'কি জানি! কাল উষার ঐ কথাটা শোনা থেকে কি রকম ভয় হয়ে গেছে—'

বিকেলবেলা চারটেয় বিকাশ চলে গেল। অরুণাকে বলে গেল, 'সন্ধ্যের সময় নির্মল গাড়ি পাঠিয়ে দেবে—প্রস্তুত হয়ে থেক।'

বিকাশ পেঁছুবামাত্র উষা রাগে, অভিমানে, চোখ-মুখ লাল করে, রুষ্ট ও রুষ্ট কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ দাদা, কাল আমি অরুণাকে কি বলেছি যে এত কাণ্ড করেছে! ওঁকে এত কথা শুনিয়েছে!'

বিকাশ বলল, 'ওরে বাপরে! একটু দাঁড়াতে দে। আসবামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়লি যে!'

উষা বলল, 'ঝাঁপিয়ে পড়ব না! মায়ের পেটের ছোট বোন, মা-মরা, দু-মাস এখানে এসেছ একবার দেখা করতে পারলে না?'

বিকাশ বলল, 'ঝগড়ার ভয়ে দেখা করিনি। নমুনা যা দেখাচ্ছিস, তাতেই তো বোঝা যাচ্ছে—'

'ঝগড়া করব না? দিদি কি বলেছেন জানো? তোমার মুখ দেখবেন না আর! তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। মা যাকে তোমার হাতে ধরে দিয়ে গেলেন—রাজলক্ষ্মীর মতো মেয়ে, যার মতো মেয়ে বাঙালীর ঘরে লাখে একটা দেখা যায় না—তাকে ফেলে একটা হ্যাংলা, হিংসুটে, শুঁটকো মেয়ে বিয়ে করলে! তাও কিনা বিধবা! যে মেয়ে অমন মহাদেবের মতো স্বামীর মর্যাদা রাখল না, সে তোমাকেও পাত্তা দেবে না, দেখ। দু-নম্বরে যার বাধেনি, তিন-নম্বরেও তার বাধবে না।'

রাগে লাল হয়ে উঠল বিকাশের মুখ। নির্মল বাড়িতে ছিল না। কাজেই রাগ দমন করল। বলল, 'আমাকে যদি তোরা ত্যাগ করতে চাস তো ডাকছিস কেন? রুনু তো তাই বলছিল, যারা অপমান করে, তাদের বাড়ি না যাওয়াই ভালো।'

উষা ঠোঁট উল্টে বলল, 'বাব্বা! ভারি মানী হয়ে উঠেছে দেখছি! যদি না-জানা থাকত সব ইতিহাস—'

বিকাশ বলল, 'তোর বৌদিদি হয়েছে যখন, তোর তাকে সম্মান করা উচিত। ওকে বিয়ে না করে যদি বিলেত থেকে মেমসাহেব বিয়ে করতাম, তখন কি করতিস? গুড মর্নিং বৌদি, বলে বসাতে পথ পেতিস না যে!'

শীলা আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল বিকাশের সব কথা। ভাই-বোনের ঝগড়ার মধ্যে যাবার ইচ্ছা ছিল না তার। বিকাশের ভারি কণ্ঠস্বর তরঙ্গে-তরঙ্গে এসে ওর বুকে দোলা দিচ্ছিল।

বিকাশ বলল, 'নির্মল কোথায়?'

উষা বলল, 'শৈলেন আর প্রভাতবাবুকে আনতে গেছেন।' কণ্ঠস্বর নিচু পর্দায় নামিয়ে বলল, 'জানো দাদা! শীলা রান্না করছে আজ। সব নিজের হাতে রান্না করবে বলেছে। আশ্চর্য মেয়ে! রান্নাবান্না, গান-বাজনা, সেলাই-ফোঁড়াই, সব বিষয়ে ওস্তাদ! কি যে করলে দাদা! এখন বুঝবে না, পরে বুঝবে। তখন বলবে উষা ঝগড়া করেছিল কেন?'

বিকাশ চলে যেতে উদ্যত হতেই উষা বলল, 'ওকি যাচ্ছ কোথায়?'

বিকাশ বলল, 'দেখি নির্মল কোথায় গেল।'

উষা বলল, 'আসছেন এখুনি, বস তুমি।'

বিকাশ বলল, 'না, যা কড়া-কড়া বক্তৃতা করছিস, সহ্য হচ্ছে না,' বলে চলতে লাগল।

'দাদা শোনো—' ডাকল উষা, 'শুনছ না?' ছুটে গিয়ে হাত ধরল বিকাশের। বলল, 'আমি এত ফেলনা হয়ে গেছি?' বলেই কেঁদে ফেলল।

বিকাশ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'আরে! কাঁদছিস কেন? পাগলী! ঝগড়া করবে, কটু কথা শোনাবে, কিছু বললেই কেঁদে ভাসাবে!'

বিকাশের হাত ছেড়ে দিয়ে দু-হাতে মুখ চেপে কাঁদতে লাগল উষা।

ওকে সাদরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বিকাশ বলল, 'চুপ কর্। নির্মলরা এসে পড়বে এখুনি। কি মনে করবে বল্ দেখি? চল্ আমি বসছি—চা খাওয়াতে হবে কিন্তু এখুনি।' গালটা টিপে দিয়ে বলল, 'উষি, পুষি, পুষ্পমণি, রাক্ষুসী—'

উষা অশ্রু-গাঢ় কণ্ঠে বলতে লাগল, 'দাদা, এইটিই তো আমার পাওনা! কতদিন পাইনি বল দেখি?'

বিকাশ বলল, 'চা নিয়ে আয়, আরও সব পাওনা দেব—কানমলা, চুল টানা, সব এক-এক করে।'

উষা চোখ মুছতে-মুছতে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বলল, 'শীলা চা করতে লেগে গেছে—খুব ভালোবাসে তোমাকে। কাল হঠাৎ ওর ঘরে গিয়ে দেখি, অন্ধকারে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে। বলছিল—ওর বাবার সঙ্গে বিলেত যাবে ডাক্তারী পড়তে। ওখানেই চাকরি-বাকরি করবে। আর ফিরবে না—' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বেচারা!'

বিকাশের মনটাও ভারি হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ও সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাবিসনে। ফিরেও আসবে, বে-থা করে সংসারীও হবে, এখনকার কথা কদাচিৎ মনে পড়বে তখন। এত বড়লোকের একমাত্র মেয়ে, এত রূপ-গুণ, খুব ভালো লোকের সঙ্গেই বিয়ে হবে। তখন, একদিন আমার মতো একটা লোকের জন্য মন খারাপ করেছিল ভেবে মনে-মনে হাসবে।'

উষা বলল, 'তুমি কি যে বল দাদা! মেয়েমানুষের মন চেনো না। অরুণা তোমাকে ভুলতে পেরেছিল?'

'ওর সঙ্গে সকলের তুলনা করিসনে। ও সাধারণ মেয়ে নয়।'

'তোমার কথা শুনলে রাগ হয়, দাদা! বললেই বলবে ঝগড়া করছে, কিন্তু না-বলেও থাকতে পারছি না। কি অসাধারণত্বটা শুনি?'

শীলা এল। এক হাতে চায়ের পেয়ালা ও আর এক হাতে খাবারের প্লেট। উষা একটা ছোট টেবিল এনে সামনে রাখল। চা-খাবার টেবিলে রেখে পাশে দাঁড়াল শীলা। 'জল নিয়ে আসি,' বলে উষা উঠে গেল।

শীলা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মুখখানি আগুনের আঁচে লাল হয়ে গেছে। সারা মুখে একটি বিষাদের করুণ ছায়া। বিকাশ বলল, 'শুনলাম নিজেই সব রান্না করছ।'

শীলা বলল, 'আপনাকে তো আর খাওয়াতে পারব না তাই—' বলে মলিন হাসল। একটু থেমে বলল, 'আপনি কি এখানেই থাকবেন?'

'তাই তো মনে করছি। দিল্লীর চাকরি হলেও নেব না ঠিক করেছি।'

'আমার ভয়ে? আমি তো চলে যাব শিগগির। পাঁচ-সাত বছর ফিরব না। বলেন তো কখনো ফিরব না।' কান্নার ছোঁয়া লাগল কণ্ঠস্বরে।

উষা এল।

বিকাশ বলল, 'কি-কি খাওয়াবে?'

'এখন বলব না। খাবার সময়ই দেখতে পাবেন—' বলেই শীলা চলে গেল। দু-চার কথার মধ্যেই শীলার মানসিক অবস্থার যা আভাস পেল, তাতে বিকাশের মনের মধ্যে একটি ব্যথার সুর বেজে উঠল। ওর সারা মন করুণাতে সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠল—আহা!

উষা এসে বলল, 'কি বলছিল?'

বিকাশ নীরবে খেতে লাগল।

উষা বলল, 'চমৎকার মেয়েটি, দাদা! এত ভালো! এতটুকু অহঙ্কার নেই, দেমাক নেই। অরুণা যে ওর কামনার ধন মুঠো থেকে কেড়ে নিয়েছে, তাতেও অরুণার উপর ওর বিন্দুমাত্র রাগ নেই। একটি রূঢ় কথা বলেনি ওর সম্বন্ধে। অসাধারণ মেয়ে যদি বলতে হয় তো ওকেই, অরুণাকে নয়।'

বিকাশ বলল, 'অরুণা তো বিয়ে করতে চায়নি। আমি নাছোড়বান্দা হয়ে ওকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছি।'

'ভালো করনি, দাদা! ওর অনিচ্ছায় ওকে এই অধর্মের কাজ করিয়েছ তো ফল ভালো হবে না।'

'যা হবার হবে, তুই মুখে বলে দোষী হচ্ছিস কেন?'

খাওয়ার পর বিকাশ বলল, 'হ্যাঁরে! নির্মলের সিগারেট আছে তো? নিয়ে আয়। আচ্ছা লোক! সকাল-সকাল আসতে বলে হাওয়া!'

সিগারেট এনে দিয়ে উষা বলল, 'বললাম যে টেনিস খেলার জন্য শৈলেনবাবুদের আনতে গেছেন।'

শৈলেন ও প্রভাতকে নিয়ে নির্মল এসে পৌঁছুল। বাড়ির মধ্যে এসে নির্মল বলল, 'কতক্ষণ এসেছেন? বৌদি আসেননি?'

'আসবে সন্ধ্যের পর।'

'শরীর কেমন?'

'ভালো নেই। তাহলেও আসবে বলেছে।'

জন দুই লোক টেনিস খেলার আয়োজন করতে লাগল। ঠাকুর পরাতে করে চা-খাবার বাইরে নিয়ে গেল। বিকাশ ও নির্মলও বাইরে গেল। শীলা এসে উষাকে বলল, 'আচ্ছা উষাদি! অরুণাদি কি খাবেন?'

উষা বলল, 'কি করে জানব?'

ঠাকুর রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল। উষা তাকে বলল, 'ঠাকুর! ডাক্তার-বাবুকে ডেকে দাও তো?'

বিকাশ আসতেই শীলা জিগগেস করল, 'অরুণাদি রাত্রে কি খাবেন?'

বিকাশ বলল, 'কিছু খাবে না বোধহয়।'

উষা ফোঁস করে উঠল, 'খাবে না কেন? না খায় তো ওর এসে কাজ নেই।'

বিকাশ বলল, 'বেশ তো! গাড়ি না পাঠালে আসবে না।'

উষা বলল, 'দেখ, দাদা! বৌয়ের হয়ে বোনের সঙ্গে এত লড়াই করা ভালো দেখাচ্ছে না।'

বিকাশ বলল, 'ভালো না দেখালে কি করব? তুই না নেমন্তন্ন করলেও এখানে কিছু খাবে না, আমি বলে দিচ্ছি এখন থেকে। তখন সকলের সামনে কথা কাটাকাটি করে কেলেঙ্কারী বাধাসনে।'

বিকাশ চলে গেল। উষা বলল, 'শুনলে শীলা! দেখলে দাদার কাণ্ড! সেই ছোটবেলা থেকে ঐ মেয়েটার কথায় ওঠে আর বসে। কি যে তুক্ জানে, ভগবান জানেন। না হলে দাদাকে তো এতদিন দেখেছ? কেমন মানুষ! এখন ওর আওতায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখ।'

টেনিস খেলার পর আর একবার চা খাওয়া হচ্ছিল। শীলাও খেলেছে ওদের সঙ্গে। বিকাশের পার্টনার হয়ে। শৈলেন-নির্মল দাঁড়াতে পারেনি ওদের কাছে। শীলা খেলার স্টাইলের জন্য প্রশংসা পেল। বিকাশের খেলার ভূয়সী প্রশংসা করল সবাই। শৈলেন বলল, 'এখনো চমৎকার ফর্‌ম রয়েছে! ধীরেনবাবু আপনার খেলার কথা বলেছিলেন সেদিন, মনে হচ্ছিল, বাড়িয়ে বলছেন। এখন বিশ্বাস হচ্ছে।'

খেলার শেষে পরস্পর পরস্পরকে 'ধন্যবাদ' জ্ঞাপন করবার সময়ে, শীলা চাপা গলায় বলল, 'আমার ভারি আনন্দ হল জানেন। জীবনের খেলায় না হোক, এই খেলায় তো আপনার পার্টনার হতে পেলাম।'

একটু পরে নির্মল বলল, 'বৌদিকে আনাবার ব্যবস্থা করতে হবে। শৈলেন, প্রভাত, তোমরা মুখ-হাত ধুয়ে আসতে চাও তো আমার গাড়ি নিয়ে যাও। আমি দাদার গাড়ি নিয়ে বৌদিকে আনতে যাচ্ছি।' উষাকে নির্মল বলল, 'তুমিও চল। তোমার যাওয়া উচিত।'

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে উষা রাজী হল।

নির্মল বলল, 'অমন মুখ করে থাকবে তো যেও না। যেমন ভাবে পরম আত্মীয়কে লোকে নিমন্ত্রণ করে, তেমনি করে পার তো চল।'

ঝঙ্কার দিয়ে উষা বলল, 'অত হি-হি করে হেসে গড়িয়ে যেতে পারব না আমি। তোমাদের তো বুকে বাঁশ ডলেনি! তোমরা কি বুঝবে — কি যে হচ্ছে আমাদের। দিদির চিঠি পড়েছ তো?'

ওরা বেরিয়ে এল। বিকাশ বারান্দায় বসে সিগারেট টানছিল। বলল, 'কি হে, রাজী করাতে পারলে? দেখ, গিয়েই যেন আবার শুরু করে না দেয়।'

উষা গম্ভীর-মুখে বলল, 'কাণ্ডটি বাধিয়ে দিয়ে এখন বসে মজা দেখবার ভাবনা কি?'

চলে গেল ওরা।

একা বসে রইল বিকাশ। অরুণার জন্য মন কেমন করছিল। বেচারীকে এরা কেউ আমোল দিচ্ছে না। উষা তো প্রকাশ্যে কলহ করছে। নির্মল মুখে যথেষ্ট সৌজন্য দেখাচ্ছে। অন্তরেও হয়তো ওর সহানুভূতি আছে, কিন্তু অরুণার পক্ষে তা মূল্যহীন। কারণ উষার সমর্থন না-থাকলে নির্মলের সহানুভূতি যতই প্রবল হোক, দাঁড়াতে

পারবে না। বড়দিদির দলের প্রত্যেকের ব্যবহার এই রকমই হবে। কাজেই এদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা ছাড়া তার গত্যন্তর থাকবে না। অরুণাকে যারা সম্মান করবে না, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে না। তারা যতই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা বন্ধু হোক। অবশ্য যে কদিন ওরা এখানে থাকবে ততদিন সবই মুখ বুজে সহ্য করবে, অরুণাকেও তাই করতে অনুরোধ করবে। তারপর ওরা চলে গেলে নিজেদের যথাসাধ্য গুটিয়ে রাখবে।

শীলা এল। আঁচলে মুখ মুছতে-মুছতে আসছে। আগুনের আঁচে গিয়ে ঢুকেছিল, মুখ লাল হয়ে গেছে, কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। ঘামে কপালের কুচো চুলগুলি জড়িয়ে গেছে। কাছে এসে বলল, 'একা বসে আছেন যে? ওঁরা দুজন অরুণাদিকে আনতে গেলেন বুঝি?'

বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ। তোমার রান্না হল?'

শীলা বলল, 'পোলাওটা বাকি। ঠাকুরের কিছু-কিছু কাজ বাকি আছে, শেষ হলেই চড়িয়ে দেব।'

'এত রান্না কোথায় শিখলে?'

'বাবার একজন খুব ভালো বাবুর্চি ছিল, তার কাছে।'

'কলকাতায় থাকতে তো রান্না করনি একদিনও।'

'ওখানে সুযোগ পাওয়া যায়নি, সময়ও হয়নি। দিল্লীতে তো আমার হাতেরই রান্না খেতেন।'

বিকাশ চুপ করে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। দিগন্তবিস্তৃত মাঠ জোড়া কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল।

শীলা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। বলল, 'কি এত ভাবছেন?'

বিকাশ বলল, 'ভাবনার কি শেষ আছে? সামনে অকূল সমুদ্র, পাড়ি দিতে হবে। তরী দুর্বল, সহায়-সম্পদ নেই। পরপারে পৌঁছতে পারব, না মাঝ-সমুদ্রে তলিয়ে যাব, ভগবান জানেন।'

শীলা বলল, 'ভগবান আপনাদের মঙ্গলই করবেন—'

বিকাশ বলল, 'অন্তরের সঙ্গে বলছ?' বলে ওর মুখের দিকে তাকাল।

শীলা বলল, 'হ্যাঁ। আপনার অকল্যাণ কি কখনো চাইতে পারি?

যেখানেই থাকি, আপনার কল্যাণ হোক, আপনি সুখী হন, ধনে-মানে খুব বড় হয়ে উঠুন—সব সময়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব।'

বিকাশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার উপর যে অন্যায় করেছি, তার জন্য ক্ষমা চেয়েছি, আবার চাচ্ছি। তোমার বাবার অনুরোধ রাখতে পারিনি। তিনি হয়তো ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁকে বুঝিয়ে বোলো। তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন। আশীর্বাদ করেন।'

একটু চুপ করে থেকে বিকাশ বলল, 'অরুণা বিধবা হবার পর বিয়ে করেছে বলে এরা নিন্দা করছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে অরুণার একবার মাত্র বিয়ে হয়েছে, তা আমারই সঙ্গে। এখন নয়, বিলেত যাবার আগে। ঢাক-ঢোল বাজেনি, আত্মীয়স্বজনদের ভিড় হয়নি, দেবতা ও ব্রাহ্মণ সাক্ষী থাকেনি। হাতে হাত মিলল—হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়। দুজনে প্রতিজ্ঞা করলাম—কেউ কাউকে ছাড়ব না কোনোদিন। সাক্ষী রইল বুড়ি-গঙ্গা, আকাশ ও আকাশের তারা, আর সর্বত্র বিদ্যমান ভগবান। সেই হল অরুণার আসল বিয়ে। ভাগ্য-বিপর্যয়ে যে বিয়ে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল—সেটা মিথ্যে। অরুণা তা কোনোদিন স্বীকার করেনি। অনেক দুঃখ, অনেক অত্যাচার সয়েও, আমাকে কোনোদিন পাবে না জেনেও, আমাদের বিবাহকে ও অন্তরের মধ্যে টিকিয়ে রেখেছিল। যদি আমার সঙ্গে দেখা না হত, ও মরত, তবু সে বিবাহ ও অস্বীকার করত না। খুব আশ্চর্য নয়? ওদের দেশে তো দেখেছি মেয়েরা স্বামী ত্যাগ করে, স্বামীর মৃত্যুর পর অবলীলাক্রমে আর এক স্বামী গ্রহণ করে। আমাদের দেশেও দু-চারজনকে জানি—ভালোবাসার মানুষ না পেয়ে দিনকয়েক দুঃখ পেল। তারপর কিছুদিন গেলেই মনের ক্ষত সেরে এল। তারপর চুটিয়ে জীবনধর্ম পালন করছে এখন।'

শীলা বলল, 'ভালোই তো করছে। যা পাওয়া গেল না, তার জন্য সারাজীবন হা-হুতাশ করে, নিজেকে বঞ্চিত করে, লাভ কি? বেস্ট্ যদি না জোটে তো নেক্সট বেস্ট্ নিয়েই কাজ চালিয়ে দিতে হবে। ট্রাঙ্কের আসল চাবি হারিয়ে গেলে আমরা চাবি তৈরি করিয়ে নিয়ে কাজ চালাই। দিনকয়েক একটু অসুবিধে হয়, ব্যবহার করতে-করতেই মোলায়েম হয়ে আসে। তারপর কিছুদিন গেলে ওটা যে আসল নয় নকল, তা মনেই হয় না।'

বিকাশ বলল, 'তোমার কথা শুনে খুব শান্তি পেলাম। উষা নানা কথা বলছিল, তুমিও বললে। মনটা ক্রমে ভারি হয়ে উঠছিল। তুমি র‍্যাশনাল ভিউ নিয়েছ দেখে মনটা হালকা হল আমার।'

শীলা বলল, 'কাজেই আপনি আশা করতে পারেন, আমি যথাসময়ে বিয়ে করব। হয়তো সুদূর ভবিষ্যতে আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করে চিঠি লিখব।'

গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। 'ওঁরা আসছেন,' বলল শীলা।

অরুণা এল। পরেছে একটা শাদাসিধে শাড়ি। এতগুলো ভালো-ভালো রঙিন শাড়ি রয়েছে, একটা পরে এলেই পারত, ভাবল বিকাশ। উষা নামল। মুখ গম্ভীর। অরুণা নেমেই শীলাকে দেখে মিষ্টি হেসে আপ্যায়ন জানাল। শীলাও মৃদু হাসল। নির্মল নেমে বলল, 'বৌদির শরীর সত্যি ভালো নেই। লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। ওঁর হাতটা একবার দেখুন দেখি, দাদা।'

বিকাশ ওর কপালে হাত দিয়ে দেখল গাটা একটু গরম হয়েছে। জিগগেস করল, 'টেম্পারেচার দেখেছিলে?'

অরুণা বলল, 'না।'

বিকাশ বলল, 'গলাটা একটু ভারি হয়েছে। সর্দি হবে বোধ হয়। শালটা জড়াও ভালো করে, ঠাণ্ডা লাগিও না।'

উষা চলে গিয়েছিল। শীলা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এদের কাণ্ড-কারখানা কিছুক্ষণ দেখে বলল, 'অরুণাদি ঘরের মধ্যে বসবেন চলুন।'

অরুণাকে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বলল, 'আপনি বসুন। আমার এখনো রান্না বাকি। উষাদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

অরুণা চুপ করে বসে রইল। উষার সঙ্গ পাবার জন্য তো মরে যাচ্ছে সে! না এলেই ভালো হয়। স্বামীকে দেখিয়ে কি অভিনয়ই না করল? শুয়েছিল সে লেপমুড়ি দিয়ে। শুয়ে পড়েছিল অবশ্য ওদের গাড়ির শব্দ পেয়েই।

উষা কাছে গিয়ে কত আদরের ডাক—'অরু'—মুখের ঢাকা খুলে মাথায় হাত দিয়ে কি চমকানো! স্বামীকে ডেকে বলল, 'ওগো শুনছ, সত্যি জ্বর হয়েছে যে!' তারপর তাকে সানুনয় অনুরোধ—'তাহলেও একটিবার যেতে হবে ভাই। এমন কিছু বেশি জ্বর নয়।' তারপর ন্যাকামী সুরে বলা, 'হ্যাঁ ভাই অরুণা, কাল কি এমন বলেছি যে দাদা আমাকে দাঁতে কাটছে! যদি কিছু বলে থাকি, মনের দুঃখেই বলেছি—তা তো তুমি নিশ্চয় এখন বুঝতে পেরেছ? তোমার দাদা যদি বেঁচে থাকতেন আর এমনি কাণ্ড করে বসতেন, তুমিও আমারই মতো করতে না? তা যা হবার

হয়েছে, উঠে বস। একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নাও। কিছু না খাও বসে দেখবে।'

সে কিছু জবাব দেয়নি। উষা বলল, 'মাপ চাইতে হবে নাকি? ' তারপর তার একটা হাত দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল, 'তাই চাইছি।' স্বামীকে বলল, 'শুনছ, হাতে ধরলাম। দাদাকে বোলো।' তাকে বলল, 'অরুণা উঠছ না যে! পায়ে ধরতে হবে নাকি?' পায়েই ধরল শেষে। চিরদিন তো অমনিই ঢঙের মেয়ে। মুখে মিষ্টি, মনে ধানী লঙ্কার ঝাল। নির্মলবাবু এগিয়ে এলেন। বললেন, 'বৌদি! উঠুন। যা হবার হয়েছে, এ যখন এত করে বলছে, ক্ষমা করে চলুন একবার। না হলে বড় দুঃখ পাব —'

বাধ্য হয়ে উঠতে হল তাকে। গাড়িতে স্বামীর পাশেই বসল উষা। সে পিছনে বসল। আর একটা কথাও উষা বলল না তার সঙ্গে। মণ্টুদা — না, দাদা বলা ঠিক হচ্ছে না, তবে মনে-মনে দোষ নেই, বলেছে — সব সহ্য করতে। সহ্য করাই যাক। কতই বা আর শোনাবে? ওকে ফিরে পাবার আশায় সব সহ্য করলাম। ফিরে পাবার পর আর এটুকু সহ্য করতে পারব না?

শীলা মেয়েটি ভদ্র। ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই। কিন্তু অন্তরের যোগ নেই ওর কথা আর কাজের মধ্যে। কায়দা-কানুন মাফিক মাপা কথা, মাপা কাজ। বাড়তি কিছু নেই। যেন পাওনাদারের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া, কড়াক্রান্তি পর্যন্ত। ঘরে বসিয়ে আদর করে দুটো মিষ্টি কথা বলা, মিষ্টিমুখ করানোর বাহুল্য নেই। বুঝিয়ে দেয়, তুমি আমাদের স্বজন নও, সমপংক্তি নও। ভুলিয়ে-ভালিয়ে অন্দরে ঢুকবার অধিকার পেয়েছ কোনো রকমে, কিন্তু অন্তরে ঢুকবার অধিকার দেব না তোমাকে।

বাইরের বারান্দায় অতিথি-সমাগম হয়েছে। 'এই যে কমলবাবু! আসুন, বসুন।' আপ্যায়ন-আহ্বান শোনা গেল। উষাও সাদর আপ্যায়ন জানাল। মিহি-সুরে হাকিম-গিন্নীর মর্যাদা-মাফিক, মাত্রাগত অনুগ্রহের সঙ্গে কিছুটা আপ্যায়ন মিশিয়ে। আমার তিনি কোথায় ঘুরছেন কে জানে! একা পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। ছেলেবেলার বন্ধু বলে, স্ত্রীর পাওনায় ফাঁকি দেবে নাকি? তা হবে না। যতটুকু পারি আদায় করে নেব ওর কাছ থেকে।

আবার জ্বর হল। কি জ্বর কে জানে! তখন ভয় হত না, ভরসা হত্ত বরং, যাবার দিন এগিয়ে আসছে ভেবে। এখন ভয় হয়। ওকে ছেড়ে যাবার কথা মনে হলেই ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যায়। কাল বলব—দেখ ভালো করে। চিকিৎসা কর। সারিয়ে তোল। উষা-শীলার মতো স্বাস্থ্য ফিরিয়ে এনে দাও। তখন দেখবে ওরা আমার কাছে মিটমিট করবে।

বিকাশ এল। বলল, 'একা বসে যে?'

অরুণা বলল, 'দোকা পাব কোথায়? তুমি তো পাশ মাড়ালে না।' কণ্ঠস্বরে অভিমানের সুর ফুটে উঠল।

বিকাশ ওর কপালে, গালে হাত দিয়ে বলল, 'জ্বর বেশি নয়। কাল বললাম এত করে বাইরে ঠাণ্ডা মেজেতে পড়ে কান্নাকাটি না-করে ভিতরে বিছানাতে শুয়ে-শুয়ে কাঁদ, তা তো শুনলে না! যখন সাকরেদ ছিলে তখনই শোনোনি, এখন গুরুর গুরু তস্য গুরু হয়ে কথা শুনবেই না তো!'

একটা চেয়ার কাছে নিয়ে এসে বসল।

বাইরে ব্রিজ খেলা চলছে। শৈলেন, প্রভাত, নির্মল ও কমলবাবু খেলছেন। স্বামীর পাশে বসে আছে উষা। মাঝে-মাঝে খেলা সম্বন্ধে স্বামীকে উপদেশ দিচ্ছে, কখনো খেলার ভুলের জন্য ধমকাচ্ছে।

অরুণা বলল, 'উষা কেমন মেয়ে দেখ। কুটুমের মেয়েকে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে, স্বামীর কাছে বসে আবদার করা হচ্ছে।'

বিকাশ বলল, 'শীলা নিজেই ঢুকেছে। খুব কাজের মেয়ে!'

অরুণা বলল, 'ও খেলছিল নাকি তোমাদের সঙ্গে?'

বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ।'

'কে কার পার্টনার হয়েছিল?'

'আমার পার্টনার ছিল শীলা।'

'দুধের সাধ ঘোলে মেটাল বেচারা! জীবনের পার্টনার হতে না পেরে হল খেলার পার্টনার।'

বিকাশ চুপ করে রইল। শীলার কথাটা মনে পড়ল।

অরুণা বলল, 'ভাগ্যে দিনকয়েক আগে দেখা হয়ে গেছে। না-হলে

ও-ই পার্টনার হয়ে দাঁড়াত, আর আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখতাম, আড়ালে কাঁদতাম।'

বিকাশ অকৃত্রিম স্নেহে ওর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চাপ দিল।

শীলা স্নান ও প্রসাধন সমাপন করে ঘরে ঢুকল। বলল, 'আপনারা দুটিতে একলা বসে আছেন যে!' বিকাশকে বলল, 'আপনি বাইরে যান, আমি বসছি অরুণাদির কাছে।'

উষা শুনতে পেয়ে বলল, 'ওখানে বসতে হবে না। এখানে এস। এ'রা তোমার গান শুনবেন বলছেন।'

শীলা বলল, 'একটু পরে আসছি। আপনারা ততক্ষণ আলাপ করুন।' বলে চলে গেল।

অরুণা বলল, 'তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়নি বলে আমি ভাবছিলাম ও খুব হেদিয়ে গেছে। কাল একটু-একটু মেঘলা ভাব দেখেও ছিলাম যেন। আজ কিন্তু একেবারে পরিষ্কার!'

বিকাশেরও তাই মনে হল। বিকেলেও একটু-আধটু ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘ যা দেখা যাচ্ছিল, এখন তা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। হয়তো যা দেখা গিয়েছিল তা পোজ মাত্র। মনটা ওর সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছে। তাকেও মুক্তি দিয়েছে। এ-কথা ভেবে বিকাশের মন, কি জানি কেন, খুশি হয়ে না-উঠে খুঁত-খুঁত করতে লাগল।

শীলার গান শোনা গেল। রবীন্দ্রনাথের গান গাইছে। যেমন কণ্ঠের মাধুর্য তেমনি অন্তরের দরদ! রবীন্দ্রনাথের বাণী যেন ওর অন্তরের রসে সরস হয়ে উৎসের মতো সহস্রধারায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিকাশ ও অরুণা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সুরের সুধাধারায় স্নান করে ওদের অন্তর সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে একটি অমৃতময় লোকে কিছুক্ষণের জন্য উত্তীর্ণ হল।

অরুণা বলল, 'উষা বলছিল শীলার মতো মেয়ে দেখা যায় না। সত্যি! আমার মতো পচা আঁস্তাকুড়ের জন্য আনন্দের খনি হারিয়েছ তুমি। হীরে ফেলে কাঁচ বেছে নিয়েছ। পরে অনুশোচনা হবে তোমার। আমার এখুনি অনুশোচনা হচ্ছে।'

বিকাশ চুপ করে রইল।

অরুণা বলল, 'হ্যাঁ গা! সত্যি নয়? বল না।'

বিকাশ বলল, 'বাজে বোকো না রুনু। শোনো, আর একটা গান গাইছে।'

খাবার সময়ে অরুণা একপাশে একটা চেয়ারে বসে রইল। ও খাবে না কিছু। বিকাশই নিষেধ করল। ডাক্তারের নিষেধ অবহেলা করার কথা নয়। উষা অনুরোধ করল না। শীলা দু-একবার একটু খুঁতখুঁত করল, 'অরুণাদি কিছু খেলেন না।'

শীলা পরিবেশন করছিল। উষাও। কমলবাবুর একেবারে গদগদ ভাব। হাকিম-গৃহিণী নিজ হাতে পোলাও পরিবেশন করছেন। বেঁচে থাকলে আরও কত কি ভাগ্যে ঘটবে! শীলার এক চোখ বিকাশের দিকে, আর এক চোখ বাকি সকলের দিকে।

বিকাশ কোনো জিনিস খেতে না-চাইলে শীলা বলে বারে-বারে, 'আপনি এত ভালোবাসেন এটা!' ঠাকুর ছানার পায়েস পরিবেশন করছিল। বিকাশের সামনে আসতেই শীলা নিষেধ করল, 'ওঁকে দিও না। উনি ওটা খেতে ভালোবাসেন না। বরং চাটনিটা বেশি করে দাও।'

চুপ করে দেখছিল অরুণা। বিকাশের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে রুচি-অরুচির খবর ঐ মেয়েটি তার চেয়ে বেশি জানে। আট-ন-বছর আগে বিকাশের জীবনের এই দিকটা তার নখদর্পণে ছিল। মাঝের কয় বছরে সে যে অনেক বদলেছে, অরুণা তা খেয়াল করেনি। এ দু-মাসেও ও ওর এদিকটা জানবার বিশেষ চেষ্টাও করেনি। অথচ এ-মেয়েটি বিকাশের নাওয়া-খাওয়া সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব মনে করে রেখেছে।

পুরুষদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে উষা ও শীলা খেতে গেল। অরুণা একা বসে রইল। ওর মনে হল ও যেন মরে গেছে। ওর প্রেত-মূর্তি সকলের অলক্ষ্যে বসে-বসে জীবিত মানুষদের জীবন-লীলা দেখছে। এদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তার সঙ্গে এদের কোনো সংস্রব নেই। ও যদি উঠে চলে যায়, ওরা বুঝতেও পারবে না। ওদের কিছু যাবে-আসবে না।

অরুণা উঠল—কমলবাবুরা চলে গেলেন। নির্মলবাবু গেলেন

ওদের পেঁছাতে। বিকাশদা কোথায় গেল? সে যে একলা বসে আছে খেয়াল নেই! ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল অরুণা। একটা ঘরে একটা টেবিলের দু-পাশে মুখোমুখি শীলা ও উষা খেতে বসেছে। বিকাশ দাঁড়িয়ে আছে পাশে। সিগারেট টানছে। শীলার দিকে তাকিয়ে কি বলছে। সলজ্জ হাসিতে শীলার মুখখানি অপরূপ সুন্দর হয়ে উঠেছে। তাই বিকাশ দু-চোখ ভরে দেখে নিচ্ছে।

একটা জানলার কাছে দাঁড়াতেই সমস্ত দৃশ্যটা চোখে পড়ল অরুণার। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। রাগে জ্বলে উঠল সারা মন। আমাকে একলা ফেলে রেখে এখানে এসে আড্ডা দেওয়া হচ্ছে! জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। ওর দিকে চোখ পড়তেই বিকাশ বলল, 'বাড়ি যাবে নাকি?'

অরুণা গম্ভীর-মুখে বলল, 'হ্যাঁ। শরীরটা খুব খারাপ মনে হচ্ছে।'

উষা বলল, 'দুটো মিষ্টিও তো খেতে পারে, দাদা! তাতে কি ক্ষতি হবে?'

বিকাশ বলল, 'থাক্, বাড়িতে দুধ পাঁউরুটি খাবে এখন।'

শীলা বলল, 'সে ব্যবস্থা তো এখানেও হতে পারত। একটু বসুন না, আমি খেয়ে উঠে ব্যবস্থা করছি।'

বিকাশ বলল, 'থাক্, থাক্, তোমরা খাও। আমরা চলি।'

শীলা বলল, 'কাল সকালে আসছেন তো?'

বিকাশ বলল, 'রুনু ভালো থাকলে আসব।'

রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুম এল না অরুণার। বিকাশ নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ও ধীরে-ধীরে উঠল। আলোটা উস্কে দিল। উজ্জ্বল আলোকে বিকাশকে দেখতে লাগল ভালো করে। শক্তিমান, সুন্দর পুরুষ। সমাজের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মেয়েও ওর বুকে মাথা রাখতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে। কেন বিকাশ তাকে ভালোবাসে? কি আছে তার? রূপ, গুণ, সম্পদ কিছু নেই। বহুদিন আগে এক কিশোরীর কচি, কোমল দেহের রূপ ওর চোখে যে মায়াঞ্জন বুলিয়ে দিয়েছিল, তারই প্রভাব এখনো কাজ করছে ওর মনে। কিন্তু যখন ঐ প্রভাব কেটে যাবে, যখন ওর মন

মোহমুক্ত হয়ে বিচার করতে বসবে কি পেয়েছে, কি পেতে পারত, তখন? জীবনের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য যে বিরাগ, যে বিদ্বেষ ওর মনে জমবে, তা তাদের জীবনকে বিষিয়ে দেবে যে! তখন যে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো গতি থাকবে না।

জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। ভাবল—এই বিপুল পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে সে তার ভালোবাসাটুকু নিয়ে আশ্রয় নিতে পারে।

আলোটা কমিয়ে দিয়ে অরুণা শুয়ে পড়ল—একেবারে বিকাশের বুক ঘেঁষে। বিকাশ ওকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নিল।

এত কাছে থেকেও এত দূর মনে হয় কেন? পাওয়ার মধ্যে হারানোর ভয় জাগে কেন? ভাবতে লাগল অরুণা।

পরদিন সকালে অরুণা অনেক বেলা পর্যন্ত বিছানা ছাড়ল না। বিকাশ চা-খাবার শেষ করে এসে বলল, 'উঠবে না?' গায়ে হাত দিয়ে বলল. 'জ্বর নেই তো।'

অরুণা বলল, 'হাত দিয়ে জ্বর বোঝা যায় বুঝি? নাড়ীটা দেখ না।'

নাড়ী দেখে বিকাশ বলল, 'খুব সামান্য জ্বর। থার্মোমিটার দিলে ৯৯ ডিগ্রির বেশি উঠবে না।'

অরুণা বলল, 'তবে যে জ্বর নেই বলছ। আমার বড় দুর্বল মনে হচ্ছে। তুমি তো কিছুই দেখছ না। বোন আর বন্ধুদের নিয়ে মেতে আছ। আমি মরে গেলেও কিছু যাবে-আসবে না তোমার। মরেই তো যেতাম। কেন বাঁচালে যদি এমন অবহেলা করবে—' কেঁদে ফেলল অরুণা।

বিকাশ বলল. 'সেই যে গল্প আছে, এক রানীর কাঁদবার শখ হয়েছিল, তেমনি তোমারও কাঁদবার শখ হয়েছে। মনে-মনে জানো. এ সব মিথ্যে। ওঠ দেখি। দুর্বল মনে হচ্ছে তো কোলে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছি—' বলেই তুলবার জন্য প্রস্তুত হল। 'থাক্, থাক্' বলেই উঠে পড়ল অরুণা। বিছানা থেকে নামল। বিকাশ ধরতে যেতেই অরুণা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল, 'ধরতে হবে না বলছি যে।'

বিকাশ কানাইকে ডাক দিয়ে বলল, 'মুখ ধোবার জল দিয়ে যা উপরে।'

ওর কথায় কান না-দিয়ে অরুণা ধীরে-ধীরে নিচে চলে গেল।

বিকাশ ইতিমধ্যে দাড়ি কামিয়ে মুখকে তকতকে করেছে। ক্রিম ঘষে ঝকঝকে করেছে। মাথার চুলে ব্রাশ চালিয়ে কোঁকড়া চুলগুলিকে যথা-সম্ভব শায়েস্তা করেছে। ধোপ-দুরস্ত স্যুট পরেছে। জলের ফ্লাস্ক, বন্দুক টেবিলের উপর রেখে বেরোবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে সিগারেট টানছে।

অরুণা ঘরে ঢুকেই ওর কেশ-বেশ হাব-ভাব দেখে, ভ্রূ কুঁচকে বললে, 'বেরোচ্ছ বুঝি? কে ডাকাডাকি করছিল?'

বিকাশ বলল, 'নির্মল একটা লোক পাঠিয়েছিল। দেখ না চিঠি, টেবিলের উপরে।'

চিঠিটায় লেখা ছিল : দাদা! বৌদি কেমন আছেন? আসতে পারবেন তো? বৌদির শরীর খুব যদি খারাপ না-হয় ওঁকে নিয়ে আসুন। এমন কিছু কষ্ট হবে না। যদি বৌদি না আসতে পারেন, আপনি নিশ্চয়ই আসবেন।

বিকাশ জিগগেস করল, 'কি, যেতে পারবে?'

অরুণা ঘাড় নাড়ল। 'আমাকে রেহাই দাও। তোমাদের সঙ্গে তাল দিয়ে চলবার ক্ষমতা নেই আমার,' ক্লান্তস্বরে বলল অরুণা। বিছানাতে বসে পড়ে বলল, 'দিন-দিন, ভালোও লাগে!'

বিকাশ বলল, 'দিন-দিন কোথায়? কদিন মাত্র। তারপর ওরা তো চলে যাবে।'

অরুণা বলল, 'কখন ফিরবে?'

'সন্ধ্যের আগে নিশ্চয়।'

'খাওয়া-দাওয়া হবে কোথায়?'

'খাবার সঙ্গে নিয়ে যাবে নিশ্চয়। তা ছাড়া শিকার করতে গেলে খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকে নাকি?'

অরুণা বলল, 'আগে তো অত শিকারের ঝোঁক ছিল না। বিলেত থেকে ফিরে এসে এই বাই ধরেছে।' একটু থেমে বলল, 'অনেক বদলে গেছ।'

বিকাশ হাসতে লাগল।

অরুণা বলল, 'সত্যি!'

বিকাশ বলল, 'ভয় নেই। বদল হয়েছে, শাখা-প্রশাখার। কতক শুকিয়ে খসে গেছে, কতক নতুন গজিয়েছে। কিন্তু কাণ্ড আর মূল ঠিক আছে।'

উঠে দাঁড়িয়ে বিকাশ বলল, 'ও-সব ভাবনা ছেড়ে দাও। খাওয়া-দাওয়া কোরো। বইগুলো পড়। আমি সন্ধ্যের আগেই ফিরব।' বলে বন্দুক ও ফ্লাস্ক নিয়ে নিচে নেমে গেল।

যাবার আগে বিকাশ কানাইকে ও ঠাকুরকে যথোচিত উপদেশ দিল। শুনতে পেল অরুণা।

বিকাশ নির্মলদের ওখানে গিয়ে শুনল—উষা, শীলা যাবে না। একটা পিকনিকের ব্যবস্থা হচ্ছে। খরচ বহন করবে কমলবাবু। ওরা শৈলেন ও প্রভাতের স্ত্রীদের নিয়ে কমলবাবুর বাড়ি যাবে। সেখানে কমলবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে পিকনিক সম্বন্ধে পরামর্শ করবে। নির্মলের গাড়ি থেকে যাবে ওদের জন্য।

বিকাশের গাড়ির পিছনের সীটে খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়া হল। একজন পিয়ন যাবে সঙ্গে, সে পিছনের সীটে বসবে। সামনে বসবে বিকাশ ও নির্মল। এই ব্যবস্থা হল।

হঠাৎ উষা শীলাকে বলল, 'তুমি তো রাইফেল চালানো প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছ। তুমি যাও না। এ'দের দুজনের এদিকে বিদ্যে যে কত, তা তো জানি। তুমি গেলে অন্তত আশা করা যাবে বাড়িতে কিছু আসবে।'

শীলা বলল, 'বিকাশদা খুব ভালো শিকারী শুনেছি।'

উষা বলল, 'কোথায় শুনলে? অরুণা বলছিল বুঝি! অরুণা তো দাদা যাই করুক, তাতেই মুগ্ধ হয়ে যায়। ছোটবেলা থেকেই তাই। আমি তো কোনোদিন দাদাকে বন্দুক চালাতে দেখিনি।'

বিকাশ নিঃশব্দে হাসছিল।

নির্মল বলল, 'দাদার বিদ্যে আমারই মতো নাকি? তাহলে শীলাদেবী আপনিও চলুন।'

শীলা বিকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অরুণাদি রাগ করবেন না তো?'

উষা মুখ কুঁচকে বলল, 'করুকগে রাগ! তুমি যাও তো।'

নির্মল বলল, 'ওঁকে কে খবর দেবে?'

উষা বলল, 'দাদা না-দিলে কেউ দেবে না। দাদা সামলে থাকলেই হল!' একটু হেসে বলল, 'চিরদিনই দাদার ঐ রকম। অরুণাকে সব বলা চাই। যত গোপন কথাই হোক। এমন অনেক কথা যা আমরা জানতাম না, অরুণা জেনে বসে থাকত। এমন রাগ হত!'

বিকাশ বলল, 'খালি ম্যাও-ম্যাও করিসনে! যাবার আগে এক কাপ চা খাওয়া। দাদার সবই দোষ। গুণ এক ফোঁটা নেই।' নির্মল ও শীলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার ভগ্নী-ভাগ্য দেখ তোমরা!'

উষা ধারাল-স্বরে জবাব দিল, 'ভগ্নী-ভাগ্য ভালো না হোক, পত্নী-ভাগ্য তো ভালো! তাহলেই হল।'

নির্মল ও শীলা ভাই-বোনের ঝগড়া স্মিতমুখে উপভোগ করছিল। বিকাশের দিকে চেয়ে শীলার মনে হল ঐ সুন্দর, সদানন্দ মানুষটিকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতে-দেখতে কত রাতের পর রাত শেষ হয়ে গেছে। জীবনের যত আভরণ, যত আহরণ, ওরই পায়ে সমর্পণ করে দিয়ে সার্থক হবার জন্য, উন্মুখ মন কত আগ্রহে দিন গুণেছে। হঠাৎ সব শেষ হয়ে গেল! ফুল ফুটল না, কুঁড়িতেই খসে পড়ল! এত দুর্ভাগ্য তার কে জানত? সাধারণ একটা মেয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নতমস্তকে পালাতে হবে শেষে? একবার চেষ্টা করে দেখবে না? বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র নয়, সমস্ত মেদিনী ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে?

শীলা রাজী হল। নির্মল ও পিয়ন চাপল পিছনের সীটে। সামনে শীলা ও বিকাশ। অবিলম্বে যাত্রা শুরু হল। যাত্রার আগে উষা বার-বার বলল, 'দাদা, খুব সাবধানে থেক। বিপদ-আপদ না হয়।'

একটা নদী পার হল। সেদিনের সেই বিহঙ্গ-কাকলি-মুখরিত, প্রিয়া-সঙ্গ-মধুর সন্ধ্যার কথা মনে হল বিকাশের। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল—অরুণা সেই নির্জন বাড়িটাতে একা রয়েছে। কি করছে এখন, কে জানে?

অরুণা আজ কাছে থাকলে কত প্রশ্ন করত!—আচ্ছা মণ্টুদা! বিকাশ ধমকের সুরে বলত—আবার মণ্টুদা? অরুণা বলত—বেশ দাদা বলব না, নাম ধরে ডাকব তো?

নাম ধরে ডাকবে কি? স্বামী গুরুজন না?

অরুণা আবদারের সুরে বলত—কি বলব তাহলে?

বিকাশ বলত—শাস্ত্রসম্মতভাবে হ্যাঁগো বলতে পার।

আচ্ছা, তাই বলব।

কত প্রশ্ন করত! বয়স হলে কি হবে, ওর মনটা ছেলেমানুষের মতো। কথায়-কথায় রাগ, অভিমান। আবার একটু আদর করলে যে কে সেই।

আদর তো জীবনে বেশি পায়নি, তাই আদরের কাঙাল এত। ওকে কেউ বোঝে না। তার কাছেই ও প্রশ্রয় পায়, আশ্রয় পায়।

সারা পথ শীলা গম্ভীর-মুখে বসে রইল। আড়-চোখে বিকাশের মুখের পাশটা এক-একবার দেখে নিচ্ছিল। কি ভাবছে এত? অরুণার কথা বোধহয়। অরুণা ওর মনকে ঘিরে রয়েছে সর্বদাই। মনের কাছে একটুক্ষণও আমল পাবার উপায় নেই। অরুণা যখন ওর কাছে হারিয়ে গিয়েছিল, তখন ওর মনকে স্পর্শ করা যেত, মনের পাত্তা পাওয়া যেত কোনো রকমে। এখন ওর মন অরুণা-আবরণের অন্তরালে স্পর্শাতীত হয়ে উঠেছে।

শীলা দেখতে পেল সামনে একটা বড় গর্ত রয়েছে। ভাবল, যা অন্য-মনস্কভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন, ওখানে ফেললে গাড়ি ওলটাবে নিশ্চয়। বিকাশ গর্তটা কাটিয়ে পার হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে শীলা বলল, 'আমাকে একবার ছেড়ে দিন, চালাই।'

নির্মল সশঙ্কে বলে উঠল, 'শিখবেন নাকি? পরে শিখবেন বরং।'

বিকাশ গাড়ি থামিয়ে সরে বসল। শীলা গিয়ে তার জায়গায় বসল। বিকাশ সিগারেট ধরাল।

শীলা কিছুক্ষণ চালাতেই নির্মল বলল, 'ওঃ, পাকা হাত!'

জঙ্গলের ধারে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াল। কাছেই একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। চারদিকে ঝুরি নেমেছে বিস্তর। পিয়নটি বটগাছের নিচে শতরঞ্চি পাতল। জিনিসপত্র নামাল একে-একে। কমলবাবু একজন লোক পাঠিয়ে দিয়েছিল আগেই — ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। সে অনেকক্ষণ এসে অপেক্ষা করছিল। ওরা আসতেই ছুটে কাছে এসে সসম্মানে নমস্কার করল। তারই সঙ্গে নির্মল, বিকাশ ও শীলা জঙ্গলে ঢুকল। লোকটা রইল সর্বাগ্রে। তারপর পর-পর রইল নির্মল ও শীলা। সবার পেছনে রইল বিকাশ।

শীলা ঠাট্টা করে বলল, 'আপনি এগিয়ে আসুন বিকাশদা! যা ভাবে বিভোর হয়ে আছেন, হয়তো পথের মধ্যে থেমে যাবেন, আমরা এগিয়ে চলে যাব।'

নির্মল প্রশ্ন করল, 'কিসের ভাব?'

শীলা বলল, 'অরুণা-ভাব।'

নির্মল বলল, 'অরুণার অভাবজনিত ভাব — ইতি অরুণা-ভাব?'

বিকাশ হাসতে লাগল। কিন্তু পিছনেই রইল।

শাল, পলাশ, শিমুলের জঙ্গল। গাছের গোড়ায়-গোড়ায় কাঁটা-গাছেরও জঙ্গল। মাঝখানে সরু পথ। সরু পথ দিয়ে ধীরে-ধীরে চলল সব। মাঝে-মাঝে পুষ্পভারাবনত বন্য লতা পথ আটকাল। হাত দিয়ে সরিয়ে যেতে হল। বন্য ফুলের গন্ধে বাতাস সুরভিত। একটা কাঁটালতা পথ আটকাল শীলার। বিকাশ এগিয়ে গিয়ে লতাটা সরিয়ে দিয়ে পথ করে দিল। গায়ে গা ঠেকল, হাতে হাত। শীলার সারা গা শিরশির করে উঠল।

শালগাছে অসংখ্য মুকুল এসেছে। ফুলও ফুটেছে। শালফুলের গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। পলাশ ও শিমুলগাছের মাথাগুলি বিস্তর লাল কুঁড়িতে ছেয়ে গেছে।

'কোথায় যেতে হবে হে?' বিকাশ বলল।

নির্মল বলল, 'একটু দূরে একটা দীঘি আছে—সেখানেই বিস্তর হাঁস নেমেছে বলছে।'

দীঘির ধারে গিয়ে পৌঁছুল। একধারের পাড় খুব উঁচু। সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। পদ্ম ও শালুক পাতায় আর কলমীদলে ছাওয়া জলের উপরটা। মাঝখানে কতকটা কালো জল কালো সাপের গায়ের মতো চকচক করছে। সেইখানে কয়েকটা হাঁস রয়েছে।

'লেডিজ ফার্স্ট', বলল নির্মল।

শীলাই প্রথম বন্দুক ছুঁড়ল। হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ, দুটো হাঁস মরল। কলরব সহকারে বাকি হাঁসগুলো উড়তে শুরু করল। বিকাশ বন্দুক চালালো। দুটো হাঁস আহত হয়ে জলে পড়ল। বন্দুকের শব্দে দীঘির ধারে কয়েকজন সাঁওতাল ছেলে জুটেছিল। কমলবাবুর লোকটা তাদের ডেকে পয়সা দেবে বলতেই তারা হাঁস আনতে জলে নেমে পড়ল।

দীঘি ছেড়ে আরও এগিয়ে গেল তারা। আরও অনেক জায়গায় ঘুরল, বেলা দুটো বেজে গেল। মারল কয়েকটা ঘুঘু।

শীলা আর বন্দুক হাতে করেনি। ভালো লাগছিল না তার। দীঘির পাড় থেকে নামবার সময়ে পা হড়কে গিয়ে সে পড়ে যাচ্ছিল। বিকাশ না-ধরলে পড়েই যেত। তাকে বুকে চেপে ধরেছিল বিকাশ। সেই থেকে ওর বুকের স্পন্দন দ্রুত ও দেহের রক্তস্রোত প্রবল হয়ে উঠেছে। সারা গা দিয়ে যেন আগুনের হলকা বয়ে যাচ্ছে। কান ঝাঁ-ঝাঁ ও মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে।

গাড়ির কাছে ফিরে এল তারা। শীলা চা খেল শুধু, আর কিছু খেল না। বলল, 'শরীরটা কেমন করছে, মাথাটা ধরেছে।'

নির্মল বলল, 'আমি আর একবার ঘুরে আসি। যদি কিছু যোগাড় করে আনতে পারি।' পিয়নটাও সঙ্গ নিল। শীলা শতরঞ্চির উপরে বসে যন্ত্রণা-কুঞ্চিত মুখে রগ দুটো টিপছিল। বিকাশকে থেকে যেতে হল।

বিকাশ বলল, 'শুয়ে পড় বরং।'

শীলা বলল, 'শোব কি করে?'

বিকাশ কাছাকাছি কিছু না পেয়ে বলল, 'তাহলে আমার কোলে মাথা দিয়েই শোও।'

'স্যুট নষ্ট হয়ে যাবে না?' ক্লান্ত-স্বরে বলল শীলা।

'হোক, তুমি শোও।'

শীলা বিকাশের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়তেই বিকাশ নিপুণ হাতে ওর মাথা টিপতে লাগল।

শীলা চোখ বুজে চুপ করে পড়ে রইল কতক্ষণ। বিকাশ অনুশোচনার সুরে বলল, 'মাথা ধরার ওষুধ ছিল বাড়িতে। আনতে ভুলে গেলাম।'

বন্দুকের শব্দ। সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেল পাখিদের আর্ত কলরব। বিকাশ বলল, 'নির্মল পাখি মারল বোধহয়।'

হঠাৎ শীলা বলে উঠল, 'বিকাশদা! আপনি তো ডাক্তার। আপনার কাছে বিষ আছে?'

বিকাশ চুপ করে রইল।

শীলা বলল, 'আমাকে দিতে পারবেন? খেয়ে মরব। আর আমি পারছি না সহ্য করতে!' ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল শীলার। হঠাৎ উপুড় হয়ে পড়ে বিকাশের কোলে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

স্নানাহার সেরে অরুণা জানলার ধারে ইজি-চেয়ারটিতে একটা বই নিয়ে বসে পড়তে শুরু করল। মাঝে-মাঝে মন উড়ে চলে যায় বইয়ের পাতা থেকে। চোখ থাকে চেয়ে; মন তখন নানা চিন্তা ঠোকরাতে শুরু করে।

উষাকে তার বিশ্বাস হয় না। সে তাদের বিয়ে পছন্দ করেনি। কাজেই এ-বিয়েকে কোনোরকমে বাতিল করে দিতে সে দ্বিধা করবে না। তবে নির্মলবাবু লোকটি মন্দ নয়। অন্তত চোখের পর্দা আছে বলে মনে হয়।

শীলা খুব কষ্ট পাচ্ছে বলে মনে হয় না। বেশ তো সহজ, সতেজ ভাব। হিন্দুবাড়িতে এক-একজন মেয়ের কতজনের সঙ্গে বিয়ের কথা-বার্তা হয়, তা বলে সকলকেই মেয়েটি ভালোবেসে ফেলে নাকি! উষার যত বাড়াবাড়ি! শীলার বাবার এত টাকা, এত বড় বাড়ি ভাইয়ের হাতে এল না, এর জন্যই ওর মনঃক্ষোভ। টাকাকড়ি, গয়নাগাটি, বাড়ি-গাড়ি এই নিয়েই ও তৃপ্ত। এ-ধরনের মেয়ের মনে ভালোবাসা জন্মায় না। সব শুক্তির বুকেই কি মুক্তা জন্মায়?

বড় একা মনে হচ্ছে। এর আগে ও তো দিনের পর দিন এমনি কাটিয়েছে। এত একা মনে হত না। ফাঁসির আসামীর মতো তার মন তখন সারা দিন-রাত অতীত জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকত, আস্বাদন করত বার-বার। আর কান পেতে পদধ্বনি শুনত মরণের। আর কত দূর! হঠাৎ তার ফাঁসির হুকুম রদ হয়ে গেছে। জীবনের মধ্যে আবার সে ফিরে এসেছে। চোখের সামনে ভবিষ্যৎ সব সৌন্দর্য, সব মধুর উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে আবার দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে হাত বাড়িয়ে নিলেই হল। শুধু যার হাতের ছোঁয়াতে কারাগৃহের রুদ্ধ দরজা খুলেছে, যার যাদু-দণ্ড স্পর্শে সকল দুঃখ সুখে পরিণত হয়েছে—সে পাশে থাকলেই হল। তাই তার সব সময় ভয়—পাছে সেই যাদুকর চলে যায়। যদি সব শূন্য, সব কালো করে দিয়ে আবার অন্তর্ধান করে! আবার সেই মৃত্যু বিভীষিকাময় জীবনে ফিরে যেতে হবে—ভাবলে বুক শুকিয়ে ওঠে অরুণার।

বিকাশের সঙ্গে গেলেই ভালো হত। কি এমন শরীর খারাপ হয়েছিল? উষা-শীলা সঙ্গে গেছে নাকি? উষা যাবে না বোধহয়। তাহলে শীলাও যাবে না। যদি যায়? বিশ্বাস নেই। ও সব পুরুষ-ঘেঁষা মেয়ের পক্ষে সবই সম্ভব। এ-কটা দিন ভালোয়-ভালোয় কেটে গেলে বাঁচে সে। এ-দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়াই ভালো। না হলে তাকে নিশ্চিন্ত হতে দেবে না কেউ।

শীলা মেয়েটি দেখতে-শুনতে সত্যি ভালো। বড়লোকের মেয়ে, কত আদরে-যত্নে মানুষ হয়েছে। আর সে মাত্র কোনো রকমে কতকটা লেখা-পড়া শিখেছে। মা ছিলেন চির-রুগ্না। বাঙালীর ঘরে মেয়েকে মা'র যতটা ভালোবাসা সম্ভব, তার চেয়ে কম ভালোবাসতেন না। কিন্তু রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে থাকতেন বারোমাস, ভালোবাসা প্রকাশ করবার অবসর পেতেন না। বাবা ছিলেন গম্ভীর, কড়া প্রকৃতির মানুষ। দাদা দেশহিতৈষী। দেশের সব বোনদের সমান ভাগে বণ্টন করে দিত তার স্নেহ। তার ভাগে সামান্যই পড়ত। গান-বাজনা, খেলা-ধুলা করবার সময় কখন? সংসারের কাজকর্মে সাহায্য করে, সকলের ফাইফরমাস খেটে যেটুকু সময় পেত তা ক্লাসের পড়া তৈরি করতেই ফুরিয়ে যেত।

ভালো শাড়ি-ব্লাউজ, গয়নাগাঁটি তার জোটেনি কখনো। তবে হ্যাঁ, মণ্টুদার কাছ থেকে যথেষ্ট পেয়েছে। ওর কাছে তো তার কিছু গোপন ছিল না। কারও কাছে যা বলতে পারত না, ওর কাছে বলতে বাধত না। কারও কাছে মুখ খুলতে চাইত না, কিন্তু ওর কাছে অনর্গল কথা বলে যেত। মা, বাবা, দাদা, বন্ধু—সবার কাছ থেকে পাওনা ও একাই মেটাত। ক্লাসের কোনো মেয়ে হয়তো তার নতুন ব্লাউজটা ছিঁড়ে দিল, বাড়িতে ধমক খেতে হবে—বলল ওকে। বলল—দাঁড়াও ব্যবস্থা করছি। কেমন করে করবে সে ছিল ওর ভাবনা। সে বলে দিয়ে খালাস। সরস্বতী পুজোয় চাঁদা দিতে হবে, মণ্টুদাকে বললেই ব্যবস্থা হত। ছেঁড়া শাড়ি পরে বেড়াচ্ছে, মণ্টুদা দেখলেই সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবস্থা।

এমনি কতভাবে কত যে দিত তাকে তার ইয়ত্তা নেই। মণ্টুদার মা'র হাতে অনেক টাকা থাকত সব সময়ে। সে টাকা মণ্টুদা চুরি করত, দুষ্টু ছিল তো ভারি। কেউ পেরে উঠত না। ওর বাবা জানতে পারলে মারধর করতেন। তবে ওর মা ওকে আড়াল করে রাখবার চেষ্টা করতেন। অবশ্য

বোনগুলি গোয়েন্দাগিরি করত সব সময়ে, বিশেষ করে উষা। তাকে হিংসা করত তো তখন থেকেই, কিন্তু পেরে উঠত না মণ্টুদার সঙ্গে। মা'র টাকা হাতাতে না পারলে মণ্টুদা ওর দিদিমার কাছে দরবার করত। দিদিমার হাতে অনেক টাকা ছিল। বুড়ি মণ্টুদাকে ভালোবাসতও খুব। মণ্টুদা টাকা চাইলে না-দিয়ে পারত না।

মণ্টুদা বিলেত চলে গেল। যাবার আগে সে নিজেকে ওর পায়ের নিচে ফেলে দিল। ও তাকে তুলে নিয়ে, কণ্ঠে ভালোবাসার রত্নহার পরিয়ে দিল; বলল — পরে থেক, সব বিপদ কেটে যাবে। তারপর এল পরম দুঃখের রাত্রি। কত ঝড়-ঝাপটা! ডাকাত এসে রত্নহার কেড়ে নেবার চেষ্টা করল! আঁকড়ে ধরে রইল সে। মণ্টুদা ফিরে এল। ঝড় থেমে গেল, রাত্রি প্রভাত হল। সামনে উজ্জ্বল জীবন স্পষ্ট হয়ে উঠল। রত্নহার মণ্টুদার হাতে ফিরিয়ে দিতে গেল সে। বদলে মণ্টুদা নিজেকেই দিয়ে দিল তাকে। কত ভাগ্য তার! দুঃখিনী, হতভাগিনীর এত ভাগ্য সহ্য হবে কেন লোকের! দুঃখ দেখলে আহা-উহু করে সহানুভূতি দেখিয়ে নিজেদের মহানুভবতায় তৃপ্তি পেত; সুখ সহ্য হচ্ছে না ওদের।

একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। থামল বাড়ির সামনে। এর মধ্যে ফিরে এল নাকি? কোনো বিপদ হয়েছে বুঝি! বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল অরুণার।

ডাক শোনা গেল — 'মণ্টু! মণ্টু!'

আরে ধীরেনবাবু যে! ধীরেন তার লম্বা-চওড়া দেহ নিয়ে, দরাজ গলায় 'মণ্টু' নাম হাঁকতে-হাঁকতে বাড়িতে ঢুকল। অরুণা নেমে গিয়ে সাদর সম্ভাষণ জানাল, 'আসুন, আসুন। চলুন উপরে।'

কানাইকে ডেকে চা-খাবারের ব্যবস্থা করল।

ধীরেন বলল, 'মণ্টু কই?'

অরুণা বলল, 'শিকারে গেছে।'

ধীরেন বলল, 'তাই নাকি? কোথায়?'

অরুণা বলল, 'কি করে জানব? কমলবাবুর লোক যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবে।'

ধীরেন বলল, 'আপনি গেলেন না?'

অরুণা বলল, 'আমি গিয়ে কি করব? আপনি কখন এলেন?'

'এসেছি কিছুক্ষণ আগে। একা নয়, সপরিবারে। কাল একটা ছুটি আছে। এই সুযোগে ঘুরে যাচ্ছি। তা ছাড়া মণ্টুর সঙ্গে দেখা হবে। আপনি তো ছাড়বেন না তাকে।'

অরুণা বলল, 'ধরে রেখেছি কি? এই যে শিকারে গেলেন আমাকে ফেলে।'

'আপনার অনুমতি না নিয়েই গেছে, বিশ্বাস করতে বলেন নাকি? আপনাকে দেখেই চিনেছি আমি, আপনি—'

'কি আমি?'

'আপনি মন্ত্র জানেন। মণ্টুর মতো সাত-আট বছর বিলেতে-থাকা ছেলে একবার আপনার সামনে এসে দাঁড়াল। কি মন্ত্র বললেন। অমনি উল্টে-পাল্টে গেল। আমার স্ত্রী বলছিলেন, দেখগে তোমার বন্ধুর সিং আর লেজ গজিয়েছে, আর গায়ে লোম পায়ে ক্ষুর—অর্থাৎ ভেড়া বনে গেছে। অরুণা দেবী এক মুঠো ঘাস দিচ্ছেন আর সে চিবোচ্ছে। আর সব সময় পায়ের কাছে পড়ে আছে।'

অরুণা বলল, 'আপনার স্ত্রী যে তবে সাহস করে আপনাকে ছাড়লেন? ওঁর ভয় হল না?'

'ভেড়াকে আর ভেড়া বানাবেন কি করে? আমার তিনিও তো বড় কম যাদুকরী নন। আগেই ভেড়া বানিয়েছেন আমাকে। কথা কি জানেন, সব মেয়েই কম-বেশি যাদু জানে। কাছে গেলে সাধ্য নেই এড়াবার।'

অরুণা বলল, 'আপনার গৃহিণীকে নিয়ে এলেন না কেন?'

'ছেলে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছেন। একটু আগে খেয়ে-দেয়ে এল। এসেই বলে খিদে পেয়েছে। তারই ব্যবস্থা করছেন।' একটু থেমে বলল, 'কেমন আছেন বলুন। আপনার স্বামীর বন্ধু হিসেবে জিগগেস করছি না। আপনার দাদার বন্ধু হিসেবে জিগগেস করছি।'

প্রণাম করল অরুণা। ধীরেন সবিস্ময়ে বলল, 'ও কি হল?'

অরুণা বলল, 'স্বামীর বন্ধু হিসেবে নমস্কার করেছিলাম। দাদা হিসেবে প্রণাম করলাম।'

ধীরেন বলল, 'কিন্তু সেদিনই তো কথা হয়ে গেল। আমি আপনার

দাদা। আগেই প্রণাম করা উচিত ছিল।' একটু থেমে বলল, 'নির্মলবাবুরা এসেছেন শুনলাম, সাতদিনের ছুটি নিয়ে। সেই মেয়েটি যার সঙ্গে মণ্টুর বিয়ের কথা হয়েছিল, সেও নাকি এসেছে?'

অরুণা ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' জানাল।

ধীরেন বলল, 'ননদ-ভাজে বনছে কেমন?'

'ভাজ বলে তো স্বীকারই করতে চায় না।'

'সে মেয়েটি কেমন?'

'ভালোই। একটু পুরুষ মার্কা। এম.এস-সি. পাশ করেছে। আপ-টু-ডেট মেয়েরা যেমন হয় আর কি! পুরুষদের সঙ্গে অবাধে, অসঙ্কোচে মিশতে পারে, খেলা-ধুলা করতে পারে।'

'আপনিও আপ-টু-ডেট কম কি? বি.এ. পাশ করেছেন।'

'আমার কথা বাদ দিন। কি জানি? কতটুকু জানি? রূপ, গুণ, কিছু নেই আমার।'

'মণ্টু কি করছে?'

'তাল সামলে যাচ্ছেন। একবার ওদিকে, একবার এদিকে।'

'এদিকেও সামলাতে হচ্ছে নাকি?'

'হবে না? মেয়েমানুষ তো! ভগবানের দেওয়া অস্ত্র তো আমারও আছে?'

'তাই শিকারে পালিয়েছে? দেখুন পালিয়ে না যায়।'

বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল অরুণার। শুষ্কমুখে বলল, 'ও কথা বলবেন না। শুনলেও ভয় হয়।'

ধীরেনের মুখে একটি স্নেহ-কোমল ছায়া ঘনাল। বলল, 'না দিদি! ভয় কি? যে ছেলে মোহিনীদের দেশ থেকে আস্ত পালিয়ে এসে তোমার কাছে পৌঁছেছে, সে কি পালিয়ে যাবার মানুষ? জানো, তোমার কথা প্রায়ই ভাবি? ভগবানের কাছে তোমাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি, তোমরা যেন সুখী হও।'

চোখে জল এল অরুণার। বলল, 'বড় সাহস পেলাম, দাদা। উনি পাশে না-থাকলেই ভয় হয়। যদি ফিরে না-আসেন! তখন চারদিকে তাকিয়ে আপনার জন দেখতে পাইনে, কোনো আশ্রয় খুঁজে পাইনে, দমটা যেন বন্ধ হয়ে আসে।'

ধীরেন বলল, 'রবি আমার প্রাণের বন্ধু ছিল। মণ্টুর চেয়েও। যদি কোনো বিপদ ঘটে, যেখানেই থাকি, আমি যেন খবর পাই।'

খাবার-চা নিয়ে এল কানাই। খাওয়া শেষ হলে ধীরেন বলল, 'এখানে একা না-বসে থেকে চল আমার ওখানে বৌদির সঙ্গে আলাপ করবে। তারপর একবার সবাই মিলে আশ্রমে যাব।'

সন্ধ্যায় বিকাশ বাড়ি ফিরতেই কানাই বলল, 'মা এক সাহেবের সঙ্গে মোটরগাড়ি চেপে চলে গেলেন।'

বিকাশ বলল, 'কোথায় গেলেন বলে যাননি?'

কানাই বলল, 'আমি শুধাইনি, উনিও বলেননি।'

বিকাশ বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'বেশ ছেলে তুই!'

ঠাকুর-চাকরও কোনো হদিস দিতে পারল না। বলল, 'সাহেব একদিন এসেছিলেন এ-বাড়িতে।'

বিকাশ ভাবল--ধীরেন নাকি? অনেকদিন আসেনি। গাড়ি নিয়ে বার হল তখুনি।

মনটায় যেন একটা ভারি পাথর চেপে রয়েছে বিকাশের। কিছুতেই নামাতে পারছে না।

শীলা আজ কেঁদেছে। ফুলে-ফুলে, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কি কান্না! ওর মনের আকাশে যে অভিমানের মেঘ কালো হয়ে জমে ছিল, অজস্র অশ্রুর ধারায় ঝরে-ঝরে পড়েছে। 'কেন আমায় মুখ ফুটে জানিয়ে দেননি! কেন মনে আশা জাগিয়েছিলেন; কেন অবহেলায় একেবারে নিরাশ করলেন! কি করেছিলাম আমি আপনার? গুলি করে মেরে ফেলুন আমাকে। এমন করে তিল-তিল করে মরতে পারব না আমি... দুদিনেই অস্থির হয়ে উঠেছি—সারা জীবন আমি বাঁচব কি করে?'

বিকাশ কিছু বলেনি। মাথায় হাত বুলিয়েছিল নীরবে।

শীলা বলতে লাগল, 'জানেন—কেন এলুম? একা পাইনি একদিনও। সব মনের কথা বলে যেতে হবে তো! দিয়ে যেতে চাই নিজেকে। চাইনে কিছুই। সন্ন্যাসিনীর মতো জীবন কাটিয়ে দেব। আপনি—আপনারা সুখে থাকুন।'

একটু পরে বলল, 'কিছুই পেলাম না জীবনে। মায়ের স্নেহ, বাবার সঙ্গ, কিছুই পাইনি। ভেবেছিলাম এতদিন যা পাইনি, সুদে-আসলে তা হবে। কিন্তু তা হল না। ভাগ্যে নেই যে! যাকগে! চলে যাব চির-দিনের জন্য। আর দেখা হবে না।'

বিকাশ সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, বলল, 'চুপ কর শীলা!'

উঠে বসে সাপিনীর মতো ফ্'সে উঠল, 'চুপ কর বলতে লজ্জা করে না আপনার?' মুখ লাল হয়ে উঠল গনগনে আগুনের মতো। চোখে বিদ্যুৎ ঝলসাতে লাগল। জ্বালাভরা কণ্ঠে বলল, 'একটিবার আদর করতে পারলেন না! একটিবার আদর করতে ইচ্ছা হল না! চিরদিনের জন্য চলে যাব একটিবার—' কেঁদে ফেলল হু-হু করে।

আশ্চর্য হয়ে গেল বিকাশ। শান্তিনিকেতনে তৈরি, আপ-টু-ডেট আধুনিকা প্রগতি-সম্পন্না শীলা বোস—পাড়াগাঁয়ের মেয়ে অরুণার মতো কাঁদতে লাগল! বিকাশ ওর কাছে সরে বসে ওর পিঠে হাত দিতেই ও একেবারে বুকের কাছে ঘেঁষে, কাঁধে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। ওর গালে নিজের গালটি রেখে বিকাশ ওর পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

কান্না থামল। সিক্ততা লেগে রইল ওর চোখের পাতায়, ওর কপোলে। বর্ষণের পর যেমন ভিজে থাকে আকাশ, ভিজে থাকে মাটি, তেমনি ভিজে রইল শীলার মন, ভিজে রইল বিকাশের মন। আর দুজনেরই মনের দিগন্তে অশ্রু-কুহেলিকা।

শীলা বলল, 'দু-একদিনের মধ্যে চলে যাব এখান থেকে। ওখানেও বেশিদিন থাকব না। যাবার আগে আর একটি দিন কাছে পেতে চাই। এই প্রার্থনা করছি আপনার কাছে—একটা দিন মাত্র। চিরদিন তো অরুণাদির কাছে থাকবেন। কি বলছেন?'

'তাই হবে,' বলল বিকাশ।

শীলার অশ্রু-সিক্ত মুখখানি এখনো শিশির-সিক্ত পদ্মের মতো ফুটে রয়েছে।

ডাক-বাংলোয় গিয়ে হাজির হল বিকাশ। ধীরেন হৈ-হৈ করে উঠল, 'ওরে মণ্টু, তোর বৌকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে অরুণা ও ধীরেনের বৌ রেবা। বিকাশ আগে দেখেনি ওকে। ছোট্ট মানুষটি, কচি-কচি মুখ, ধবধবে ফরসা রঙ। ধীরেনের ছেলে অরুণার কোলে। ফরসা রঙ, দিব্যি নাদুস-নুদুস

ছেলেটি। ছেলে কোলে করে অরুণাকে মানিয়েছে বেশ! বিকাশ নমস্কার করল রেবাকে। অরুণাকে বলল, 'বাড়িতে বলে আসনি।'

অরুণা হাসতে লাগল। বলল, 'ভাবলে পালিয়েছে বুঝি!'

'তা ভাবিনি। জানি পোষ মানানো পাখি পালাবে না। এগাছ-ওগাছ করে আবার বাড়ি ফিরে আসবে ঠিক সময়ে।'

ধীরেন বলল, 'অরুণার ভয়, তুই এখনো পোষ মানিসনি। এখনো পরের খাঁচায় গিয়ে উঠতে পারিস!'

মনটা খচ-খচ করে উঠল বিকাশের। আর একজনের খাঁচার কাছেই মনটা তার ঘুরছিল এতক্ষণ!

হাসল বিকাশ। অরুণা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ওর মুখের দিকে। ওর মুখ দেখে ওর মনের কথা বোঝবার বিদ্যা আয়ত্ত আছে তার। আঁধার জমে উঠল ওর মুখে।

ধীরেন বলল, 'কি-কি শিকার হল?'

বিকাশ বলল, 'গোটা কয়েক হাঁস, ঘুঘু, আর কি-কি কয়েকটা পাখি।'

ধীরেন জিগগেস করল, 'কে-কে গিয়েছিল?'

শীলার নাম শুনে চমকাল অরুণা। তীক্ষ্নদৃষ্টি ফেলল আবার বিকাশের মুখে। ওর চোখের সঙ্গে চোখ মেলাবার চেষ্টা করল। পারল না।

অরুণা বলল, 'আমাদের ভাগ কই? দাদা-বৌদিদের নেমন্তন্ন আমাদের বাড়িতে। তুমি ভাগ নিয়ে এসগে।'

বিকাশ বলল, 'পাগল নাকি? আমি চাইতে পারব না। ওদের নামিয়ে দিয়েই চলে এসেছি।'

রেবা এতক্ষণে কথা বলল, 'এতক্ষণ অদর্শন! অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন বুঝি!'

ধীরেন বলল, 'হ্যাঁরে মণ্টু, তোর চেয়ে আমি বড় না? যাই হই, আমার বৌকে বৌদি বলবি। আমি অরুণার দাদা।'

অরুণা বিকাশকে বলল, 'আমি আর দেরি করব না। আমাকে এখুনি পৌঁছে দাও।' ধীরেনকে বলল, 'আশ্রমে যাবার সময়ে আমাকে তুলে নেবেন দাদা!'

আসবার সময়ে অরুণা বলল, 'বেশ মানুষ বৌদি। ঠিক যেন আমি ওর নিজের ননদ—এমনি ব্যবহার করল। ধীরেনদা সব বলেছেন ওকে। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল—প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে। পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে। আপনার মতো মেয়ে দেখিনি আমি। সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা, দময়ন্তীর পাশে স্থান আপনার। এত দুঃখের মধ্যেও আপনার প্রেম বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। অদ্ভুত মেয়ে! এই সব বলছিল। অথচ তুমি তো একদিনও—'

বিকাশ বলল, 'আমার বাহাদুরি তোমার চেয়ে কম নাকি? তেমন সমঝদার লোক হলে আমারও পায়ের ধুলো নিত।' গা ঘেঁষে বসে বলল, 'অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ছে না তোমার—না?'

'সত্যি করে বল দেখি, আমার মতো কটা মেয়ে দেখেছ তুমি? মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যে প্রহ্লাদের মতো কৃষ্ণনাম ভোলেনি?' আবদারের সুরে বলল, 'ওগো, একটু বেশি করে ভালোবেসো। বাইরের জলুস দেখে ভুলে যেও না।'

সন্ধ্যায় আশ্রমে গেল সবাই। স্বামীজী অরুণাকে বললেন, 'মা, ছেলেকে ভুলে গেছ।'

অরুণা বলল, 'না বাবা! আপনাকে ভুলবার সাধ্য কি? আপনি যদি আড়াল করে না-থাকতেন, কোথায় গিয়ে ঠেকতাম কে জানে?'

রেবা, ধীরেন, বিকাশ আশ্রম দেখতে গেল। অরুণা স্বামীজীর কাছে বসে রইল। স্বামীজী এক সময়ে বললেন, 'সেই চিঠিটার এতদিনে জবাব এসেছে, মা। লিখেছে অনাথাশ্রমে একজন সেবিকার প্রয়োজন আছে, পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিন। লিখলাম দিনকয়েক পরে পাঠাচ্ছি। আশীর্বাদ করি, তুমি সংসারের মধ্যে অটল হয়ে থাক চিরদিন। তবে যদি কোনো আশ্রয়হীনা মেয়ের খবর পাও, আমাকে জানিও।'

[২৪]

পরদিন বেলা দশটায় নির্মল ও কমলবাবু এল। ডাকা   করতে লাগল। কানাই গিয়ে জানাল—বাবু বাড়ি নেই।

নির্মল বলল, 'তোর মা আছেন তো?'

অরুণা নেমে গিয়েছিল। এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করল দুজনকে। আপ্যায়ন সহকারে বলল, 'চলুন বসবেন।'

নির্মল বলল, 'বসব না। দাদা কোথায় গেছেন?'

অরুণা বলল, 'একটা কলে গেছেন।'

নির্মল বলল, 'তাই নাকি! বেশ-বেশ। কত দূরে?'

অরুণা বলল, 'এখান থেকে অনেক দূর। পাশের গ্রামে স্বামীজীর একজন ভক্ত আছেন খুব বড়লোক।'

কমলবাবু অদূরে দাঁড়িয়ে অরুণাকে দেখছিল। ভাবছিল—এ মেয়েটিকে অনেক উৎপীড়ন করেছি, কিন্তু দিনের আলোয় ভালো করে দেখিনি একদিনও। দেখে শ্রদ্ধা হয় মেয়েটিকে। স্প্রিং-এর মতো শক্ত অথচ নমনীয়। অনেক বোঝা বইবার শক্তি ধরে।

কমলবাবু বলল, 'বুঝেছি—ভোলানাথবাবু।'

অরুণা বলল, 'হ্যাঁ, ওঁর মেয়েকে দেখতে গেছেন। ওঁর উপর খুব বিশ্বাস হয়েছে তাঁর।'

নির্মল বলল, 'তাহলে তো মুশকিল। সন্ধ্যের আগে ফিরতে পারবেন না।'

অরুণা বলল, 'খুব সম্ভব।'

নির্মল বলল, 'আজ একটা পিকনিকের ব্যবস্থা করেছেন কমলবাবু। আপনাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছেন। দাদা তো যেতে পারবেন না মনে হচ্ছে। ধীরেনবাবুরা এসেছেন। আজকের দিনটাই থাকবেন। কাজেই আজই করতে হবে।'

কমলবাবু সানুনয়ে অনুরোধ করল, 'বেশ তাহলে আপনিই চলুন—।'

অরুণা সবিনয়ে বলল, 'আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ। আনন্দের

মাঝখানে গিয়ে নিরানন্দের সৃষ্টি করব শুধু। আমাকে বাদ দিয়ে দিন দয়া করে। আপনি যে আমাদের দয়া করে স্মরণ করেছেন, এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।'

কমলবাবু বিশেষ পীড়াপীড়ি করল না। তার স্ত্রী ও মেয়েরা যাবে। তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহিতা বিধবাটি না থাকাই ভালো। কারণ তার স্ত্রী ও মেয়েরা কটুভাষিণী। কে কি বলে ফেলবে ঠিক নেই। শেষে অসুবিধায় পড়ে যেতে হবে।

সারাদিন অরুণার কাটল অস্বস্তির মধ্যে। দিন যেন ফুরোতে চায় না। বাড়িটা গিলতে আসছে যেন। ঘরের মধ্যে শুয়ে-বসে রইল খানিক। বাকি সময়টা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে গাড়ির শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল। বিকাশ এর আগেও দু-একবার দূরে গিয়েছিল। এমনিই মনকেমন করেছিল তার। বিকাশকে বলতেই ঠাট্টা করেছিল—ডাক্তারের স্ত্রীর অত বিরহ-প্রবণতা ভালো নয়। কষ্ট পেতে হবে।

জবাব দিয়েছিল অরুণা—হ্যাঁ গো! চিরদিনই একলা-একলা থাকব নাকি? বলে বক্তব্য মুখে না বলে চোখে বলেছিল। আজও মনে হল, রেবা-বৌদির মতো যদি একটি নাদুস-নুদুস ধবধবে ফরসা খোকা কোলে থাকত তাহলে বুক ভরে মন ভরে, বিশ্ব ভুবন ভরে থাকত। সারাদিন যে কোনদিক দিয়ে কেটে যেত, খেয়াল থাকত না।

সন্ধ্যের পর বিকাশ এল। অরুণা খাবার করছিল রান্নাঘরে। স্নানের জল গরম করে রাখতে বলে গিয়েছিল কানাইকে। বিকাশ এসে ডাক দিল, 'ওরে কানাই, তোর মা কোথায়?'

কানাই বলল, 'রান্নাঘরে।'

'আসতে বল্,' বলল বিকাশ।

অরুণা উপরে আসতেই বিকাশ বলল, 'কি করছিলে?'

অরুণা বলল, 'কি আর করব? একদিন না, এক বছর। সময় কাটতেই চায় না। তোমার জন্য খাবার করতে লেগে গেলাম।'

বিকাশ বলল, 'মুখটি শুকিয়ে রয়েছে কেন? খেয়েছিলে তো?'

মরি-কি-মরি ছুটে এসেছি। মন কেমন করছিল।' আদরে গলে গেল অরুণা। চোখে জল এল। এত ভাগ্যও ছিল! বলল, 'মেয়েটি কেমন?'

বিকাশ বলল, 'ভালো। একটি খোকা হয়েছে। মোটাসোটা টুকটুকে সুন্দর। দুই-ই ভালো আছে। খুব আদর করলেন ভদ্রলোক। একশো টাকা দিলেন।'

কানাই ঢুকল। দু-হাতে, দু-বগলে কয়েকটা জিনিস। অরুণা সবিস্ময়ে বলল, 'ও কি?'

বিকাশ বলল, 'দুটো হরলিক্স কিনলাম। শহুরে জায়গা তো, পাওয়া গেল। রঙিন শাড়ি কিনলাম খান কয়েক, তোয়ালে কয়েকটা আর বিছানার চাদর।'

অরুণা বলল, 'সেদিন এক গাদা কিনলে যে!'

বিকাশ বলল, 'আরও কিনলাম। নতুন সংসারে অনেক দরকার হয়।'

অরুণা বলল, 'যদি বিদেশে যেতে হয় তো লট-বহর বাড়িয়ে লাভ কি?'

বিকাশ বলল, 'এখানেই থেকে যাব ভাবছি। ওখানেও অনেক ভদ্রলোক বললেন—থেকে যান। যে রকম দেখা যাচ্ছে, প্র্যাকটিস জমবে এখানে।'

কমলবাবুদের পিকনিকের খবর বলল অরুণা। বিকাশের বেশি উৎসাহ দেখা গেল না। বলল, 'তাই নাকি! ভালো হয়েছে—দিন-দিন হৈ-হৈ ভালো লাগে না।' মনে আনন্দ হল অরুণার। শীলার সঙ্গর চেয়ে তারই সঙ্গ ওর ভালো লাগে তাহলে।

স্নান করে, চা-খাবার খেয়ে বিকাশ অরুণাকে নিয়ে ধীরেনদের ওখানে গেল। নির্মলদের ওখানে যাবার প্রস্তাব করতেই অরুণা নাকচ করে দিল সঙ্গে-সঙ্গেই। বলল, 'না-না, আমাকে বৌদির কাছে পৌঁছে দিয়ে তুমি যেও। উঃ, সেদিনের কথা কাঁটার মতো মনে ফুটে আছে। মনে হলেই সারা মন জ্বালা করে ওঠে—সর্বনাশ হবে! যে ঘর বাঁধছি সে ঘর ভেঙে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে!—মেয়েমানুষ হয়ে আর একজন মেয়েমানুষকে এমন কথা বলে? এই ভাইয়ের উপরে ভালোবাসা ওর? ও কখনো তোমাকে ভালোবাসে না। অত্যন্ত স্বার্থপর তো! ওর নিজের স্বার্থ ষোলো আনা বজায় থাকলে, আর কার কি হচ্ছে গ্রাহ্য করে না।'

অরুণাকে পৌঁছে দিল বিকাশ। নিজে আর নামল না। ধীরেন হৈ-হৈ করে উঠল। বিকাশ বলল, 'আসছি এখুনি। একবার নির্মলদের ওখানে যাই। যাইনি সারাদিন। না-গেলে উষা মাথা চিবিয়ে খাবে আমার।'

ধীরেন বলল, 'আমিও যেতাম যে!'

অরুণা বলল, 'বেশ তো! আপনি যান। আমরা ননদ-ভাজে গল্প করি।'

রেবাও অরুণাকে সমর্থন করল। ধীরেনকে থেকে যেতে হল।

নির্মল ও উষা বসেছিল বাইরের বারান্দায়। একটা লণ্ঠন জ্বলছিল টেবিলে। বাস ড্রাইভার সেদিনকার খবরের কাগজ এনে দিয়ে গিয়েছিল। নির্মল তাই পড়ছিল। উষা একটা ইজি-চেয়ারে ঢাকাঢুকি দিয়ে শুয়েছিল।

শীলা ওর ঘরে চুপ করে শুয়েছিল। আজ সারাদিন বিকাশকে দেখেনি। দিনটা ব্যর্থ গেল বলে মনে হচ্ছিল। চমৎকার জায়গাটিতে পিকনিক হয়েছিল। একটি ছোট পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটা বাড়িতে। পাহাড় আর বাড়ি দুই-ই জমিদারবাবুর। একটু দূরে একটা ঝরনা। পাহাড়ে উঠেছিল সবাই। কমলবাবুর স্ত্রী, ওর বড় মেয়ে আর উষাদি ওঠেননি। হৈ-হৈ করে গেল সব পাহাড়ের গায়ে ঝোপ-ঝাপের মধ্যে এবড়ো-খেবড়ো সুড়ি পথ দিয়ে।

তার কিন্তু কিছু ভালো লাগছিল না। এমন সুন্দর জায়গা, এত লোকজন, এত আনন্দ চারদিকে, তার মন মুখ ফিরিয়ে রইল সারাক্ষণ। মা কাছে না-থাকলে শিশুর মুখে শত চেষ্টাতেও যেমন হাসি ফোটানো যায় না, বিকাশ কাছে না-থাকায় তার মন তেমনি এত আনন্দের মধ্যেও বিষণ্ণ হয়ে রইল।

অথচ কাল সারারাত কিভাবে কেটেছে! যেন নেশার ঘোরে কেটেছে। বিকাশ তাকে আদর করেছিল, ওর গায়ের স্পর্শ লেগেছিল তার গায়ে। ওর গালের স্পর্শ লেগেছিল ওর গালে। সেই মদির-মধুর, আনন্দ-বেদনাময় উপলব্ধি ওর দেহ, মন, চেতনা, ওর সমস্ত সত্তাকে বিহ্বল বিবশ

করে দিয়েছিল। একটিমাত্র চেতনা শুধু জাগ্রত ছিল—পরদিন আবার দেখা হবে। পরদিন আবার ওর দৃষ্টির স্পর্শ পাবে সর্বাঙ্গে। ওর মুখের মধুর হাসি দেখে নয়ন তৃপ্ত হবে।

ব্যর্থ হল সারাদিন। দুদিন পরে চলে যাবে। আর হয়তো দেখা হবে না। কি নিয়ে কাটবে তার নিঃসঙ্গ, নীরস জীবন! কতটুকু সঙ্গ-সুখ, কতটুকু রস সঞ্চয় হল! জীবনের উত্তাপে দেখতে-দেখতে উবে যাবে যে!

গাড়ির শব্দ শুনে ধড়মড়িয়ে উঠল। ছুটে যেতে ইচ্ছা করল। নির্মল-বাবু কি ভাববেন, ভেবে নিরস্ত হল। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শাড়ি-খানা গুছিয়ে নিল একটু। ফিরে এসে স্নানটা সেরে নিলেই পারত, ভাবল।

বিকাশ বারান্দায় ঢুকতেই নির্মল বলল, 'আসুন দাদা! কখন ফিরলেন?'

বিকাশ বলল, 'ঘণ্টাখানেক আগে।'

'কত হল?'

'একশো টাকা। বড়লোক খুব। বেশি চাইলেও দিত। আমি কিছু বললাম না।'

উষা উঠে বসল। হাই তুলে গা-মোড়া ভাঙল। বলল, 'একা যে? অরুণা এল না?'

বিকাশ বলল, 'ও ধীরেনের ওখানে গেল। ওর বৌয়ের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে।'

নির্মল কথার মোড়টা ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলল, 'খুব আনন্দ করা গেল। আপনারা গেলেন না। বিস্তর ঘুঘু দেখলাম ওখানে।'

'মারলে নাকি?'

'প্রচুর মাংসের ব্যবস্থা ছিল। কি হবে মিথ্যে প্রাণীহত্যা করে?'

উষা বলল, 'অরুণা গেলেই পারত। এমন কিছু শরীর খারাপ ছিল না। আমার সঙ্গে ওর বনতে না-পারে, ওর বন্ধুও তো গিয়েছিল। তার সঙ্গেই থাকত।'

'তোরাই তো দলে ভারি ছিলি। ওরা দুটিতে পেরে উঠত কি?'

উষা তীক্ষ্নস্বরে বলল, 'তোরা মানে? আমি, শীলা, শৈলেনবাবুর স্ত্রী আর মেয়েরা—এই সব?'

বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ, তাই। তবে তুই হলি দলের চাঁই।'

শীলা এল। উষা সরোষে বলল, 'শুনছ শীলা, দাদার কথা! অরুণা আমাদের সঙ্গে গেলে আমরা ওর সঙ্গে ঝগড়া করতাম।' বিকাশকে বলল, 'দেখ দাদা, চিরদিন অরুণার হয়ে তুমি আমার সঙ্গে লড়েছ। দুজনে ঝগড়া হয়েছে, তুমি অরুণাকে কিছু বলনি, আমাকে মেরেছ। একমাত্র ভাইয়ের ভালোবাসা ও চিরদিন আটকে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ভালো লাগে না ওকে। ওকে দেখলে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত রি-রি করে।'

বিকাশ বলল, 'সেইজন্যই তো ও যায়নি। রি-রি করতে-করতে যদি রে-রে করে তেড়ে আসতিস!' বলে হাসতে লাগল।

উষা বলল, 'তোমার হাসি দেখে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে, দাদা। ও কি করেছে আমাদের বল দেখি? আমাদের এত বড় বংশে কালির দাগ দিয়েছে। মা ভাগ্যে মারা গেছেন। বেঁচে থাকলে আত্মহত্যা করতেন।'

নির্মল অস্বস্তি বোধ করছিল। উষা আবার বলল, 'বড়দিদি কি বলছিলেন জানো— ওর মুখ পুড়িয়ে, মাথা মুড়িয়ে, দূর করে দেব।'

বিকাশের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'তোর ধারণা, ইংরেজ রাজত্ব যাবার পরে বড়দিদি ও বড় জামাইবাবুর রাজত্ব শুরু হয়েছে!' ওর স্বাভাবিক ভারি কণ্ঠস্বরে মেঘ-গর্জনের আভাস শোনা গেল।

নির্মল বলল, 'ওকে মাপ করুন, দাদা! সারাদিন রোদে ঘুরে ওর মাথার ঠিক নেই।'

শীলার দিকে চোখ পড়ল বিকাশের। বনভূমির কোমল শ্যাম ছায়া ওর চোখে। ওর মুখে অপরিসীম শান্তি। ওর দুটি কোমল অথচ কর্ম-কুশল হাত তাকে সেবা করবার জন্য ব্যগ্র। ওর স্নেহভরা হৃদয় তাকে সংসারের সকল অশান্তি থেকে আড়াল করে রাখবার জন্য ব্যাকুল। ভাবল, যদি অরুণার সঙ্গে দেখা না হত? তাহলে ওর সঙ্গে বিয়ে হত। তাহলে কোথাও কোনো বিরোধ বাধত না। কারও মনে নিরানন্দের ছায়া পড়ত না। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলের মন অনাবিল আনন্দে ভরে উঠত। সকলের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ অজস্র বর্ষিত হত তাদের মিলিত জীবনের পরে। একটি অনুশোচনার ছায়া পড়ল মনে। মনে পড়ল কাল অরুণার ক্ষীণ দেহখানি বুকে জড়িয়ে ধরে আর একটি যৌবন-সমৃদ্ধ দেহের স্পর্শের জন্য তার অন্তর পিপাসিত হয়েছিল। মনে পড়ল, কাল

শীলার দেহস্পর্শে তার সারা দেহে যে কামনার তড়িৎ স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, তা অরুণার দেহস্পর্শে কখনো হয়নি। অরুণার দেহ যেন তার নিজের দেহ। স্পর্শে মনে মায়া জাগে, মমতা জাগে, কিন্তু সারা মন কামনাতুর হয়ে ওঠে না।

উষা নির্মলকে বলল, 'তুমি তো ভালোমানুষী দেখাচ্ছ। মা কি বলেছেন জানো? — বৌমা! তোমার দাদা যেন সেই মেয়েটিকে আমাদের বাড়িতে এনে হাজির না করে। দেশ-ছাড়া, ভিটে-ছাড়া হয়েছি বটে, তা বলে হিন্দুয়ানী ছাড়িনি তো। আর যে কদিন আছি ছাড়বও না। তোমার যা ইচ্ছে হয় কোরো।'

বিকাশের মন এক মুহূর্তে চাঙ্গা হয়ে উঠল। বলল, 'অরুণা কোনোদিন তোদের বাড়ি যাবে না, আমিও যাব না।'

নির্মল শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'দাদা! আপনিও ছেলেমানুষী করছেন? ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। মা কখনো এ-কথা বলতে পারেন না,' বলে উষার দিকে তাকিয়ে ইশারা করতেই, উষার উদ্ধত জবাব নিরস্ত হল। বিকাশ বলল, 'তাহলে আমি উঠি।'

নির্মল বলল, 'তা কি হয়? গল্প করুন। চা খাবেন নাকি?'

শীলা বলল, 'খাবেন তো করে আনছি।'

নির্মল বলল, 'আপনাকে করতে হবে না, ঠাকুরকে বলুন।'

শীলা চলে গেল। বিকাশকে বলল, 'আপনার রোগী কেমন দেখলেন?'

বিকাশ বলল, 'ডেলিভারি কেস, একটু জটিল হয়ে উঠেছিল। তা ঠিক হয়ে গেছে।' একটু থেমে বলল, 'এখানকার ফিল্ডটা মন্দ নয়। অনেক জায়গায় যাবার ভালো-ভালো রাস্তা আছে। অথচ ভালো ডাক্তার নেই। যাঁরা আছেন, তাঁদের থাঁই মেটানো সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। একটু কম লোভ আর একটু বেশি সহানুভূতি নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করলে জমে উঠতে বেশি সময় লাগবে না।'

শীলা আগের জায়গাতে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিকাশের কথাগুলি শুনে ওর মনে হল, বিকাশের আশা, আশঙ্কা, ভাবী জীবনের স্বপ্ন, কিছুরই সঙ্গে ওর যোগ থাকবে না কোনোদিন। এর পরে যখন ওর সঙ্গে দেখা হবে, তখন অরুণা সহস্র-সহস্র তন্তু দিয়ে ওকে এমন করে জড়িয়ে থাকবে, যে শীলা তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না।

দু-সপ্তাহ পরে। বিকাশ ইজি-চেয়ারে বসে একখানা বই পড়ছে। আসলে, বই পড়ছে না, বিরস-মুখে বইয়ের পাতার উপরে দৃষ্টি লাগিয়ে রেখেছে মাত্র। কাছেই একটা চেয়ারে অরুণা বসে আছে। ওরও মুখ থমথম করছে। একটা কলহ হয়ে গিয়েছে দুজনের মধ্যে এটা কারও বুঝতে কষ্ট হবে না। এমন কি কানাই চায়ের পেয়ালা নিতে এসে ঘরে ঢুকেই এটা বুঝতে পেরেছে এবং ঠাকুরের কাছে গিয়েই তা প্রকাশ করেছে।

ব্যাপারটা যা ঘটেছে তা এই : সকাল দশটার বাসে একটা চিঠি এসেছে। লিখেছে উষা। তার ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে বিকাশকে ওখানে যাবার জন্যে সানুনয় নিমন্ত্রণ করেছে। অরুণার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেনি। অরুণা চিঠিটা পড়ে থমথমে মুখ করে জিগগেস করল, 'যাবে নাকি ?'

বিকাশ বলল, 'যাওয়া তো উচিত।'

বলতেই অরুণা ফোঁস করে উঠল, 'যাওয়া উচিত ? আমাকে যারা অপমান করে, তুমি কি করে যাবে তাদের বাড়ি ?'

অরুণার কথা অন্যায় নয়। দিন কয়েক আগে উষা তাকে অত্যন্ত অপমান করেছে। ওরা শহরে গিয়েছিল কয়েকটা জিনিস কিনতে। ধীরেনের বাড়িতে উঠেছিল। কেনা-কাটা শেষ হলেই চলে আসবে এই ছিল তাদের মতলব। ধীরেন বলল, 'ওটা ভালো হবে না। এখানে এসে যদি ওদের সঙ্গে দেখা না-করে যাস তো অনেক তিক্ততার সৃষ্টি হবে।'

ভিতরের ব্যাপারটা বিকাশ ওকে খুলে বলল। সব শুনে ধীরেন আর কিছু বলল না। কিন্তু অফিসে গিয়ে নির্মলকে খবর দিয়ে দিল। ওরা বিকেলে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছে, এমন সময় উষা রাগে অভিমানে মুখ হাঁড়ি করে এসে হাজির হল। অরুণার সঙ্গে দেখা হতেই মুখ ফিরিয়ে নিল। রেবাকে জিগগেস করল, 'দাদা কোথায় ?'

রেবা বলল, 'বাথরুমে। আসছেন। আপনি বসুন।'

অরুণা রেবাকে বলল, 'আমিও গা-হাত ধুয়ে নিই গিয়ে।' বলে চলে গেল। উষা বলল, 'ওরা কখন এল?'

রেবা বলল, 'সকাল নটায়। খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করে বাজারে গিয়েছিলেন। একটু আগে ফিরলেন।'

উষা বলল, 'যাচ্ছে কখন?'

রেবা বলল, 'এখুনি যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। তবে উনি বলে গেছেন, আমি না এলে যাবি না। ওঁর যদি আসতে দেরি হয় তো সন্ধ্যের পর বেরোবেন।'

বিকাশ এল। উষা তাকে দেখেই বলল, 'দাদা, তোমার এ সব কি কাণ্ড। আমি থাকতেও তুমি এখানে উঠলে কেন?'

বিকাশ বলল, 'ধীরেন আমার বাল্যবন্ধু। তার বাড়িতে উঠেছি তো কি অন্যায় হয়েছে? তা ছাড়া ধীরেন আমাদের দুজনকে আসতে নেমন্তন্ন করে এসেছিল।'

উষা বলল, 'নিজের বোন-ভগ্নীপতির চেয়ে তোমার বন্ধু-বন্ধুপত্নী বেশি আপনার হল?'

'ব্যবহারের গুণে পরও আপন হয়, আপনও পর হয়, এটুকু বোঝবার বয়েস তোর হয়েছে আশা করি।'

রেবা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছিল এতক্ষণ, সরে পড়ল।

উষা বলল, 'দেখ দাদা, আড়ালে আমাকে মেরো, কান মলে দিও, কিন্তু লোকের সামনে আর অপমান কোরো না।'

বিকাশ বলল, 'তুই কি করে খবর পেলি?'

উষা বলল, 'উনি টেলিফোন করলেন একটু আগে।'

বিকাশ বলল, 'ধীরেন স্টুপিড্-এর কর্ম! বারণ করলাম এ॰ করে।'

'বারণ করেছিলে কেন? তোমার কি ছোটবোনকে দেখতে ইচ্ছে করে না? আমার খোকাকে দেখতে ইচ্ছে করে না? আমি দোষ করেছি হয়তো, কিন্তু খোকা কি দোষ করলে?'

'তুই তো নিষেধ করেছিলি আমাদের আসতে। বলিসনি যে তোর শাশুড়ী পছন্দ করবে না?'

'তোমাকে আসতে তো নিষেধ করিনি, অরুণাকে করেছিলাম। ধীরেনবাবুর মা থাকলে তিনিও করতেন।'

বিকাশ বলল, 'ওকে ফেলে তো আর আমি যেতে পারিনে।'

উষা কাতর-স্বরে বলে উঠল, 'দাদা, তুমি কি ঐ মেয়েটার জন্য তোমার আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে দেবে?'

'তা দেব। সে কথা তো তোকে নানাভাবে জানিয়েছি। আমাকে পেতে হলে ওকে ছাড়লে চলবে না।'

উষা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বিকাশের সামনে এল এবং বসে পড়ে ওর পায়ে হাত দিয়ে কাঁদ-কাঁদ ভাবে বলল, 'দাদা, আমি তোমার পায়ে ধরছি একটিবার আমাদের বাড়িতে চল, চল দাদা!' বলে কেঁদে ফেলল।

ওর অশ্রু-সজল চোখ দুটির করুণ অনুনয়, ওর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠের ব্যাকুল অনুরোধ, বিকাশের স্নেহকে আলোড়িত করল। আহা! বাপ-মা-মরা অভিমানী ছোটবোনটি! ওকে তুলে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে আদর করে বলল, 'পাগলী!'

উষা প্রবল মাথা নেড়ে বলল, 'না, তুমি যাবে চল। আমার শাশুড়ী শুনেছেন তুমি এসেছ, আমার দেওর-ননদরা শুনেছে, তুমি না-গেলে আমি মুখ দেখাতে পারব না।'

যেতে হয়েছিল বিকাশকে। অরুণা রাগ করেছিল। কিন্তু ওকে বুঝিয়েছিল বিকাশ। বলেছিল, 'যে কদিন এরা এখানে আছে, যেমন করে হোক সম্পর্ক টেনে চলাই ভালো। চলে যাবে এখান থেকে দু-চার মাস পরেই। তখন আর এ-সমস্যা থাকবে না।'

অরুণা মুখে আর কিছু বলল না। কিন্তু মনে-মনে জ্বলতে লাগল। উষা যে কেঁদে জিতল ও জিদ বজায় করল, বিকাশ তার উপরে উষার অবজ্ঞা ও অপমান সমর্থন করল, এটা কিছুতেই সে ভুলতে পারল না।

আজও বিকাশ ওর পূর্বের যুক্তি দেখাল, যে কদিন ওরা থাকে, মিছামিছি বিরোধ কলহ করে লাভ কি?

অরুণার রাগ হল। রুক্ষ-কণ্ঠে বলল, 'খুব ভালো কথা। কিন্তু আমি তোমার স্ত্রী। আমার অসম্মান না-হয়, এটা তোমার দেখা উচিত নয় কি? তোমার বড়লোক বোনেরই মন রাখবে, আর আমার মনের দিকে তাকাবে না?' হঠাৎ ওর রুদ্ধ অভিমান ও রাগ দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। বলল,

'তুমি যদি যাও তো ফিরে এসে আমাকে জীবন্ত দেখবে না।'

বিকাশ ওকে আবার বোঝাবার চেষ্টা করতেই হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল অরুণা। বলল, 'আমাকে সে অপমান করবে, আর তুমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখবে? আমার বাঁচবার দরকার কি? বিষ এনে দাও খেয়ে মরি আমি। আমি মরে গেলে যা ইচ্ছে কোরো তুমি।'

বিকাশ বলল, 'কাঁদবার কি দরকার? আমি যাব না। হল তো?'

অরুণা চেয়ারে বসে ফোঁপাতে লাগল। বিকাশ বিরস-মুখে বইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। একটা কথা মনে পড়ল বিকাশের। হাসল। অরুণা দেখতে পেয়ে অনুযোগের স্বরে বলল, 'হাসছ যে! আমি কাঁদছি, আর তুমি হাসছ?'

বিকাশ বলল, 'একটা কথা মনে পড়ল। উষারা একবার পিকনিক করেছিল। তোমাকে দলে নেয়নি। আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। তোমার দাদাকেও। তোমার দাদা তো নাচতে-নাচতে চলল। তুমি কেঁদে-কেটে আমাকে যেতে দিলে না। তোমার মনে নেই?'

অরুণা বলল, 'আছে।' বর্ষা-সায়াহ্নের আকাশের মতো ওর অশ্রু-ভেজা মুখখানি অতীতের সুখ-স্মৃতির ম্লান আলোতে ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এতেই অরুণার সাহস। কতদিনের তিল-তিল করে জমে-ওঠা ভালো-বাসা, কতদিনের কত ছোটখাট দেওয়া-নেওয়া, তারই উপরে ভিত্তি করে তাদের বিবাহিত জীবন দাঁড়িয়ে থাকবে। শীলা-উষার সাধ্য কি তাকে টলাতে পারে! ওরা বিকাশকে যতই টানাটানি করুক, সহস্র দিনের সহস্র স্মৃতি ওকে তার কাছে বেঁধে রাখবে।

বিকাশ ভাবছিল — শীলা চলে যাবে। একবার দেখা হল না। যদি তারা এখানেই থেকে যায়, তার কখনো দেখা হবে না। অজস্র ধন-সম্পদের মাঝে থেকে মেয়েটি যেন একেবারে রিক্তা হয়ে গেল। এমন একটা সুন্দর জীবন নষ্ট হয়ে গেল? কেন তার প্রতি ওর এই আকুল কামনা? কি আছে তার? কি দেখেছে তার মধ্যে? ওর সেদিনের সেই অশ্রুভরা কণ্ঠের করুণ প্রার্থনা, যাবার আগে একদিনের জন্য কাছে পেতে চাই — কানে বাজতে লাগল।

সন্ধ্যের বাসে নির্মলের একটি চিঠি এল। অরুণাকে লিখেছে। বিকাশকে পাঠিয়ে দেবার জন্য অরুণাকে অনেক করে অনুরোধ করেছে।

লিখেছে : আমার ছেলের জন্মদিনে, তার মামা এত কাছে থাকতেও যদি আশীর্বাদ করে না-যান তো আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মর্মান্তিক হবে। আপনার প্রতি আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য বার-বার করজোড়ে ক্ষমা চাইছি। আপনি বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা। আমাদের সমাজের হাল-চাল ভালো করেই জানেন। বিশেষ করে, আমাদের আচার-নিষ্ঠা, বিধবা মা-মাসী-পিসীদের আচরণ। বিধবা-বিবাহ আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে চালু হয়নি। অসবর্ণ বিবাহ, ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের মধ্যে হলে, আমরা চোখ-কান বুজে কোনো রকমে সহ্য করে নিচ্ছি। কিন্তু সমাজের সকলেই, বিশেষ করে মহিলারা — এমন কি যাঁরা রীতিমতো শিক্ষিতা ও আলোক-প্রাপ্তা তাঁরাও — বিধবা-বিবাহকে বিশেষ আমোল দিতে চান না। আমাদের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে, উৎসবে, পর্বে, পুনর্বিবাহিতা বিধবারা সসম্মানে যোগদান করবার জন্য আহূত হন না। খোকার জন্মদিন উপলক্ষে আমার কয়েকজন আত্মীয়-আত্মীয়ারা আসবেন। আত্মীয়াদের মধ্যে দু-একজন সাতিশয় নিষ্ঠা-সম্পন্না বিধবা, তা ছাড়া আমার মা আছেন। তাঁরা আপনাকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে কার্পণ্য করবেন। পাছে তাঁদের কাছে আপনার মর্যাদার হানি হয়, এই ভয়ে আপনাকে আহ্বান করতে পারলাম না। আপনি আমাদের অবস্থা বুঝে আশা করি আমাদের অপরাধ মার্জনা করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

চিঠি পেয়ে অরুণা অনেক ভাবল। বিকাশ একটা কলে বাইরে গিয়েছিল। ফিরবামাত্র অরুণা বলল, 'শুনছ, তোমাকে যেতে হবে।'

বিকাশ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে, বলল, 'মানে?'

'এই দেখ নির্মলবাবুর চিঠি। লিখেছেন আমাকে। অনেক বক্তৃতা করেছেন আর তোমাকে ছেড়ে দিতে বলেছেন। তুমি না-গেলে সকলের মনঃকষ্ট হবে। ছেলের অকল্যাণ হবে। তুমি যাও বাপু! এমনিই তো সবার কাছে অপরাধী হয়ে বসে আছি, আর অপরাধ বাড়াব না। তুমিও মনে-মনে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবে।'

আবার বলল অরুণা, 'এই সব হবে আমি আগেই জানতাম। তাই তোমাকে বার-বার নিষেধ করেছিলাম। তুমি শুনলে না তো! পুরুষ-মানুষের কেউ দোষ দেয় না। সব দোষ মেয়েমানুষের। আমি হ্যাংলা, তাই দেখবামাত্র তোমার ঘাড়ে চেপেছি, উষা তো সেদিন বলল। আরও কত কি

বলছে ও বলবে! যদি সবার কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়েই থাকতে হয়, কি দরকার ছিল এ-কাজ করবার!'

বিকাশ বলল, 'তুমি তো আমাকেই চেয়েছিলে, সবার শ্রদ্ধা সম্মান চাওনি।'

অরুণা বলল, 'সত্যি চাইনি। এখনো চাই না। তোমাকে পেয়েছি, তাতেই আমার সব পাওয়ার শেষ হয়েছে। কিন্তু তুমি তো চাও। যদি আমার জন্য তোমাকে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব ছাড়তে হয়, তুমি কি কোনোদিন আমাকে ক্ষমা করবে?'

পরদিন সকালে বিকাশ যাবার জন্য প্রস্তুত হল। অরুণা বলল, 'সারাদিন কোনো রকমে কাটিয়ে দেব। কিন্তু সন্ধ্যের আগেই ফিরে এস। আমার মাথার দিব্যি রইল। হ্যাঁ গো! শীলার মুখ দেখে এ-মুখপুড়ীকে ভুলে যাবে না তো?' ছলছল চোখে বলল অরুণা।

বিকাশ ওকে আদর করে বলল, 'যদি নেহাত তেমন কোনো বাধা না-আসে, সন্ধ্যের আগেই আমাকে পাবে।'

শহরের এক প্রান্তে নির্মলের বাড়ি। বড় দোতলা বাড়ি। চারদিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কমপাউন্ড। বাড়ির চারদিক ছোট দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সামনে দু-পাশে দুটো ফটক। দুটো ফটক থেকে দুটি নাতিপ্রশস্ত লাল কাঁকরের রাস্তা বৃত্তের চাপের মতো বেঁকে গিয়ে যুক্ত হয়েছে বাড়ির সামনে গাড়ি-বারান্দায়। বাড়ির এ-পাশে ও-পাশে ফল-ফুলের বাগান। রাস্তা দুটির মাঝখানে অনেকটা জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে।

বাড়িতে উৎসবের হাওয়া বইছে। কলকাতা থেকে নির্মলের কাকা-কাকীমা, বিধবা জেঠিমা, মাসীমা-পিসীমা এসেছেন, ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে অনেকগুলি এসেছে। বাড়ি সাজানোর ব্যবস্থা হচ্ছে সকাল থেকে। রঙিন কাগজের মালা টাঙানো হবে দরজায়, জানলায়, দেয়ালের কার্নিসে। রঙিন আলোর মালা জ্বালানো হবে রাত্রে। তারই ব্যবস্থা করবার জন্য কারিগর এসেছে এবং কাজ শুরু হয়ে গেছে। বাড়ির সামনে দুটো রাস্তার মাঝখানের জায়গাটায় স্টেজ বাঁধা হচ্ছে। রাত্রে মেয়েরা অভিনয় করবে ওখানে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা কলরব সহকারে স্টেজের আশে-পাশের জায়গাটায় খেলা করছে।

ছাদের উপর আলিসায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শীলা। বড়-লোকের মেয়ে, শিক্ষিতা, সুন্দরী। যাঁরা এসেছেন সকলেই শীলাকে সম্ভ্রম করছেন, সমাদর করছেন। ঊষা তো ছেলের মাসীর স্থানে বসিয়েছে ওকে। খোকার নামে কালী-মন্দিরে পুজো দিতে শীলাকেই যেতে হবে। সেই-জন্য সকাল থেকে উপোস করে আছে সে। পুজো করিয়ে এনে খোকার মাথায় ফুল ঠেকিয়ে, তবে ও কিছু খেতে পাবে। তা ছাড়া রাত্রে নৃত্য-

গীত অনুষ্ঠানের ভার শীলার উপরই। নির্মলের সহকর্মীদের মেয়েদের নিয়ে শীলা একটি ছোট নৃত্যনাট্য অভিনয় করবে। রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধ' কবিতাটি নৃত্যে রূপায়িত করবে। রূপ দেবে সে আর জনকয়েক মেয়ে। মেয়েদের নাচ-গান শিক্ষা সেই-ই দিয়েছে। অন্যান্য ব্যবস্থাও সেই-ই করেছে।

বাড়ির সামনে দিয়ে ছোট একটা রাস্তা বহুদূর গিয়ে বড় রাস্তায় মিলেছে। সেই বড় রাস্তা দিয়ে বিকাশ আসবে। অবশ্য যদি অরুণার অনুমতি মেলে। তারই প্রতীক্ষায় শীলা তার দুই চোখের দৃষ্টি সংযোগ-স্থানের দিকে একাগ্র করে রেখেছে।

বেলা নটা বেজে গেল। শীলা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে সকাল থেকে। ঊষা এসে বলল, 'দাদার আশায় দাঁড়িয়ে আছ—নয়?' শীলা হাসল। ঊষা বলল, 'আসবে না বোধহয়। অরুণাকে তো আমি চিনি। আমার ভালো ও কখনো দেখতে পারে না।'

হঠাৎ দূরে গাড়ি দেখতে পাওয়া গেল। শীলা তার আনন্দের উচ্ছ্বাস চাপবার চেষ্টা করে বলল, 'আসছেন বোধহয়।'

ঊষা বলল, 'তাই তো! কাল ওঁর চিঠিতে কাজ হয়েছে।'

কাছে আসতেই বিকাশ শীলাকে দেখতে পেল। তারই আসার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে!—না-এলে মনে খুবই ব্যথা পেত। কাছাকাছি হতেই ওর আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি দেখতে পেল—অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি। তাজা ফুলের মতো রমণীয়। এই মুখখানিকে ম্লান করে দিতে মায়া হয়। অথচ অরুণাকেও তো ভোলা যায় না, ফেলা যায় না। তার অশ্রু-সজল মুখখানি মনের মধ্যে ফুটে রয়েছে যে! সূর্যমুখী ফুলের মতো তারই মুখের দিকে তাকিয়ে বেঁচে আছে সে। তার অদর্শনে ঝরে যাবে, মরে যাবে।

বাড়িতে ঢুকবামাত্র ঊষা ছুটে এল। বিকাশকে প্রণাম করল। বিকাশ বলল, 'উঃ কি ভক্তি! এখুনি ঝগড়া করবি তো কোমর বেঁধে।' শীলা এসে প্রণাম করল।

বিকাশ বলল, 'কি ব্যাপার? সবাই আমাকে কোনো সাধু-সন্ত মনে করেছ নাকি? এত প্রণামের ছড়াছড়ি! নির্মল কোথায়? ডাক্। প্রণাম-টনাম যা করবার সেরে নিক।'

নির্মল কাজে ব্যস্ত ছিল। আসার খবর শুনেই ছুটে এসে আদর-আপ্যায়ন জানাল। বিকাশ বলল, 'প্রণাম করবে না? আমি যে দাদা?'

নির্মল বলল, 'প্রণাম চাই নাকি?'

বিকাশ বলল, 'চাই না! পাওনা-গণ্ডা সব বুঝে নিয়ে যাব। কিছু ছাড়ব না।'

তেতলায় একটিমাত্র ঘর। এমনিতে ঘরটি ব্যবহার হয় না। তালাবন্ধ থাকে। বাড়িতে ভিড় হলে ব্যবহার হয়। সম্প্রতি বাড়িতে অনেক লোকের সমাগম হয়েছে। শীলা তার জিনিসপত্র সমেত ঐ ঘরটায় উঠে গেছে। শীলা বিকাশকে ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, 'এই ঘরটিতে আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।'

বিকাশ বলল, 'তুমি থাক তো এখানে। তুমি কোথায় যাবে?'

শীলা বলল, 'একটা দিন যেখানে-সেখানে কাটিয়ে দেব।'

বিকাশ হেসে বলল, 'আমি এসেই তোমাকে ঘরছাড়া করলাম।'

শীলার মুখে এল — ঘরছাড়া আজ নয়, আগেই করেছেন। আপনি পাশে না-থাকলে ঘর বাঁধব না জীবনে। কিন্তু চেপে গিয়ে বলল, 'পোশাকটা ছাড়ুন, হাত-মুখ ধোন।' বিকাশের স্যুটকেস খুলে ধুতি, শার্ট, স্যাণ্ডাল বার করল। বলল, 'বসুন।' বিকাশ একটা চেয়ারে বসতেই, শীলা ওর সামনে জানু পেতে বসে ওর জুতোয় হাত দিতেই বিকাশ আপত্তি করল, 'ও কি! থাক্-থাক্।'

শীলা ওর মুখের দিকে চোখ তুলে বলল, 'দিল্লীতে খুলে দিতাম। তখন তো আপত্তি করেননি। কতদিন দেখা হবে না। আজকের দিনটি আমাকে সাধ মিটিয়ে সেবা করতে দিন।'

জুতো-মোজা খুলে পায়ের কাছে স্যাণ্ডাল এগিয়ে দিল।

পোশাক বদলে ধুতি, শার্ট পরল বিকাশ। শীলা ইতিমধ্যে নিচে থেকে এক বালতি জল নিয়ে এল। হাত-মুখ ধুলো বিকাশ। শীলা চা-খাবার নিয়ে এসে বিকাশকে খাওয়াল। তারপর বলল, 'আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

বিকাশ বলল, 'কোথায়?'

শীলা বলল, 'খোকার জন্য পুজো দিতে যাব কালী-মন্দিরে। এখান থেকে মাইল তিনেক দূর। আপনি নিয়ে যাবেন আমাকে।'

'কেউ কিছু মনে করবে না তো?'

'এতে মনে করবার কি আছে? মনে করলেই বা কি যায় আসে?' একটু থেমে বলল, 'যাঁরা বাইরে থেকে এসেছেন, তাঁরা কেউ জানেন না আপনার বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁরা জানেন আমার সঙ্গেই আপনার বিয়ে হবে। নির্মলবাবুর মা শুধু জানেন। তিনি কাউকে কিছু বলবেন না। উষাদি নিষেধ করে দিয়েছেন।' আবার একটু থেমে বলল, 'আপনি বসুন, আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'স্নান করিগে।'

বিকাশ বলল, 'আমি আর একা বসে থেকে কি করব? নিচে গিয়ে কাজকর্ম কি হচ্ছে দেখিগে। আমি ছেলের মামা। এতক্ষণ কোমরে গামছা বেঁধে কাজে নেমে যাওয়া উচিত ছিল।'

শীলা বলল, 'কোথাও পালাবেন না কিন্তু বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে। আমাকে নিয়ে যেতে হবে মনে থাকে যেন।'

বিকাশ বলল, 'বন্ধু-বান্ধব কে আছে আমার এখানে?'

'কেন ধীরেনবাবু।'

'সে তো অনেক দূরে থাকে।'

কিছুক্ষণ পরে ডাক পড়ল বিকাশের। গিয়ে দেখল শীলা যাবার জন্য প্রস্তুত। স্নান সারা হয়েছে। নাতিদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশদাম কাঁধে, পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। পরেছে লাল-পাড় গরদের শাড়ি, ওরই ব্লাউজ। পা দুটি খালি।

বিকাশ বলে উঠল, 'লক্ষ্মী প্রতিমার মতো দেখাচ্ছে তোমাকে। আঁট-সাঁট শাড়ি পরে, হাই হিল জুতো এঁটে যা দেখায়, তার চেয়ে অনেক ভালো দেখাচ্ছে।'

শীলা আনন্দোজ্জ্বল মুখে, আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে বলল, 'ওমা! এমন জানলে আমি যে দিন-রাত এই পোশাকই পরে থাকতাম। বলে দেননি কেন আগে?'

বিকাশ বলল, 'সত্যি বলছি।'

'অরুণাদি কাছে নেই বলে সাহস বেড়ে গেছে আপনার,' বলল শীলা।

বিকাশের মোটরেই শীলা চলল পুজো দিতে। ও থালা ভর্তি পুজোপচার কোলে নিয়ে পিছনের সীটে বসল। বিকাশ গাড়ি চালাচ্ছিল। শহরের ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে শীলা বলল, 'এইখানে গয়নার দোকান। ফিরবার সময় একবার দাঁড়াতে হবে।'

কিছুক্ষণ পরে ওরা মন্দিরে পেঁছিল। প্রাচীন মন্দির। পুরোহিত মোটর দেখে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল। এস. ডি. ও. সাহেবের বাড়ি থেকে পুজো দিতে এসেছেন শুনে সসম্মানে শীলাকে মন্দিরে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে গাড়ির কাছে কতকগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক ভিখারী ভিড় করেছিল। কাছেই খাবার দোকানে টাকা ভাঙিয়ে বিকাশ তাদের বিদায় করবার ব্যবস্থা করতে লাগল।

আধঘণ্টা পরে শীলা ফিরে এল। হাতের থালায় প্রসাদী ফুল, বেলপাতা ও প্রসাদ। পুরোহিত সঙ্গে-সঙ্গে এল। আশাতীত প্রণামী পেয়ে সে খুবই পুলকিত। শীলা বিকাশকে বলল, 'প্রণাম করুন এঁকে।' বিকাশ প্রণাম করল এবং পাঁচ টাকা প্রণামী দিল। পুরোহিত প্রণামের জন্য যতটা না-হোক প্রণামীর জন্য যথেষ্ট আশীর্বাদ করল। তারপর ওরা গাড়িতে উঠল।

আসতে-আসতে বিকাশ শীলাকে জিগগেস করল, 'একটা পরামর্শ দাও দেখি। খোকাকে কিছু একটা আশীর্বাদী দিতে হবে তো?'

শীলা বলল, 'আমি আংটি দেব। আপনি বোতাম দিন এক সেট।'

'ঠিক বলেছ। খুব বুদ্ধি তোমার। সার্থক এম. এস. সি. পাশ করেছ। আমার কিছুতেই বুদ্ধি বাগাচ্ছিল না।'

শীলা বলল, 'বাড়িতে তো একজন গ্র্যাজুয়েট আছেন, তাঁর কাছে বুদ্ধি ধার করলেই পারতেন।'

'তাঁকে এঁরা নেমন্তন্ন করেনি। কেন বুদ্ধি দেবে সে?'

কৃত্রিম ক্ষোভে মুখখানি অপরূপ ভঙ্গীতে কুঞ্চিত করল শীলা। বলল, 'কি অন্যায়! আমাদের বিধবাগুলি না-মরলে সমাজের উন্নতি নেই।'

বিকাশ বলল, 'আবার গজাবে, ভয় নেই। সমাজের ব্যবস্থা যা ছিল

তাই থাকবে। সমাজ-সংস্কারকরা উপরে-উপরে আঁচড় দেবেন শুধু।'

শহরে এসে গহনার দোকানে গাড়ি থামিয়ে ওরা যা-যা কিনবার কিনল। কাছেই একটা ওষুধের দোকান ছিল। বিকাশ বলল, 'দু-একটা ওষুধ কিনে নিই।'

শীলা বলল, 'ওষুধ কি হবে?'

বিকাশ বলল, 'ডাক্তারের ওষুধ কি হবে! খাওয়াব তোমাদের।'

শীলা বলল, 'আমি আর কবে ওষুধ খাব আপনার। কাল কি পরশু পাড়ি দিচ্ছি। আর দেখাই হবে না হয়তো সারা জীবনে।'

কান্নার চেয়ে করুণ হাসি হাসল শীলা। বিকাশ চুপ করে রইল।

গাড়ি থেকে নামবার আগেই শীলা বলল, 'স্নান করেই খেতে বসে যাবেন না যেন। ঘরে একটু অপেক্ষা করবেন। আপনার নামেও পুজো করিয়েছি। প্রসাদী ফুল মাথায় দেব—' বলে শীলা বাড়ির ভিতর চলে গেল।

খোকার জন্মদিনের অনুষ্ঠান শেষ হতে বেলা বারোটা বেজে গেল। খোকা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। চোখের সামনে এত খাবার তৈরি রয়েছে, সে কিছু খেতে পারেনি সকাল থেকে। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ামাত্র খেতে বসল।

বিকাশ স্নান সেরে শীলার উপদেশ মতো ঘরে বসে অপেক্ষা করছিল। অনতিবিলম্বে শীলা এসে হাজির হল। হেসে বলল, 'ভুলে যাননি তাহলে।' দরজাটা সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিল। বিকাশ একটু অস্বস্তি বোধ করল। ব্যাপার কি?

টেবিলের উপর একটি পাতার ঠোঙা ছিল। শীলা তা থেকে একটি রক্তকরবীর মালা বার করল। তারপর তার সামনে এসে মালাটি তার গলায় পরিয়ে দিল। তারপর গলায় আঁচল দিয়ে তার সামনে জানু পেতে বসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। বিকাশ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে শীলার কাণ্ড-কারখানা দেখছিল। শীলা প্রণাম করতেই অভ্যাসমতো মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করল।

শীলা উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জারক্ত মুখে বলল, 'আপনার গলায় মালা দিয়ে এক-তরফা বিয়ে সেরে রাখলাম। আপনি আমাকে স্ত্রী বলে স্বীকার না-করুন, আমি নিজেকে আপনার হাতে সমর্পণ করে দিলাম।

আজ হতে যতদিন বেঁচে থাকব, আপনাকে স্বামী বলে মনে করব।'

বিকাশ উঠে দাঁড়াল কিন্তু কি বলবে ভেবে পেল না। শীলা ওর একেবারে বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার কি কিছুই করণীয় নেই?'

বিকাশ বিহ্বল-কণ্ঠে বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, শীলা।'

'বুঝতে পারছেন না? মনের মাঝ থেকে কোনো তাগিদ পাচ্ছেন না?' শীলা বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আপনি তো আমাকে নেননি। আমিই দিয়েছি নিজেকে জোর করে আপনার হাতে তুলে—আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন.' বলে হাসবার চেষ্টা করল।

'শীলা, শীলা—' ডাক শোনা গেল নিচে থেকে। শীলা বলল, 'আপনাকে আর আপনি বলব না। তুমি বলে ডাকব। বুঝলেন? তাহলে আমি চলি, তুমি এস একটু পরে।'

বিকেলের দিকে বিকাশ উষাকে বলল, 'আমি সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে পড়ব।' উষা যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'সে কি দাদা! সন্ধ্যের পরই সব নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকরা আসবেন। নাচ-গান হবে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া হবে। আর তুমি এখুনি চলে যাবে কি রকম?'

বিকাশ বলল, 'আমি থেকে কি করব? তোর নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমার তো পরিচয় নেই যে আমাকে দেখতে না-পেলে তাঁরা হেদিয়ে পড়বেন। নাচ-গানও আমি করব না। খাওয়া-দাওয়ার কথা বলছিস, তা আমাকে না-হয় সন্ধ্যের আগেই চারটি খাইয়ে দিবি।'

প্রবল-বেগে ঘাড় নেড়ে উষা বলল, 'আমি কিছু জানিনে, দাদা। যা বলবার হয় ওঁকে বলগে।'

'ও যে অফিস থেকে এখনো ফিরল না।'

উষা রাগের সুরে বলল, 'ঐ রকমই তো বিদ্যে! সব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকেন। যাই হোক, তোমাদেরই জাত তো!'

বিকাশ একটু ভেবে বলল, 'আমি অফিসেই ওর অনুমতিটা নিয়ে আসি। ওর বুদ্ধিসুদ্ধি ভালো, বোঝে বেশ।'

উষা বলল, 'যাবে কি করে? তোমার গাড়ি শীলা নিয়ে বেরিয়ে গেছে।'

বিকাশ বলল, 'বাঃ, চমৎকার! ফিরবে কখন?'

'ফিরবে শিগগিরই। কিন্তু গাড়ি তো এখন পাবে না। মেয়েদের আনা-নেওয়া করতে হবে। রাত্রি এগারোটার আগে গাড়ি পাবে বলে ভরসা হয় না।'

'তোদের নিজেদের গাড়ি কি হল?'

'একটা গাড়িতে কি হয়? দুটোর দরকার।'

'বেশ, গাড়িটা থাক্। আমি অন্য একদিন এসে নিয়ে যাব। আমি বাসে চলে যাই।'

উষা বলল, 'তোমার এত তাড়াতাড়ি কিসের বল দেখি? অরুণা বুঝি এখানে রাত্রিবাস করতে মানা করে দিয়েছে?'

'ওকে আমি কথা দিয়ে এসেছি সন্ধ্যের আগে ফিরব। না-ফিরলে অত্যন্ত ভাববে। রাত্রে ঘুমোবে না। ফলে কাল আবার শরীর খারাপ হবে।'

'আমি বাস-ড্রাইভারের হাতে খবব পাঠিয়ে দিচ্ছি যে রাত্রে যেতে পারবে না। কাল সকালে যাবে।'

বিকাশ বলল, 'না ভাই উষি, থাক্। আমাকে ছেড়ে দে। রাত্রে ও একা ও-বাড়িতে থাকতে পারবে না।'

উষা বলল, 'আর হাসিও না, দাদা! এতদিন তো একাই কাটিয়েছে ঐ বাড়িতে। তোমার সঙ্গে দেখা না-হয়ে গেলে একাই কাটাতো।'

'কিন্তু এখন সত্যিই ভয় পায়, আমি দেখেছি। ওর দোষ নেই। আমারই ভয় হয় ঐ বাড়িতে থাকতে।'

উষা বলল, 'তোমার ভয় করতে পারে, তুমি তো ও রকম বাড়িতে কখনো থাকনি। ওর ও বাড়িতে থাকা অভ্যেস হয়ে গেছে। ওদের গাঁয়ের বাড়ি ও-বাড়ির চেয়ে ভালো ছিল না। কি জানো? অরুণা ও-সব ন্যাকামী করে আদর কাড়াবার জন্য। ওকে আমি খুব চিনি।'

বিকাশ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

উষা বলল, 'ভাবছ কি?'

বিকাশ বলল, 'ভাবছি. তোদের নাচ-গান শুরু হলে এক ফাঁকে সরে পড়ব।'

উষা বলে উঠল, 'খবরদার, ও রকম করবে না, দাদা। তাহলে আর কোনোদিন কোনো সম্পর্ক রাখব না বলে দিচ্ছি।'

বিকাশ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

উষা জিগগেস করল, 'চা খেয়েছ?'

বিকাশ ঘাড় নেড়ে জানাল—খেয়েছি।

উষা বলল, 'তাহলে চুপচাপ উপরে বসে থাকগে। আমি বাস-ড্রাইভারের হাতে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।'

বিকাশ উপরে গিয়ে বসল। মনটায় ভারি অস্বস্তি। অরুণা সারাদিন একা আছে। কত ছটফট করছে তার জন্য। যদি ঠিক সময়ে পেঁছুতে পারে তাহলে তাকে দেখবামাত্র যে পরিপূর্ণ প্রাপ্তির তৃপ্তিভরা আনন্দ ওর মুখে ফুটে উঠবে, সেই আনন্দ উজ্জ্বল মুখখানি দেখবার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

শীলা এল খাবার নিয়ে। ওর সামনে টুলের উপরে রাখল। কুঁজো থেকে কাঁচের গ্লাশে জল এনে দিল। তারপর সামনে দাঁড়িয়ে রইল। বিকাশ গম্ভীর ও চিন্তিত-মুখে খেয়ে চলেছে। শীলা জিগগেস করল, 'তুমি কি এখুনি যাবে বলেছ?'

'হ্যাঁ।'

শীলা বলল, 'এদের সমস্ত আনন্দ মাটি করে দিতে চাও?'

'আমি না-থাকলে আনন্দ মাটি হবে কেন?'

'উষাদি মনে অত্যন্ত দুঃখ পাবেন। নির্মলবাবুও দুঃখ পাবেন। আর আমি? আমার দুঃখে তোমার কিছু যাবে-আসবে না—তবে আমি, তুমি না থাকলে, রাত্রির অনুষ্ঠানে যোগ দেব না।'

'কেন যোগ দেবে না?'

'তোমার বোঝবার ক্ষমতা নেই। সেদিন এত যত্ন করে রান্না করেছিলাম কেন? তুমি খাবে সেইজন্য। এদের অনুষ্ঠানটি এত সুন্দর করবার চেষ্টা করছি কেন? তুমি এসে দেখবে বলে। আমার যা কিছু আছে সব সুদ্ধ নিজেকে তোমার পায়ে নিবেদন করে দিয়ে সন্ন্যাসিনী

হয়ে চলে যেতে চাই। আর কোনোদিন তোমাকে বিরক্ত করব না। সেটুকুতেও তোমার আপত্তি। আর কয়েক ঘণ্টা বেশি থাকলে যদি একটু সুখ পাই, একটু আনন্দ পাই, তাও দিতে চাও না? আমার কাছে কি কিছুই পাওনি? সত্যি, কেন যে মরতে কলকাতায় এসেছিলাম!'

বিকাশ বলল, 'কলকাতায় আসার কি দোষ হল?'

শীলা বলল, 'কলকাতা না-এলে তোমার সংস্পর্শে আসতাম না। বেঁচে যেতাম তাহলে।'

'এখনো চেষ্টা করলে বেঁচে যেতে পার।'

শীলা বলল, 'বাঁচতে চাইনে আর! পতঙ্গ অগ্নিস্পর্শে এলেই মরে। তবু ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুনে। বাঁচবার সাধ নেই তার। মরণেই তার সুখ, চরম সার্থকতা। আমারও তাই। তুমি ঠিক বুঝবে না। অরুণাদি বুঝবেন।'

নিচে থেকে শীলার জন্য ডাক শোনা গেল। শীলা বলল, 'যদি কেলেঙ্কারী বাধাতে না-চাও তো পালাবার চেষ্টা কোরো না।' হঠাৎ নত হয়ে ওর পা ছুঁয়ে বলল, 'তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, যদি তুমি না-থাক, সব পণ্ড করে দেব।'

বিকাশকে থেকেই যেতে হল। মনটা খঁ্তখঁ্ত করতে লাগল যদিও। উষাকে বার-বার জিগগেস করল, 'খবর পাঠিয়ে দিয়েছিস তো?'

উষা শেষে বিরক্ত হয়ে বলল, 'কতবার বলব, দাদা।'

সন্ধ্যের পর সারা বাড়িটা আলোয় ঝলমল করে উঠল। আনন্দ কলরবে মুখরিত হয়ে উঠল। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা আসতে লাগলেন। তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে যথাস্থানে বসাবার ভার পড়ল বিকাশের উপর। সে ধোপ-দুরস্ত ধুতি, পাঞ্জাবী পরে, নিজের কাজ করতে লাগল।

ধীরেন এল। বিকাশকে দেখে আশ্চর্য হল। বলল, 'তোরা এসেছিস?'

বিকাশ বলল, 'আমি একাই এসেছি। পরে সব বলব তোকে।'

ধীরেন বলল, 'একবারও বেরোসনি?'

বিকাশ বলল, 'তুই তো অফিসে ছিলি।'

'সেখানেও তো যেতে পারতিস।'

'গাড়িটা কেড়ে নিয়েছিল ভাই। তুই বোসগে। আমি এই হাঙ্গামা চুকিয়ে তোর কাছে যাচ্ছি।'

রেবা এসেই বাড়ির মধ্যে চলে গিয়েছিল।

নাচ-গান শুরু হল। শীলা নামল শ্যামার ভূমিকায়। অন্যান্য মেয়ে-গুলি বিভিন্ন ভূমিকায়। একটি হতভাগিনী নারীর আত্ম-বিস্মৃত প্রেমের ব্যর্থতার মর্মান্তিক কাহিনী---শীলার অপূর্ব লাস্যে-হাস্যে, দেহের প্রতিটি অঙ্গের চঞ্চল ভঙ্গিমায় মূর্ত হয়ে উঠল। সকলে মুগ্ধ হল, বিকাশও। প্রত্যেকে শীলার অকুণ্ঠ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

অভিনয় শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ একটি চাপা কলরব শোনা গেল। পুরুষদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। অবিলম্বে মুখে-মুখে খবরটা সবার কাছেই পৌঁছল---শীলা দেবী মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছেন। নির্মল বিকাশের কাছে ছুটে এল, 'দাদা, আসুন শিগগির।'

বিকাশ গিয়ে দেখল, শীলা সাজঘরের মেজেতে পড়ে আছে। মুখে-

চোখে জলের ঝাপটা দেওয়াতে জ্ঞান ফিরেছে। বিকাশ কাছে যেতেই শীলা উঠে বসল। বিকাশ উষাকে ভিড়টা কমিয়ে দিতে বলে শীলাকে বলল, 'চল, যেতে পারবে?'

শীলা বলল, 'পারব।'

শীলাকে উপরের ঘরে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। উষা বলল, 'দাদা, এর পর সকলকে খেতে বসাতে হবে। আমি দেখিগে।'

বিকাশ বলল, 'যা তুই। কোনো চিন্তা নেই। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যা।'

শীলা চুপ করে শুয়েছিল। বিকাশ জিগগেস করল, 'কি কষ্ট হচ্ছে?'

শীলা ধীরে-ধীরে বলল, 'মাথার মধ্যে কি রকম হচ্ছে। বুঝতে পারছি না।'

কুঁজো থেকে জল এনে ওর মাথাটা বেশ করে ভিজিয়ে দিল বিকাশ। তারপর টেবিল-ফ্যানটা কাছে নিয়ে এসে তার গতি বাড়িয়ে দিল চরমে।

আবার মূর্চ্ছার উপক্রম হল। স্মেলিং-সল্টের শিশি টেবিলেই ছিল। এনে শুঁকিয়ে দিতেই চেতনা সঞ্চার হল। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল শীলা, 'আর আমি পারছি না, বুক যেন ভেঙে যাচ্ছে আমার!'

'কি হচ্ছে?' বিকাশ জিগগেস করল।

'বুকের ভিতরটা কি রকম করছে,' হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল শীলা।

বুকটা একটু চেপে ধরল বিকাশ। ধীরে-ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। শীলা প্রবল মাথা নেড়ে বলল, 'ওতে সারবে না। আমি না মলে সারবে না। মেরে দিতে পার আমাকে? দাও না গলা টিপে মেরে।' বিকাশের হাতটা ওর গলাতে চেপে ধরল।

বিকাশ বলল, 'ছিঃ শীলা, চুপ কর। তুমি বুদ্ধিমতী, সবই তো বোঝ।'

শীলা অশ্রুরুদ্ধ, জ্বালা-ভরা কণ্ঠে বলতে লাগল, 'আমি কিছু বুঝতে চাই না। কেন আমি ছাড়ব আমার ন্যায্য পাওনা? মা আমাকে হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন। আমি না-নিয়ে ছাড়ব না।' হঠাৎ বিকাশের হাত দুটোকে জাপটে ধরে বুকে চেপে বলল, 'আমি তোমাকে আর আমার কাছ থেকে কোথাও যেতে দেব না। বল তুমি যাবে না, বল না,

বল না, বল না গো! ওঃ—' আবার মূর্ছার উপক্রম হল। যথাবিধি প্রতিকার করল বিকাশ। ধীরে-ধীরে ওর মাথায়, মুখে হাত বুলিয়ে কিছুক্ষণ ওকে আদর করতে লাগল বিকাশ। তারপর বলল, 'শীলা, তোমাকে একটা কথা বলি শোনো।'

শীলা শান্ত-স্বরে বলল, 'বল।'

বিকাশ বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। সেদিন জংগলের ধারে বসে সেই যে আমার কাঁধে মুখ চেপে কাঁদলে, তখন এর উদয়াভাস টের পেয়েছি। আজ দুপুরে উদয়াচলে এর স্পষ্ট দেখা পেয়েছি। এখন মনের মধ্যে উজ্জ্বল মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। এখন আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। অরুণাকে ভালোবাসি, তোমাকেও ভালোবাসি। এই স্বীকৃতি দুপুরে চেয়েছিলে। এখন তোমাকে জানিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।' উঠে গিয়ে টেবিলের উপর সযত্নে রক্ষিত ও-বেলায় শীলার তাকে পরিয়ে-দেওয়া মালাটি নিয়ে এসে শীলার গলায় পরিয়ে দিল। বলল, 'আমিও তোমাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করলাম।'

উঠবার চেষ্টা করল শীলা। বিকাশ তাকে নিরস্ত করল, 'উঠতে হবে না এখন।'

শীলা বলল, 'তোমাকে প্রণাম করব যে—'

'পরে কোরো।'

শীলা বলল, 'তুমি আমাকে ভালোবাস, তোমার অন্তরের মধ্যে স্থান পেয়েছি—আর কিছু চাইনে আমার। যা পেলাম, একেই সম্বল করে বাকি জীবন কাটিয়ে দেব—'

বিকাশ বলল, 'আমি অরুণাকে গিয়ে সব বলব, কিছু গোপন করব না। ওকে তোমরা যা মনে কর—ও তা নয়। ও খুব ভালো মেয়ে। আমরা তিনজনে মিলে যদি একসংগে সংসার পাততে চাই—ও আপত্তি করবে না।'

শীলা বলল, 'ওসব এখন থাক। আমি দিল্লীতেই থাকব এখন। ওখানের কলেজেই পড়ব। তোমাকে যদি মাঝে-মাঝে একবার করে দেখতে পাই তো আর কিছু চাইব না আমি। আমার ঘুম পাচ্ছে। তুমি আমার কাছটিতে বসে থেক—' বলে ওর কোলে হাত রেখে শীলা ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকাশ সস্নেহে ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগল। ওর নিমীলিত আঁখি-পল্লব, ঠোঁট দুটি, চিবুকটি ও গাল হালকাভাবে স্পর্শ করতে লাগল। তারপর অতি সন্তর্পণে ওর সুন্দর, পেলব ওষ্ঠপুটে একটি চুম্বন রাখল।

উষা ঘরে ঢুকল। চাপা গলায় বলল, 'ঘুমোচ্ছে! তুমি যাও, খেয়ে এসগে, আমি বসছি।'

বিকাশ চলে গেল। খাওয়ার পর আবার এসে পাশে বসল।

বাড়ির উৎসব কোলাহল ক্রমে-ক্রমে থিতিয়ে এল। আনন্দ-প্লাবন শেষ হয়ে গিয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। উষা ও নির্মল এল।

উষা বলল, 'সারাদিন কিছু খায়নি। দুপুরে নামমাত্র খেতে বসেছিল। বিকেলে আয়োজনে ব্যস্ত ছিল, কিছু খেতে চাইল না। আমি জোর করে কিছু চা-খাবার খাইয়ে দিয়েছিলাম। তারপর নাচল। ওর মনের মধ্যে যে আগুন জ্বলছে—তারই রূপ দেবার চেষ্টা করল। কাজেই আর মাথার ঠিক থাকল না। একবার উঠোব নাকি? কিছু খাইয়ে দেব এখন?'

বিকাশ বলল, 'খাবার রেখে যা। উঠলে আমি খাইয়ে দেব। আর দেখ – আমি ভোরেই বেরিয়ে যাব। তোদের বলতে ভুলে গিয়েছিলাম—আমার কাল একবার অনেক দূরে একটা রোগী দেখতে যেতে হবে। সকাল আটটাতে বেরোতে হবে। তার আগে ওখানে পৌঁছানো চাই।'

উষা বলল, 'বেশ তো! যেও। তবে মাঝে-মাঝে একবার করে দেখা দিয়ে যাবে। শীলা তো কালই কলকাতা যাবে বলছিল। তবে কাল আর ছাড়ব না। যায় তো পরশু যাবে। আর কবে দেখা হবে কে জানে? ভারি ভালো মেয়ে, দাদা! এমন মেয়ে আমি দেখিনি। আমাদের সংসারে আসবার জন্য কত আগ্রহ! অথচ আসতে পারল না। তোমার অদৃষ্ট খারাপ, দাদা! অল্প বয়েসে মা-বাপ গেল, ধন-সম্পত্তি সব গেল, এমন লক্ষ্মীর মতো মেয়ে হাতে পেয়েও পায়ে ঠেললে। তোমার ভাগ্যে সুখ নেই, দাদা!'

বিকাশ বলল, 'তা আর এখন দুঃখ করে কি করবি?' উষা হাই তুলছিল বসে-বসে। বলল, 'যা-ঘুমোগে যা।'

রাত দুটোয় ঘুম ভাঙল শীলার। ঘরে মৃদু নীলাভ আলো। কখন এসে শুয়ে পড়েছে সে! মশারি ফেলা হয়নি। বালিশটা ভিজে-ভিজে মনে হচ্ছে, মাথার চুলগুলোও ভেজা যে! নিদ্রা-কুহেলিকা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে এল। সব ঘটনা মনে পড়ল একে-একে।

বিকাশ একটা ইজি-চেয়ারে শুয়েছিল। শীলা পাশ ফিরতেই চমকে উঠে তাকিয়ে বলল, 'ঘুম ভেঙেছে!' উঠে এসে পাশে বসে বলল, 'কেমন মনে হচ্ছে?'

শীলা ক্ষীণ-স্বরে বলল, 'বড় দুর্বল মনে হচ্ছে।'

বিকাশ নীল আলোটা নিভিয়ে দিয়ে উজ্জ্বল আলোটা জেলে দিল। বলল, 'উঠতে পারবে?'

শীলা বলল, 'হ্যাঁ।'

তবু বিকাশ শীলা যেন অনেকদিনের রোগী তেমনি যত্নের সঙ্গে তাকে উঠিয়ে বসিয়ে দিল। শীলা আপত্তি করল না। মনকে বলল— যতটুকু পাওয়া যায় সংগ্রহ কর, সঞ্চয় কর। শোষণ করে নাও সমস্ত দেহ, মন, আত্মা দিয়ে। এই তো সারা জীবনের সম্বল। শীলা বলল, 'মাথাটা ভিজে গেছে যে!'

বিকাশ বলল, 'এই মুছিয়ে দিচ্ছি—' বলে তাড়াতাড়ি নিজের তোয়ালে নিয়ে এসে পরম যত্নে ওর মাথা মুছে দিল, মুখখানি মুছে দিল। তারপর বলল, 'ইজি-চেয়ারটায় বসবে চল। তোমার খাবার দিয়ে গেছে।'

শীলা বলল, 'কিছু খাব না—'

'সারাদিন তো কিছু খাওনি। অন্তত কিছু ফল-মিষ্টি আর দুধ খাও। আমি দুধটা গরম করে দিচ্ছি।'

বিকাশ শীলাকে উঠিয়ে, ধরে এনে ইজি-চেয়ারে বসিয়ে দিল। খাবার দিল সামনে। ইলেকট্রিক স্টোভে দুধটা গরম করতে লাগল।

শীলা বলল, 'খুব খাটিয়ে নিলাম।'

বিকাশ বলল, 'আমার জন্য অনেক খেটেছ। তার তুলনায় কিই বা করতে পারলাম।'

খাওয়ার পর শীলা বলল, 'সারারাত্রি জাগতে হল তোমাকে।'

বিকাশ বলল, 'তাহোক—ডাক্তারদের রাত জাগা অভ্যেস আছে।'

শীলা বলল, 'আজ দুজন জেগেই কাটিয়ে দিই কি বল? বিয়ে হল আজ — আজ আমাদের বাসর জাগা।'

রাত চারটে বাজল। বিকাশ বলল, 'এবার আমাকে যেতে হবে।' বিকাশ ও শীলা পাশাপাশি বসেছিল। বিকাশের একটি হাত ছিল শীলার হাতে। হাতটিতে চাপ দিয়ে শীলা বলল, 'এখনই যাবে? আর একটু থাক না।'

বিকাশ বলল, 'ছেড়ে দিতেই যখন হবে, তখন দু-দণ্ডের জন্য মায়া বাড়িয়ে লাভ কি?'

'সত্যি! কি যে কষ্ট হচ্ছে! মনে হচ্ছে — এইখানেই কোথাও যদি একটা চাকরি পেতাম তো থেকে যেতাম। মাঝে-মাঝে তুমি এসে দেখা দিয়ে যেতে।'

বিকাশ বলল, 'তুমি এখন কলকাতায় যাবে তো?'

'হ্যাঁ। তারপর ওখান থেকে দিল্লী।'

'তোমার বাবার সঙ্গে বিলেত যাবে নাকি?'

'তুমি যা বলবে।'

'আমাকে না-জানিয়ে কোথাও যেও না।'

যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল বিকাশ। পোশাক পরল। শীলা ওর ধুতি পাঞ্জাবী ইত্যাদি সব গুছিয়ে স্যুটকেসে রেখে দিল। প্রসাদী ফুল বিকাশের মাথায় ঠেকিয়ে স্যুটকেসের এক কোণে রেখে দিল। তারপর বিকাশের সামনে এসে দাঁড়াল। আগামী সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ-বেদনার ছায়া ওর মুখখানিকে ম্লান করে দিয়েছে। ওর চোখ দুটিতে অপরিমেয় ভালোবাসা জমাট হয়ে রয়েছে। একটি করুণ স্নিগ্ধ হাসি ওর লাল ঠোঁট দুটিতে স্থির হয়ে রয়েছে।

বিকাশ হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'চলি তাহলে।'

শীলা প্রণাম করল। গলায় মালাটি রয়েছে। মালাটি হাত দিয়ে ছুঁল। তারপর বিকাশের বুকের কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রত্যাশা-ব্যাকুল চোখে চাইল ওর মুখের দিকে। বিকাশ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওর অধরোষ্ঠে একটি প্রগাঢ় চুম্বন এঁকে দিল।

নিচে নেমে এল দুজনে। শীলা বলল, 'সারারাত্রি ঘুমোওনি। খুব সাবধানে যেও।'

'আচ্ছা,' বলে বিকাশ একটু এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল — বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাল, তারপর শীলার বাহুটি চেপে ধরে একটু টান দিতেই শীলা ওর বুকের কাছে এল। তারপর শীলার মুখটি দু-হাতে অতিশয় মমতার সঙ্গে ধরে, ওর মুখে চুম্বন দিয়ে বলল, 'আবার দেখা হবেই, শীলা। আমি কথা দিচ্ছি, তুমি কিছু ভেব না।'

শীলা কিছু বলল না। ওর দু-চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল।

বিকাশের গাড়ি কম্পাউন্ড থেকে বার হয়ে রাস্তায় পড়ল। দ্রুতবেগে বড়-রাস্তার দিকে চলল। শীলা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। গাড়ির পিছনের লাল আলোটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই বাড়িতে ফিরে এল। নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।

ত্রিশ মাইল বেগে চলল বিকাশ। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। বড়-রাস্তায় পড়েই বেগ আরও বাড়িয়ে দিল। অরুণার কাছে পৌঁছতে হবে রাত্রি শেষ না-হতেই। শহর পিছনে পড়তেই ওর মনের দিগন্তে নবোদিত তারাটিও যেন পিছনে পড়ল। সামনের আকাশে ওর চিরদিনের তারাটি জ্বলজ্বল করতে লাগল। পিছনের সব কিছু অন্ধকারে ঢাকা পড়ল। সামনের সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অরুণা এখন কি করছে কে জানে? সারারাত্রি ঘুমোয়নি, জানলার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে এতক্ষণে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। চাকরটা খুব সজাগ, দরজা খুলে দেবে একবার ডাকতেই। কানাইকে ওঠানোই শক্ত। ওর ঘুম সহজে ভাঙবে না। অরুণারই ঘুম আগে ভেঙে যাবে। ও-ই উপরের দরজা খুলে দেবে উঠে। তারপর অরুণাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোবে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ডাকে বেরুবে। অরুণাকেও নিয়ে যাবে সঙ্গে। অনেকদিন ওকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া হয়নি।

বাইরের কোলাহল আর নেই। যে-জীবনপ্রবাহ বাইরের অবাঞ্ছিত

আক্ষেপে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, ঘুলিয়ে উঠেছে, তা আবার শান্ত ও স্বচ্ছ হয়ে আসবে। ধীরে-ধীরে দুজনে মিলে গড়ে তুলবে তাদের শান্তির নীড়। দেখতে-দেখতে শিশু-দেবতার আবির্ভাব ঘটবে, প্রিয়া জননী-মূর্তিতে রূপান্তরিতা হবে। জীবন সার্থক হবে, সাফল্যময় হবে।

অন্যমনস্ক হয়েছিল বিকাশ। একটা মোড় ঘুরতেই সামনেই একটা ট্রাকের আলো চোখে পড়ল। নিজেকে আয়ত্ত করে না উঠতেই ট্রাকটা এসে পড়ল। ধাক্কা দিল মাডগার্ড-এ। প্রচণ্ড ধাক্কায় বিকাশ রাস্তা থেকে দূরে ছিটকে পড়ল। একটা পাথরের চাংড়ায় মাথায় আঘাত লাগল। অজ্ঞান হয়ে পড়ল এক মুহূর্তে।

গাড়িটা কতকটা ঘুরে কাত হয়ে পড়ে গেল।

সারাদিন অরুণার কাটল সন্ধ্যায় বিকাশের আসার প্রতীক্ষায়। শুয়ে-বসে, বই পড়ে; বিকাশের জন্য নানা রকম খাবার তৈরি করে; ঘরের জিনিসপত্র গুছিয়ে। হাত কাজ করে, মন আসন্ন মিলন মুহূর্তটিকে ঘিরে রঙিন সুতোর জাল বোনে। গ্রীষ্মের তাপদাহের মধ্যেও চাষী যেমন সমস্ত চেতনা পূর্ব-দিগন্তের দিকে বর্ষার নব-মেঘ সঞ্চারের প্রতীক্ষায় একাগ্র করে রাখে, অরুণার মনও তেমনি নিঃসঙ্গতার মধ্যে আসন্ন মিলনের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে রইল।

বিকেল না-হতেই বার হয়ে পড়ল কতকটা এগিয়ে যাবার জন্য। একটু দূরে রাস্তার পাশে যে ছোট শালবনটা আছে তার ধারে গিয়ে বসে থাকবে। বিকাশ আসবার সময় তাকে লক্ষ্য করবে না, চলে আসবে। এসে দেখবে অরুণা নেই। কোথায় গেল? কানাই বলবে—জানিনে তো। কাছেই তো বেড়াচ্ছিলেন, আশ্রমে গেছেন হয়তো।

বিকাশ বলবে—হয়তো কি রে! দেখিসনি! ঠিক জানিস আশ্রমে গেছে? আশ্রমে তো যায় না এ-সময়ে। অরুণা এসে পড়বে। অভিমানে মুখ থমথম করবে তার। বলবে—রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম কতক্ষণ থেকে, দেখলে না। ডাকলাম, শুনলে না। বিকাশ আশ্চর্য হয়ে বলবে—তাই নাকি! চোখ-কান কি আমার সঙ্গে ছিল, এগিয়ে এসে এখানে তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছিল। তারপর কত আদর করবে তাকে। খাবার খেতে বসে বলবে—এত খাবার করেছ বুঝি বসে-বসে? তুমি খাবে না? সে বলবে—খাব এখন। বিকাশ তার মুখে খাবার গুঁজে দেবে।

অনেকক্ষণ বসে রইল বনের ধারে। সন্ধ্যে হয়ে এল। এল না তো! কি হল? আটকে দিল নাকি? উষার অসাধ্য কিছু নেই। যতটুকু কষ্ট তাকে দিতে পারে।

রাত্রে খেল না কিছুই। শরীর ভালো নেই। ঘুমোল না। বসে রইল সারারাত জানলার ধারে। কি হল? আসবে না নাকি! মিথ্যে করে ডেকে

নিয়ে গিয়ে আটকে দেবে নাকি! বড়দিদি এসেছেন নিশ্চয়। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরা সব এসেছে। অকাল নয়, কনেও মজুত। ধরে বিয়ে দেবে নাকি? বিশ্বাস কিছুই নেই। বড়দিকে ভয় করে সবাই। বড়জামাইবাবু পর্যন্ত ভয়ে তটস্থ। তার উপর উষার কান্নাকাটি, মূর্চ্ছাও যেতে পারে দরকার হলে। বিয়ে করতে বাধ্য হবে। তারপর চিঠি আসবে: 'কিছু মনে কোরো না। আত্মীয়স্বজনদের অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না। তোমার কিছু চিন্তা নেই। নির্মল সব ব্যবস্থা করবে। মাস্টারনীর চাকরি খালি আছে এখনো। ঢুকিয়ে দেবে।'

তারপর? আবার সেই নিঃসঙ্গ, নিরাশ্রয়, নিরানন্দ জীবন। সেই নিরাশায় কালো দিনগুলির অন্তহীন মিছিল। সেই আশাহীন, প্রতীক্ষা-হীন, গন্তব্যহীন জীবন-পথে কণ্টকবিদ্ধ, রক্তাক্ত ক্লান্ত পা দুটিকে টেনে-টেনে পথ চলা! বাদলা দিনের অবসানে, সন্ধ্যার সোনালী মায়া দেখতে-দেখতে মিলিয়ে গিয়ে, আবার আসবে অমা-রাত্রির অন্ধকার। তারপর পথের পাশে একদিন মৃত্যু হবে। কেউ থাকবে না কাছে, কেউ জানবে না, কেউ ফেলবে না এক ফোঁটা চোখের জল।

বিকাশ কি তাই করবে? কাটিয়ে উঠতে পারবে না সঙ্কীর্ণমনা, স্বার্থপর, বিচার-বুদ্ধিহীন নিষ্ঠুর আত্মীয়স্বজনের অনুরোধ? কে জানে কি আছে তার ভাগ্যে!

বাস আসবে বেলা দশটায়। ততক্ষণ অরুণা কাটাবে কি করে? সকাল থেকে মুখ ধোয়নি, খায়নি, দাঁড়িয়ে আছে বাইরে পথের দিকে চেয়ে। যদি সকালে আসে। বেলা দশটায় কানাইকে পাঠাল বাস-ড্রাইভারের কাছে। ওখান থেকে কোনো খবর এসেছে কিনা জেনে আসতে।

কানাই এসে বলল — বাবুর খবর জানে না। তবে রাত্রিতে এই রাস্তায় দুটো গাড়িতে ধাক্কা লেগেছে। একটা গাড়ি রাস্তার ধারে পড়ে আছে। গাড়িতে যারা ছিল তাদের শহরে নিয়ে গেছে।

অরুণার বুকের ভিতরটা যেন থেমে যাবে মনে হল। মাথা ঘুরে গিয়ে চোখের সামনে আঁধার ঘনিয়ে এল। মাথাটা দু-হাতে ধরে মাটিতে বসে পড়ল।

সামলে নিয়ে জিগগেস করল কানাইকে, 'কাদের গাড়ি জিগগেস করলি?'

কানাই বলল, 'ওরা জানে না বলল।'

'গাড়িটা কি রকম?'

'তা তো জিগগেস করিনি।'

ঠাকুর-চাকর কাছে এসে দাঁড়াল। ঠাকুর বয়স্ক লোক। স্নেহ করে অরুণাকে। জল এনে অরুণার মুখে-চোখে দিল। সান্ত্বনা দিল। ভয় নেই মা, বাবু অন্য কাজে আটকে গেছেন নিশ্চয়। তবু মন মানে না তো, দুটোর বাসে চলে যান।

দুটোর বাসেই অরুণা কানাইকে নিয়ে শহরে চলল। রাস্তার পাশে কোনো ভাঙা মোটর দেখতে পেল না। নিয়ে চলে গেছে বোধহয়। বাসের আরোহীদের মধ্যে দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কথাবার্তা চলতে লাগল।

শহরে পেঁছুল চারটের সময়ে। অরুণা স্থির করেছে আগেই ধীরেন-বাবুর বাড়ি যাবে। ধীরেনবাবু নিশ্চয়ই জানেন সব খবর। না-জানলেও চেষ্টা করলেই জানতে পারবেন।

সারা পথ অরুণা প্রার্থনা করতে-করতে এসেছে, ও যেন ভালো থাকে। যা ইচ্ছে হয় করুক, যাতে ওর আপনার লোকদের সুখ-শান্তি হয় তাই করুক। আমার অদৃষ্টে যা হবার হবে। হে ভগবান, হে ঠাকুর, ওকে ভালো রেখ। ওকে সুস্থ দেহে বাঁচিয়ে রেখ। ওর সব বালাই নিয়ে আমি যেন চলে যাই, হে ভগবান! হে ঠাকুর!

একটা রিক্সাতে কানাইকে পাশে নিয়ে ধীরেনের বাড়ি চলল। এখনো মনে-মনে ঐ প্রার্থনাই করছে---যেন ওর ভালো খবর পাই, যেন ওকে ভালো দেখি।

ধীরেনের বাড়িতে পেঁছুল। ধীরেন বাড়ীতে ছিল। অরুণা বসবার ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠে বলল, 'এলে? ওরা খবর দিয়েছিল?'

'কি খবর?' ভয়ে-ভয়ে জিগগেস করল অরুণা।

'জানো না? খবর দেয়নি তোমাকে? আমি ভাবতেই পারি না যে! রেবা বলছিল, খবর দেবে না। এখুনি ভাবছিলাম তোমার কথা। ভাব-ছিলাম একবার গিয়ে নিয়ে আসব নাকি!'

অরুণা একটা চেয়ারে বসে পড়ল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন হিম হয়ে আসছে। বলবার চেষ্টা করল, কি হয়েছে বলুন। কণ্ঠস্বর ফুটল না। হঠাৎ অরুণার চোখের সামনে ঘনিয়ে এল রাশি-রাশি কুয়াশা—ধীরেন

ও জিনিসপত্র-সমেত ঘরটা কোথায় হারিয়ে গেল। চেতনা হারাল অরুণা।

ধীরেন দেখতে পেল, বুঝতে পারল অরুণার অবস্থা। চায়ের পেয়ালা সামনের টুলে নামিয়ে দিয়ে, ছুটে এল কাছে। চিৎকার করে বলল, 'রেবা! রেবা! এস এখানে।'

রেবা ছুটে এল। অরুণাকে দেখে বিস্ময়ের স্বরে বলল, 'কখন এলেন? কি হল?' ধীরেন বলল, 'মুর্চ্ছা গেছে। জল নিয়ে এস।'

রেবা জল নিয়ে এসে মুখে-চোখে জলের ছিটা দিতে লাগল, আর বলতে লাগল, 'আসবামাত্র জানিয়ে দিলে? কি বুদ্ধি তোমার! খান-দাননি, এতটা রাস্তা দুশ্চিন্তা নিয়ে এসেছেন। ভারি কম বুদ্ধি তোমার!'

ধীরেন বলল, 'সত্যি! ভালো করিনি—' কাছে এসে ডাকতে লাগল, 'অরুণা! অরুণা!' জ্ঞান হল। মাথা তুলে লজ্জিত-মুখে অরুণা বলল, 'কি রকম হয়ে গেল! ভারি কষ্ট দিলাম আপনাদের।'

রেবা ওকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে সোফার উপর বসিয়ে দিল, মাথার উপর পাখাটা খুলে দিয়ে বলল, 'একটু শুয়ে থাকুন।'

ধীরেন ধীরে-ধীরে পরিচয় দিল--গুরুতর এ্যাকসিডেণ্ট। ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ছিটকে পড়ে মাথায় আঘাত পায়। হাত-পা মাথা ফেটে গিয়ে অজস্র রক্তক্ষরণ হয়েছে। অত্যন্ত দুর্বল। ডাক্তার এখনো বিপদ-মুক্ত বলে রায় দিতে পারেননি।

রেবা এক গ্লাশ দুধ এনে বলল, 'খান দেখি।'

অরুণার চোখে জল এল। বলল, 'ভাই, বিপদের দিনে তোমার এই স্নেহ আর আশ্বাস চিরদিন মনে থাকবে—কিন্তু খেতে পারব না। গলা দিয়ে কিছু এখন পার হবে না। ওঁকে আগে দেখে আসি।'

রেবা বলল, 'খেয়ে নিন। একেবারে নেতিয়ে পড়েছেন যে! একটু শক্তি সঞ্চয় করুন! সেখানে কত দিক থেকে কত আঘাত সহ্য করতে হবে তা তো জানেন না।'

অরুণা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

রেবা বলতে লাগল, 'যারা স্বামীর এই বিপদে স্ত্রীকে খবর দেয়নি, তাদের মনোভাব তো বুঝতে পারছেন। আপনাকে দেখে তারা খুশি হবে না—তাও বোঝা শক্ত নয়। কাজেই দেহ ও মনকে যে কোনো আঘাত সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত করতে হবে।'

[২৯]

ধীরেন অরুণাকে নির্মলের বাড়ি নিয়ে গেল। নির্মল বারান্দায় বসেছিল। অত্যন্ত চিন্তিত ভাব, যেন কারও আগমন প্রতীক্ষা করছে। ধীরেনের গাড়ি কম্পাউণ্ডে ঢুকতেই শশব্যস্ত হয়ে নেমে এসেছিল। ধীরেনকে দেখে হতাশ হয়ে বলল, 'ওঃ আপনি!'

ধীরেন জিগগেস করল, 'কেমন আছে?'

'ভালো নয়। ডাক্তারবাবুকে ফোন করেছি। এখনো এলেন না।' তার-পর অরুণার দিকে নজর পড়তেই বলল, 'উনি কখন এলেন?'

ধীরেন বলল, 'এইমাত্র।'

অরুণা নেমে নির্মলকে নমস্কার করে জিগগেস করল, 'কেমন আছেন উনি? আমি একবার দেখতে পাব?' ভিখারিণীর প্রার্থনার সুর লাগল ওর কণ্ঠে।

নির্মল অপ্রতিভের মতো বলল, 'আপনাকে খবর দেওয়া হয়নি। সকাল থেকে কোথায় ডাক্তার, কোথায় ওষুধ, কোথায় বরফ! কলকাতায়, দিল্লীতে তারে খবর দেওয়া, ওখান থেকে তারের জবাব দেওয়া! তার উপর সকলকে সামলানো। ওর এই শারীরিক অবস্থায় ওকে সামলানো: কেমন করে যে দিনটা কেটেছে!'

ধীরেন বলল, 'কোথায় আছে?'

নির্মল বলল, 'তেতলার ঘরে।' একটু থেমে ধীরেনকে বলল, 'আপনি যান ওঁকে নিয়ে। আমি ডাক্তারবাবুর জন্য অপেক্ষা করছি।'

তেতলার ঘরে একপাশে একটা খাটে বিকাশের অচৈতন্য দেহ শায়িত। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সারা গা চাদর দিয়ে ঢাকা। পাতলা চাদরের ভিতর দিয়ে হাতে-পায়ের আহত ও ক্ষত স্থানের ব্যাণ্ডেজ দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটি নিমীলিত। অতি ধীরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে।

মাথার কাছে একটা টেবিল ফ্যান ঘুরছে। শীলা বিকাশের মাথায় আইসব্যাগ চাপিয়ে বসে আছে। কাছেই একটা চেয়ারে বসে আছে উষা।

দুজনেরই মুখ বিষণ্ণ। ধীরেনকে দেখে উষা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে সাদর আপ্যায়ন করল, 'আসুন, বসুন।' পিছনেই অরুণাকে দেখে ওর মুখে প্রথমটা জাগল বিস্ময়, পরে বিরক্তি। নীরস-কণ্ঠে জিগগেস করল, 'তুমি কখন এলে?'

অরুণা এগিয়ে এসে বলল, 'এখুনি।' বিকাশের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েই কেঁদে ফেলল।

উষা তিরস্কারের সুরে বলল, 'কান্নাকাটি কোরো না ভাই! ডাক্তার নিষেধ করেছে।'

অরুণা কান্না চাপল সবলে। মুখ লাল হয়ে উঠল, অশ্রু-বাষ্পের চাপে কণ্ঠনালী টনটন করে উঠল, ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপতে লাগল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছল অরুণা। শীলাকে জিগগেস করল, 'ডাক্তারবাবু কি বলেছেন?'

শীলা গম্ভীর-কণ্ঠে জবাব দিল, 'এখনো কিছু বলা যায় না।' একটু থেমে বলল, 'ভগবানের দয়া, আর আমাদের অদৃষ্ট।'

ডাক্তারবাবু এলেন। উষা বলল, 'এস অরুণা বাইরে যাই।' শীলা উঠে দাঁড়াল। বাইরে গিয়ে উষা অরুণাকে বলল, 'এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

নিজের ঘরে অরুণাকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে, ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে দিল। বলল, 'অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছেন। কে হয়তো এসে পড়ে তোমাকে দেখে ফেলবেন। শেষে নানা কথার সৃষ্টি হবে। ওঁদের কেউ জানেন না, দাদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে। শুধু আমার শাশুড়ী জানেন।'

একটু চুপ করে থেকে উষা বলতে লাগল, 'এ্যাকসিডেণ্টের পরই দাদা একেবারে অজ্ঞান হয়ে যায়। ট্রাকওয়ালা ওকে ট্রাকে চাপিয়ে হাসপাতালে আনে। হাসপাতালের ডাক্তার ওকে চিনতেন। কাল খোকার জন্মদিনে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি এখানে ফোন করেন। উনি সঙ্গে-সঙ্গে যান। তারপর এখানে আনা হল। গাড়িটা ভেঙে পড়েছিল। সেটা আনার ব্যবস্থা হল। গাড়িটার অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছে। তা হোক, দাদা বাঁচলে কত ভালো গাড়ি হবে। কিন্তু এখনো কোনো আশা নেই। কি যে হবে ভগবান ছাড়া কারও বলবার সাধ্য নেই। দাদাকে নিয়ে আসবামাত্র আমি

তো দেখেই মূর্চ্ছা গেলাম। শীলা ঘাবড়ায়নি মোটেই। জোর করে মনকে ইস্পাতের মতো শক্ত করে পাশে বসল। সেই থেকে পাশে বসে আছে, নড়েনি একটুও। নায়নি, খায়নি পর্যন্ত। অদ্ভুত মেয়ে! যেমন ধৈর্য, তেমনি মনের জোর। সীতা সাবিত্রীর জাত। আমি কাঁদতে-কাঁদতে গেলাম মা-কালীর মন্দিরে, সেখানে গিয়ে মা'র সামনে লুটিয়ে পড়লাম। কেঁদে বললাম—বাঁচিয়ে দাও মা! আমাদের একটিমাত্র ভাইকে কেড়ে নিও না। মন্দিরের পুরোহিত মাকে পুজো দিলেন দাদার নামে। তিনি আমার সঙ্গে এলেন মা'র প্রসাদী ফুল নিয়ে। দাদার মাথায় নিজের হাতে ঠেকিয়ে দিলেন। আশীর্বাদ করলেন। পুরুতমশাই ভালো জ্যোতিষী। আমাদের ভাই-বোনদের কোষ্ঠী সব ওঁর কাছে আছে। পুরুতমশাইকে দাদার কোষ্ঠী দেখানো হল। কি বললেন জানো? তোমার ভালো করে শোনা উচিত। তাহলেই বুঝতে পারবে, আমি সেদিন সত্যি কথাই বলেছিলাম—'

অরুণা নীরবে ভাবলেশহীন মুখে বসে আছে। সব চেয়ে মর্মান্তিক আঘাতের জন্য মনকে প্রস্তুত করেছে। নিরস্ত্র সৈনিক শত্রুর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে যে-ভাবে মারাত্মক আঘাতের জন্য প্রতীক্ষা করে, ওরও সেই ভাব।

উষা বলতে লাগল, 'মস্ত বড় ফাঁড়া গেছে। মৃত্যুর সমতুল্য। একটি মেয়ের সঙ্গে এঁর ভাগ্য জড়িয়ে আছে। মেয়েটি অত্যন্ত দুর্ভাগিনী। তারই দুর্ভাগ্যের ফলে এই বিপত্তি। কি হবে বলা শক্ত। তবে আর একটি ভাগ্যবতী মেয়ের ভাগ্যপতি শুভগ্রহের দৃষ্টি রয়েছে এঁর পরে—যদি তার ফলে বিপদ কেটে যায়। তবে প্রথম মেয়েটি যদি এঁর জীবন থেকে সরে যায়—তাহলে ইনি নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন।'

একটু চুপ করে বলল, 'তোমাকে আমি এ-কথাই বলেছিলাম সেদিন। তুমি অযথা রাগারাগি করলে। তোমার যে ভাগ্য মন্দ—এ-বিষয়ে কি কারও সন্দেহ আছে? বাবা গেছে, মা গেছে—'

অরুণার বলতে ইচ্ছা হল—সে তো তোমারও গেছে। কিন্তু চুপ করে রইল।

উষা বলতে লাগল, 'ভাই গেছে, স্বামী গেছে। ভাঙা বাসন-কোসন জোড়া লাগে, ভাঙা মেজে-দেয়াল মেরামত হয়, কিন্তু কপাল ভাঙলে আর জোড়া লাগে না, মেরামত হয় না। কেন বৃথা চেষ্টা করেছ? চেষ্টা কর, যা ইচ্ছে কর, আমার দাদাকে কেন জড়িয়ে ফেললে? আমাদের তো

আর কেউ নেই। ওকে নিষ্কৃতি দাও। ওকে ছেড়ে দাও। ওকে বাঁচতে দাও। তোমার হাতে ধরে ভিক্ষা চাইছি ওকে—' বলে অরুণার দুটি হাত জাপটে ধরে কেঁদে ফেলল উষা।

উষার প্রার্থনা-ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণা বলল, 'আমি সরে যাব ওঁর কাছ থেকে। তোমরা ভেব না।'

উষা নিশ্চিন্ত হল। অরুণা আর যাই করুক, কথা দিলে তা ভাঙে না। এটুকু ওকে বিশ্বাস করা যায়। কান্না সম্বরণ করল অবিলম্বে ও অবলীলাক্রমে। বলল, 'আর একটি কথা, এখানে তো তোমার থাকা চলবে না।'

অরুণা নীরস-কণ্ঠে জবাব দিল, 'এখানে থাকতে আসিনি। যে চির-দিনের জন্য চলে যাচ্ছে, তার দু-দণ্ডের লোভ করে লাভ কি? তবে একটি প্রার্থনা করছি তোমার কাছে—ওঁকে আর একটিবার দেখব আর পায়ের ধুলো নেব।'

উষা বলল, 'দেখায় আপত্তি নেই। কিন্তু ধুলো-টুলো নেওয়া চলবে না। ওসব অলক্ষুণে ব্যাপার।'

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে নির্মল ও ধীরেন নেমে গেল। উষার পিছনে-পিছনে অরুণা বিকাশের ঘরে ঢুকল। শীলা গম্ভীর-মুখে বসে আছে। উষা জিগগেস করল, 'ডাক্তারবাবু কি বললেন?'

শীলা বলল 'আজকের রাত্রি না-কাটলে কিছু বলতে পারবেন না।'

হঠাৎ অরুণা বলে ফেলল, 'কোনো বিপদ হবার আশঙ্কা আছে নাকি?'

শীলা বলল, 'সে রকম কিছু বললেন না।'

অরুণা মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শীলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি বসবেন?'

অরুণা বলল, 'না ভাই। তুমি যা করছ কর, আমি একটু দেখি।'

অরুণা একদৃষ্টে বিকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর মনে হল, এই শেষ দেখা! আর হয়তো কখনো দেখা হবে না, এ-জীবনে, পর জীবনেও না কোথাও না। অশ্রু-বাষ্পে সারা অন্তর ছেয়ে গেল, অরুণা কিন্তু চোখে-মুখে তার বিন্দুমাত্র আভাস ফুটতে দিল না। শুধু তার বুকের ভিতরটা তীক্ষ্ণ বেদনায় টনটন করতে লাগল।

গাড়ির শব্দ শোনা গেল। ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। যাবার কথা মনে পড়ল অরুণার। যেতে হবে এবার। ধীরে-ধীরে চলে এল বিছানার কাছ থেকে। উষাকে বলল, 'চলি ভাই!'

উষা জবাব দিল না। শীলা সবিস্ময়ে জিগগেস করল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

এক ফোঁটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল অরুণার মুখে, বলল, 'ফিরে যাচ্ছি।'

অধিকতর বিস্ময়ের সঙ্গে শীলা বলে উঠল, 'সে কি!'

অরুণা জবাব দিল না। ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

উষা পিছু-পিছু গিয়ে বলল, 'একটা কথা, দাদার জিনিসগুলো কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও।'

নির্মল ও ধীরেন বারান্দায় গল্প করছিল। ওকে দেখেই নির্মল বলে উঠল, 'এখুনি চললেন?'

'হ্যাঁ, নমস্কার।' বলে এগিয়ে গিয়ে অরুণা গাড়িতে উঠে বসল।

পরদিন সকালে ধীরেন অরুণা ও কানাইকে নিজের গাড়ি করে পৌঁছে দিল। অরুণা বার-বার ধীরেনকে বলল, 'দাদা! পৃথিবীতে এখনো আমার আপনার জন আছে, দেখে বড় সান্ত্বনা পেলাম। মনে সাহস পেলাম।'

ধীরেন বলল, 'অরুণা, আমার নিজের বোন নেই। তুমি রবির বোন। তোমাকে নিজের বোনের মতোই দেখেছি। আমার নিজগুণে নয়, তোমারই গুণে। রেবা তোমাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। যদি কখনো কিছু প্রয়োজন হয় আমাকে জানাতে দ্বিধা কোরো না। যদি বিকাশের আত্মীয়স্বজনদের পক্ষ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা হয়, আমাকে জানিও। বিকাশ আমার বাল্যবন্ধু, তাকে খুব ভালো করে চিনি—কোনো অন্যায় কাজ করা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। তবু যদি অবস্থার ফেরে বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে তোমার উপর কোনো অবিচার করে বসে, আমি তার বিচার-বুদ্ধিকে জাগিয়ে দিতে পারব।'

অরুণা তার সঙ্গে উষার কথাবার্তার কথা ধীরেন ও রেবাকে বলেনি। ভবিষ্যতে ও কি করবার সংকল্প করেছে, তারও আভাস দেয়নি। পৃথিবীতে তার একমাত্র সত্যিকারের কল্যাণকামী স্বামীজীকে ছাড়া সে কাউকেও কিছু বলবে না। স্বামীজী যা উপদেশ দেবেন, তাই সে করবে বলে স্থির করেছে।

অরুণা ধীরেনকে উপরে এনে বসাল। তারপর জিগগেস করল, 'আপনি এ-বেলাই যাবেন?'

ধীরেন বলল, 'হ্যাঁ ভাই, আজ আমাকে যেতেই হবে।'

অরুণা বলল, 'আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। ওঁর জিনিসপত্র-গুলি নিয়ে গিয়ে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।'

বিকাশের সব জিনিসগুলি অরুণা ওর স্যুটকেসে ভরল। বিকাশ এখানে আসার পর যা-যা জিনিস তাকে দিয়েছে—কাপড়-চোপড়, গয়না-গাটি, আরও নানা জিনিস—সেগুলি ভরল কতক স্যুটকেসে, কতক বিছানার সঙ্গে বেঁধে দিল। অন্যান্য জিনিস থলের মধ্যে ভরে দিল। বন্দুকটা ধীরেনের হাতে দেবে ঠিক করল। ওরা বিয়ের পর কলকাতায়

গিয়ে দুজনে ছবি তুলেছিল। তিনটে কপি নেওয়া হয়েছিল। সেই ছবি তিনটিই ও নিজের কাছে রেখে দিল। তাদের দুর্ভাগ্য-চিহ্নিত বিবাহিত জীবনের কোনো চিহ্ন বিকাশের কাছে না-থাকাই ভালো।

তারপর একখানি চিঠি লিখল বিকাশকে :

প্রণামপূর্বক নিবেদন —

সেদিন উষার কথায় রাগ করেছিলাম, কিন্তু সে মিথ্যা বলেনি। তার কথা যে সত্যি — ভগবান হাতে-হাতে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তোমার আত্মীয়স্বজনদের মনে কষ্ট দিয়ে আমাদের এই বিবাহ, ভগবান ক্ষমা করেননি। তাই শাস্তি দিয়ে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। উষা বলছিল, একজন ভালো জ্যোতিষী তোমার কোষ্ঠী দেখে বলেছেন — আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িয়ে গেছে বলে এই বিপদ হয়েছে। আমি এটা বিশ্বাস করেছি। আমিও এই ভয় করেছিলাম বলে প্রথমে তোমার প্রস্তাবে রাজী হইনি। তোমার জেদের জন্য আমাকে রাজী হতে হয়েছিল। এখন তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ - আমাদের এ-বিবাহ মঙ্গলপ্রসূ হবে না। আমার জন্য আমি ভাবি না। কিন্তু তোমার যদি কোনো অকল্যাণ হয়, তা আমি সহ্য করতে পারব না। তাই আমি এ-বন্ধন ছিন্ন করলাম, তোমাকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিলাম।

তুমি শীলাকে বিয়ে করে সুস্থ হও, দীর্ঘজীবী হও এবং সর্ব-বিপদ-মুক্ত হও। সব দিক দিয়ে তোমাদের কল্যাণ হোক। সর্বগুণান্বিতা শ্রীমতী স্ত্রী ও সুন্দর-সুন্দর সন্তান নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার কর। তোমার সমস্ত অকল্যাণ বিপদ-আপদের মূলে — আমি। আমি তোমার জীবন-পথ থেকে চিরদিনের মতো সরে গেলাম।

কোথায় যাব, কি করব -- জানি না। হয়তো মরে যাব দুদিন পরে, কিম্বা জীবন্মৃতা হয়ে কোথাও দাসীবৃত্তি করব। এই আমার ভাগ্যলিপি। একে খণ্ডন করবার চেষ্টা মূঢ়তা। উষা বলছিল — ভাঙা কপাল জোড়া লাগে না। খুব সত্যি কথা। এ-সত্য আমি যেমন করে বুঝলাম, এমন করে আর যেন কাকেও বুঝতে না-হয়।

হয়তো আমার খোঁজ করবার চেষ্টা করবে তুমি। তুমি যে আমাকে ভালোবাস তা আমি মর্মে-মর্মে জানি। এইটুকুই আমার সান্ত্বনা।

পৃথিবীতে আমার কিছুই নেই। শুধু, তোমার অন্তরের এক কোণে একটু স্থান পেয়েছি এই জানাটুকু সম্বল করে বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দেব।

আমার খোঁজ পাবে না। খোঁজ পেলেও আমাকে আর পাবে না। যাতে তোমার অকল্যাণ হবে তেমন কাজ আমাকে দিয়ে আর হবে না। তোমার মঙ্গলের জন্যই নিজেকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছি। আমি দূরে থাকলেই তোমার মঙ্গল। এইটি বুঝে আমার উপর রাগ কোরো না: মনেও কোনো দুঃখ পেও না। তোমাকে এই বিপদের মুখে দেখে চলে আসতে হয়েছে তোমার পাশ থেকে, চলে যেতে হচ্ছে তোমার জীবন থেকে- এ যে আমার পক্ষে কত মর্মান্তিক, তা তুমি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

তোমার প্রিয়-পরিজনরা কটু, তীক্ষ্ন শ্লেষে আমাকে বিদ্ধ করবে। আমার জীবনে সুখী হবার শেষ প্রয়াস ও তার ব্যর্থতা স্মরণ করে অবজ্ঞার হাসি হাসবে। তুমি কিন্তু ভুলে যেও না, আমার সুখের জন্য নয়, তোমারই সুখের জন্য নিজেকে তোমার হাতে সঁপে দিয়েছিলাম। আবার তোমার কল্যাণের জন্যই তোমার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

তুমি বিশ্বাস কোরো, এই বিদায়-মুহূর্তে আমার মনে কোনো খেদ নেই। কটা দিন যে তোমার কাছে থাকতে পেয়েছি, তোমার সেবা করতে পেরেছি, নিজেকে তোমার ভোগের জন্য নিঃশেষে নিবেদন করতে পেরেছি, এই আমার দুর্ভাগ্যময় জীবনে পরমসৌভাগ্য। এই কদিনে যা পেলাম, তাই আমার অক্ষয় সম্পদ হয়ে রইল জীবনে। জীবনের শেষ নিমেষপাত পর্যন্ত এই পাওয়াটুকু ঘিরে আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত চেতনা, সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর মতো, ঘুরতে থাকবে।

হে বন্ধু, বিদায়! তুমি তোমার জীবনে ফিরে যাও। সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে রূপবতী, গুণবতী রমণীর প্রেম, প্রচুর সুখ ও সম্পদ।

আমি ফিরে যাই আমার জীবনে। আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে নিরাশার নিবিড় অন্ধকার, মৃত্যুর অসীম শূন্যতা।

হয়তো কোনোদিন আমার কথা তোমার মনে পড়বে। একটা হ্যাংলা গরীব মেয়ে, কেঁদে-কেটে, আবদার করে, তোমার স্নেহ আদায় করে

নিয়েছিল; নিয়েছিল তোমার প্রেম, ভালোবাসা। দুর্ভাগ্যের অতল সমুদ্রে ভাসতে-ভাসতে তোমার তরীতে উঠে আবার বাঁচবার চেষ্টা করেছিল। ভগবান তাকে শাস্তি দিয়েছেন। তাকে টেনে আবার দুর্ভাগ্যের সমুদ্রে ফেলে দিয়েছেন। কোথায় তলিয়ে গেছে সে; হয়তো মরে গেছে।

আমার কথা মনে করে তখন তুমি নিষ্কৃতির নিঃশ্বাস ফেল না। দুর্ভাগিনীকে একটু স্নেহ ও সহানুভূতির সঙ্গে স্মরণ কোরো।

প্রণাম নাও।

—অরুণা

অরুণা চিঠিটা ধীরেনকে দিয়ে বলল, 'উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে ওঁকে চিঠিটা দেবেন।'

বিদায় নেবার আগে ধীরেন একটু ইতস্তত করে বলল, 'অরুণা, একটা কথা—মানে আমি বলছি না—তোমার বৌদি বলেছে, বিকাশ তো বিছানায় পড়ে, যদি কিছু টাকাকড়ির প্রয়োজন হয়।'

অরুণা বলল, 'টাকা আমার সঙ্গে আছে।'

ধীরেন বলল, 'তাহলেও কিছু বেশি সঙ্গে রাখা ভালো।'

অরুণা বলল, 'এখন থাক্, দাদা। যদি প্রয়োজন হয় চেয়ে নেব।'

বছর কয়েক পরে হাওড়া স্টেশনের একটি প্ল্যাটফর্মের এক পাশের লাইনে দিল্লীগামী মেল অপেক্ষা করছে। আর এক পাশের লাইনে একটি ট্রেন এসে দাঁড়াল। একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে নামল একদল বালক। সংখ্যায় প্রায় ত্রিশ। বয়স সাত-আট থেকে পনরো-ষোলো পর্যন্ত। পরনে খাকি হাফ-প্যান্ট, হাফ-হাতা খাকি শার্ট। পা খালি।

প্ল্যাটফর্মের এক পাশ ঘেঁষে দল বেঁধে তারা গেটের দিকে চলল। তাদের পিছনে-পিছনে চলেছে একজন মহিলা। শীর্ণদেহ, ফরসা রঙ, পরনে বিধবার বেশ। বালকগুলি অনাথ বালক। বাঙলাদেশের কোনো এক অনাথ-আশ্রম থেকে আর এক অনাথ-আশ্রমে চলেছে। মহিলাটি অনাথ-আশ্রমের সেবিকা।

প্ল্যাটফর্মের আর এক পাশ ঘেঁষে চলেছে এক জোড়া যুবক-যুবতী। যুবক সুদর্শন, পরনে সাহেবী পোশাক। যুবতী সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। পরনে শাড়ি, শেমিজ, ব্লাউজ। কিন্তু পরবার ধরনটি অতিশয় সুরুচি-সঙ্গত। যুবকের হাত ধরে চলেছে একটি বছর তিনেকের ফ্রকপরা ফুট-ফুটে মেয়ে। যুবতীর বুকে বাঁ-হাত দিয়ে চেপে ধরা একটি বছরখানেকের গোলগাল সুন্দর শিশু। মাথায় বড়-বড় কোঁকড়া চুল, ধবধবে ফরসা রঙ — যেন একটি বড় কাঁচের পুতুল।

মহিলা এদের দেখে থমকে দাঁড়াল। ওর মুখে ফুটে উঠল প্রথমে বিস্ময়-বিহ্বলতা, তারপরেই করুণ মুগ্ধতা। সতৃষ্ণ নয়নে এদের দেখতে লাগল।

একটি ছেলে সামনে থেকে ডাকল, 'মাসীমা! আসুন।'

মহিলা মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে, দ্রুতপদে ছেলেদের সঙ্গ নিল।

যুবক-যুবতী কথাবার্তায় এত মগ্ন যে কিছুই লক্ষ্য করল না। অনতিবিলম্বে তারা দিল্লী মেলের একটি প্রথম-শ্রেণীর কামরায় উঠে পড়ল।

[সমাপ্ত]